ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের

কঙ্কাবতী

সম্পাদক

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি ॥

॥ কলিকাতা-১২ ॥

প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, ওরিয়েন্ট বুক
কোম্পানি। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা

নূতন সংস্করণ । জ্যৈষ্ঠ । ১৩৫৪
পুনর্মুদ্রণ । আষাঢ় । ১৩৬৭

দাম। ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক। সাধারণ প্রেস প্রাইভেট
লিমিটেড। ১৫এ ক্ষুদিরাম বসু রোড। কলিকাতা ৬

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা	... ...	১ হইতে ৭৭
ত্রৈলোক্যনাথের বাল্যকাল, কর্মজীবন আরম্ভ, জীবনের নূতন অধ্যায়, ভারতীয় শিল্পকলার চর্চা, সাহিত্য-সাধনা		
রবীন্দ্রনাথকৃত কঙ্কাবতীর সমালোচনা	...	৭৭ হইতে ৮০
কঙ্কাবতী, প্রথম ভাগ	...	১ হইতে ৬৩
কঙ্কাবতী, দ্বিতীয় ভাগ	...	৬৪ হইতে ১৮৯

ভূমিকা

বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকালের নয়। কাগজে-কলমে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইলেও কার্যতঃ, ওই শতাব্দীর তৃতীয় পাদ অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার প্রারম্ভ-কাল হইতেই সাহিত্যের দরবারে গদ্যরচনা সত্যকার আসন লাভ করিয়াছে। তাহার পর হইতে অনধিক শতাব্দীকাল কাটিয়া গেল। (বাঙ্গালা সাহিত্য-মহীরুহের প্রায় সকল শাখা ফলে ফুলে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। পদ্য সাহিত্যের তো কথাই নাই। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প ও প্রবন্ধাদির সম্ভারে গদ্যবিভাগও কম সমৃদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এই সমৃদ্ধিসত্ত্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা অভাব সকলের চোখে পড়ে—এবং সে অভাব গদ্য পদ্য উভয় বিভাগ সম্বন্ধেই বলা চলে—সে অভাব বিশুদ্ধ হাস্যরসের।

হাস্যরস আমাদের সাহিত্যে তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না, কদাচিৎ করিলেও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় অদ্যাবধি অক্ষম হইয়া রহিল কেন, তাহা কে বলিবে? কেহ বলেন, আমরা আজন্ম বৃদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাদের শৈশব ঘুচে না। এক হিসাবে এই দুইটি মতই সমূলক। আর যদি একটি মতের মধ্যেও কিছুমাত্র যাথার্থ্য থাকে, তাহা হইলে সাহিত্যে হাস্যরসের অপ্রতুলতার কারণ নির্ণয়ের জন্য অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশ্যক হয় না।

কারণ যাহাই হউক না কেন, অভাবটা যে কাল্পনিক নয় তাহা তো সকলেই জানেন। এ অবস্থায় যাঁহার কাছে যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতে হইবে। (দুর্ভিক্ষের দেশে যিনি মুষ্টিভিক্ষা দেন তিনিও দাতা, একথা ভুলিলে চলিবে না। হাতে তুলিয়া তিনি যাহা

দেন হাত পাতিয়া তাহা যদি না লইতে পারি তাহাতে ক্ষতি তাঁহার নয়, ক্ষতি ক্ষুধার্তেরই। আমাদের ক্ষুধা আছে, খাদ্যও আছে। তবে ক্ষুধার অনুপাতে খাদ্য অল্প। কিন্তু সেই অল্প খাদ্যও তো সন্ধান করিয়া সংগ্রহ করি না।

(ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে এত কথা বলিতে হইল এই কারণে যে, আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের অপ্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করিয়া যখন জাতীয় দৈন্য সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন, তখন ত্রৈলোক্যনাথের নাম সকলের স্মরণ থাকে না। অথচ ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ-সাহিত্যে যাহা দিয়াছেন তাহাকে মহৈশ্বর্য যদি না-ও বলিতে পারি তবু মুষ্টিভিক্ষা কখনও বলিব না। তাহা "অবদান" না হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে দানীর দান এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরিমাণেও যেমন তাহা নগণ্য নহে, সাহিত্যিক মূল্যের দিক দিয়াও তেমনি তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না। তৎসত্ত্বেও ত্রৈলোক্যনাথকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ ভুলিতে বসিয়াছে দেখিয়া দুঃখ হয়।

কঙ্কাবতী ত্রৈলোক্যনাথের অন্যতম বিখ্যাত রচনা। বিখ্যাত বলিতেছি এই জন্য যে প্রথম প্রকাশকালে ইহা পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল এবং ইহার জনপ্রিয়তা কিছুকাল স্থায়ী হইয়াছিল। এখনও যাঁহারা ত্রৈলোক্যনাথের নাম মনে রাখিয়াছেন তাঁহারা প্রধানতঃ কঙ্কাবতীর লেখক বলিয়াই তাঁহাকে জানেন। বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যে কঙ্কাবতীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, অন্ততঃ সে স্থান দাবি করিবার অধিকার তাহার আছে।) কেন আছে তাহা যথাস্থানে বলিব। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই বিস্মৃতপ্রায় এই গ্রন্থটিকে বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছি। অর্ধশতাব্দী পূর্বেকার সাহিত্য-সমাজ যাহার আবির্ভাবকে সানন্দে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, অদ্যকার বঙ্গীয় বিদগ্ধসমাজের নিকট তাহার পুনরাবির্ভাব

কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করে তাহা দেখিবার জন্য কৌতূহলী রহিলাম।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় দিবার পূর্বে তাঁহার জীবনীপ্রসঙ্গে কিছু বলা আবশ্যক। গ্রন্থকারের জীবনকথা আলোচনার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথম, যে সাহিত্য একদিন পাঠকসমাজের মনে আনন্দের আন্দোলন জাগাইয়াছিল, অনতিকাল মধ্যেই তাঁহাদের উত্তর-পুরুষগণ সেই সাহিত্যকে দিব্য বিস্মৃত হইয়াছেন। এ অবস্থায় সাহিত্যিককে মনে রাখিবেন, এ আশা দুরাশা। কাজেই মনে রাখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাঁহারা কাব্যামৃতরস পরিবেশন করিয়া আমাদের চিত্তকে সরস সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সমগ্র জাতিই ঋণী। সে ঋষিঋণ শোধ করিবার দায়িত্ব আমরা পালন করি বা না করি, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

দ্বিতীয়, ত্রৈলোক্যনাথের জীবনকাহিনীটাই একটা উপন্যাস। নিতান্ত সাধারণ অবস্থা হইতে মানুষ কিরূপ অসামান্য উন্নতি লাভ করিতে পারে ত্রৈলোক্যনাথের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনে তাঁহাকে কত দুঃখ কত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহার অন্ত নাই। কিন্তু অচল অধ্যবসায়, দুর্জয় সাহস এবং সুদৃঢ় পৌরুষের সাহায্যে সকল বাধাবিঘ্ন তিনি, অনায়াসে না হইলেও, অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের জীবনেতিহাসই এক অপরূপ অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী।

তৃতীয়, ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে তাঁহার জীবনের ছায়া নানা-স্থানে নানারূপে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। সমগ্র জীবন ধরিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা স্বীয় রচনার মধ্যে কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা অজ্ঞাতসারে প্রকাশ করিয়াছেন। কঙ্কাবতী গল্পের নায়ক খেতুর জীবনকাহিনীর কিয়দংশ গ্রন্থকারের

জীবনীর অংশবিশেষের সহিত কিরূপ মিলিয়া যায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুতঃ ত্রৈলোক্যনাথকে জানিলে তাঁহার সাহিত্য বোঝা অনেক সহজ হইয়া যায়। যে সকল ভাব ও ভাবনার ভিত্তির উপর গ্রন্থকারের মানস-জীবনের প্রতিষ্ঠা তাঁহার সাহিত্যও অনেক স্থলে সেই একই উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত; সেই কারণেই রচনার রস উপলব্ধির পক্ষে রচয়িতার মানস-জীবনের পরিচয় শুধু আবশ্যক নয়, অনেকাংশে সহায়ক। আর মানুষের মনোলোকে প্রবেশ করিতে হইলে, তাহার ব্যক্তিজীবনের বহির্দ্বার অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি তাহা বলাই বাহুল্য।

ত্রৈলোক্যনাথের বাল্যকাল

এখন ১৩৫৪ সাল চলিতেছে। আজ হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্বে, ১২৫৪ সালে (ইং ১৮৪৭) ৬ই শ্রাবণ, চব্বিশ পরগনার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। বিশ্বম্ভরের ছয় পুত্র। ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন মধ্যম।

বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ছয় পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তাঁহার জ্যেঠাই গোপীমণি দেবী না থাকিলে ছয়টি পুত্রের মুখে অন্ন দেওয়াই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত।

রাহুতা গ্রামের পাঠশালায় ত্রৈলোক্যনাথ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাহার পর ওই গ্রামেরই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এই স্কুলে বেশী দিন পড়ার সুযোগ হয় নাই; কারণ, ১৮৫৯ সালে স্কুলটি উঠিয়া যায়। ১৮৫৯ হইতে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত, এই তিন বৎসরের মধ্যে, তাঁহাকে একাধিক স্কুল বদল করিতে হয়। প্রথমে ভরতি হন চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে, সেখান হইতে গিয়া ভদ্রেশ্বরের

নিকটবর্তী তেলিনীপাড়া স্কুলে প্রবেশ করেন। আবার কিছুদিন পরেই তেলিনীপাড়া স্কুল ত্যাগ করিয়া ডফ সাহেবের স্কুলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। ১৮৬২ সালে তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। এই সময় গ্রামে ম্যালেরিয়া রোগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। এই রোগে তাঁহার পিতামহীর মৃত্যু হয়। পরে তাঁহার মাতা এবং অনতিকাল মধ্যে তাঁহার পিতাও পরলোক গমন করেন। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন। সাংসারিক দুর্যোগ, আর্থিক অসচ্ছলতা এবং নিজের স্বাস্থ্যহীনতার দরুন এই সময় হইতেই তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইয়া গেল।

দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়া আরও তিন বৎসর কাটিল। অর্থকষ্ট তো আছেই, তাহার উপর রোগের জ্বালাও ছাড়িল না। মাথার উপরে একমাত্র বড় ভাই রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। তিনি অতি সামান্য উপার্জন করিয়া কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের কনিষ্ঠ আরও চারিটি ভাই। ম্যালেরিয়ায় তাহারাও জর্জরিত। তাহাদের আহার ঔষধ দেয় কে? তিনি বুঝিতে পারিলেন, দাদা একলা এত বড় সংসার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহারও কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তাহার উপায় কি? ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। গ্রামে থাকিয়া কিছুই করা সম্ভব নয় দেখিয়া অবশেষে একদিন বাটী হইতে বাহির হইলেন। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর।

ইহার পর হইতেই তাঁহার জীবনধারা এক নূতন খাতে বহিতে আরম্ভ করিল। সে বৈচিত্র্যময় জীবনের ইতিহাস এক রহস্যঘন রোমাঞ্চকর উপাখ্যানের উপাদানরূপে গণ্য হইতে পারে।

তাঁহার এক আত্মীয়ের বাস ছিল মানভূম পুরুলিয়ায়। তাঁহার নাম শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রৈলোক্যবাবু বাটী হইতে বহির্গত হইয়া শশিশেখরের নিকট যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। সঙ্গে টাকাকড়ি অতি সামান্যই ছিল, তাহাতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত রেলে

গাছের তলায় খেলা করিতেছে; ইহারা সেখানে গিয়াও ট্যাক্সের জুলুম করিল। আপত্তি করিলেই হতভাগাদের সর্বনাশ। এইরূপ মারধর হাঙ্গাম-হুজ্জুত করা এই দলের প্রধান কর্ম ছিল। ইহা ছাড়া ইহারা মাটির নীচে গর্ত করিয়া কেল্লা তৈয়ারি করিত। গুরুমহাশয়ের বেতের ভয়ে কিংবা অভিভাবকগণের তাড়নার শঙ্কায় মাঝে মাঝে ইহারা সেই কেল্লার ভিতর লুকাইত।" ১

এই নূতন ছাত্রদল পাইয়া ত্রৈলোক্যনাথের দলপতিত্বের লোভ আবার জাগিয়া উঠিল। দলপতিত্ব করিবার প্রতিভা তাঁহার ছিল। অনাত্মীয় অত্যল্পমাত্র পরিচিত বালকগণকে তিনি অতি সহজেই আকর্ষণ করিয়া ফেলিলেন। তাহারা কেহই তাঁহাকে দলের নায়কত্ব দিতে কুণ্ঠিত হইল না।

ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছেন:

"দুই চারি দিনের মধ্যে বালকদের আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলকে অসমসাহসিক কার্যে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া মার কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে তাহার অনুসন্ধান করিলাম। ইহাতে বালকগণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। যথা দিনে রাঁচি পঁহুছিলাম।

"কিন্তু অল্প দিন পরেই রাঁচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু-জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্যপ্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছুদিন পরে জঙ্গলের মাঝে একদিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচি আসিলাম। রাঁচি হইতে আবার মানভূমে আসিলাম। কিন্তু

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' "বঙ্গভাষার লেখক"

স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। বর্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানের রেফাকযুলেন নামক একজন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। তাঁহার নিকট পারসী শিক্ষা করিলাম। অল্পদিনে পন্দনামা, আমদ্‌নামা, গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম।

"বাড়ির কষ্ট সর্বদাই মনে জাগিত। পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। অল্প দিনের জন্য ইচ্ছাপুর গ্রামে অ্যাকটিনি করিলাম। চার মাস পরে সে কাজ গেল। গ্রামের জনৈক আত্মীয় যশোহর জেলায় কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। যশোহর-কোটচাঁদপুরে যাইতে পারিলে, দু-পয়সা হইতে পারে, তিনি এইরূপ ভরসা দেন। কোটচাঁদ-পুরে গেলাম। কন্‌ট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটী আসিলাম। আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুত হরকালী মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ে বর্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটি-ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাস্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন; সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনকালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন; কিন্তু চাহিতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।" ১

উনিশ বৎসরের কিশোর বালক প্রতিকূল অদৃষ্টের সহিত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। জীবনযুদ্ধে তিনি যে দুর্দমনীয় অধ্যবসায় এবং অপরাজেয় মনোবলের পরিচয় দিতে লাগিলেন তাহা যে কোনো দুঃসাহসী বীরের পক্ষে গৌরবের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কি অবস্থায় দিন কাটিয়াছে ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় তখন উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ পর্যন্ত তাহার কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। সর্বত্র দারুণ অন্নকষ্ট।

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' "বঙ্গভাষার লেখক"

অন্ন মেলা দুর্ঘট। কিশোর বালক সেই দুর্দিনেও ভাগ্যান্বেষণে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলিয়াছেন আর দুর্ভাগ্যও চলিয়াছে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে। কোনও দিন এক মুঠা অন্ন জুটে, কোনও দিন উপবাসে কাটাইতে হয়। লোকে অতিথি দেখিলে বাড়িতে উঠিতে দেয় না। এই দুঃসময়ের দুই একটি ঘটনার কথা ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন।

"রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুইদিন আহার হয় নাই। সন্ধ্যার সময় শিউড়ি উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় যাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্কুলের হেডমাস্টার নবীনচন্দ্র দাসের নিকট গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম,—মহাশয় আমি ব্রাহ্মণ; দুই দিন অনাহারে আছি। যদি আমায় কিছু খাইতে দেন। তিনি আমাকে একটি দু-আনি দিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এরূপ পয়সা ভিক্ষা করিতে আপনার কাছে আসি নাই। আমাদের বংশে কেহ এরূপ ভিক্ষা করে নাই। তবে নিতান্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি, তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। অন্যস্থানে যাইব এরূপ শক্তি নাই, সেই নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়াছি। তিনি উত্তর করিলেন, জাতিতে আমি তন্তুবায়; আমি পরিবার লইয়া আছি। আমার নিকট ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নাই। তবে তুমি এক কর্ম কর। আমার অধীনে কুঞ্জ বলিয়া একটি জমিদার বালক আছে। সে ব্রাহ্মণ। তুমি আজ রাত্রি তাহার নিকট গিয়া অবস্থান কর। কুঞ্জ আমার সমবয়সী। সে একটি মেটে ঘরে থাকে। সেই ঘরের ভিতর রান্না হয়। ঘরের ভিতর কুঞ্জ ও আমি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। ঘোরতর আগ্রহের সহিত সেই রন্ধন-কার্য দেখিতে লাগিলাম। এই হয়, এই হয়, কখন হয়—সর্বদাই এই চিন্তা। ব্রাহ্মণ প্রথম ভাত নামাইল। উল্লাসে মন প্রফুল্ল হইল। তাহার পর দাল হইল। এইবার রাঁধিলেই হয় এই ভাবিয়া মনে অতিশয় আনন্দ উপস্থিত হইল। উত্তপ্ত তৈলে ব্রাহ্মণ যেই মাছ ফেলিয়া দিল, তার তেল জ্বলিয়া ঘরের কোণের চালে, যাহা ঠিক উনুনের উপর ছিল, তাহাতে আগুন লাগিয়া গেল। মহা গোল উঠিল। চারিদিক্ হইতে লোক

আসিয়া আগুন নিবাইল। কিন্তু আমার জঠরানল নির্বাণ হইল না। যাহা কিছু রন্ধন হইয়াছিল, সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। দুই পয়সার মুড়ি-মুড়কি আনিয়া কুঞ্জ ও আমি খাইলাম। দুর্ভিক্ষের সময় তাহা এক গালেই ফুরাইয়া গেল, ক্ষুধার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না।" ১

দুইদিনের মধ্যে এক মুঠা মুড়ি-মুড়কি ছাড়া আর পেটে কিছু পড়ে নাই। তথাপি তিনি ভোরে উঠিয়াই কুঞ্জর নিকটে বিদায় লইয়া বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়া আসিল, তখন অতিকষ্টে এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুন-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়িতে কোনও রূপ শুভকার্য হইয়াছে; ইহাদের বাড়িতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতিতে সদ্গোপ। বাটীর কর্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।" ২

কর্মজীবন আরম্ভ

এইরূপে অতিকষ্টে তিনি বর্ধমানে পৌঁছিলেন। সেখানে আসিয়া হরকালীবাবুর কাছে শুনিলেন যে, তাঁহার পিতামহীর ৩ গুরুতর অসুখ। ত্রৈলোক্যনাথকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা অতিশয় কাতর হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। হাতে একটি পয়সা নাই। হরকালীবাবুর নিকটে চাহিলে পথখরচ কিছু অবশ্যই পাইতেন। কিন্তু চাহিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। শূন্য হাতেই আবার পথে নামিলেন।

১. ও ২. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' "বঙ্গভাষার লেখক"

৩. সম্ভবতঃ পিতার জ্যেঠাই

"সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারি আসিয়া পৌঁছিলাম। মেমারি স্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধা ঘাটে পড়িয়া রহিলাম; ভাবিতে লাগিলাম,—দুদিন আহার হয় নাই, অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি তো কাল প্রাতে আরও দুর্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনই পথ চলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুলগাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন, আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটি পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটি বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটি পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম। দিদিমা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

"কিছুদিন পরে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাস্টারি করিলাম। আত্মীয় হরকালীবাবুর চেষ্টায় এ কাজ হয়। অল্প দিনের মধ্যে রানীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায় বদলি হইলাম। এ স্থানের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইলাম। বেতন ১৮৲ টাকা।" [১]

এই প্রসঙ্গে তাঁহার Abstract of Services [২] পুস্তিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ দেওয়া হইয়াছে:

"1866-67 : Served as Second master in the Okra and Head master in Dwarka Government-aided School."

আঠার টাকা মাহিনার শিক্ষকতা দিয়া তাঁহার কর্মজীবনের সূচনা হইল। অভাবের তুলনায় আয় অতি সামান্য। অথচ দায়িত্ব অনেক। বাড়িতে চারটি শিশু ভাই। নিজের খরচ চালাইয়া তাহাদের জন্য টাকা পাঠাইতে হইবে। তখন দেশে দুর্ভিক্ষ। ক্ষুধাতুর নরনারী অন্নাভাবে দলে দলে মরিতেছে, তাহাদের কিছু খাদ্য দিতে হইবে। সব জিনিসই মহার্ঘ। নিজের আহার পরিচ্ছদ ঠিকমত জোগাইতে গেলে ভাইদের জন্য কিছু

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' দ্রষ্টব্য

২. "ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়" "বঙ্গভাষার লেখক"

থাকে না, ক্ষুধার্তের ক্ষুধাও দূর করা যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি নিজের খরচই যথাসম্ভব কমাইতে লাগিলেন। যথাসম্ভব বলিলেও ঠিক বলা হয় না, অসম্ভবরূপে কমাইয়া তুলিলেন। কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া ওই সময়কার দিনগুলি কাটাইয়াছিলেন, তাহা ত্রৈলোক্যনাথের নিজের কথাতেই বলি :

"এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ! রাত্রিদিন লোকের কাতর-ক্রন্দনে শরীর কণ্টকিত হইতে লাগিল। অস্থিচর্মসার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় নর-নারী, বালক-বালিকাদিগের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানেই মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়ার দুর্গন্ধে পথ-চলা ভার হইল। বাড়িতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রারম্ভ— অতিশয় ক্ষুধা। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নর-নারীগণের দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়িতে পাঠাইতাম।" [১]

ত্রৈলোক্যনাথের এই আত্মকাহিনী পড়িতে পড়িতে কঙ্কাবতী গল্পের নায়ক খেতুর কথা মনে পড়ে। খেতু (অবশ্য কঙ্কাবতীর স্বপ্নে) কি ভাবে থাকিয়া, কিরূপ কষ্ট করিয়া, ক্ষুধার সময় উপবাসে থাকিয়া কখনও বা কেবলমাত্র জল পান করিয়া, কঙ্কাবতীর পিতার জন্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা পড়িয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থকারের কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা কেমন অব্যবহিত যোগে যুক্ত হইয়া গিয়াছে। [২]

যাহাই হউক, ত্রৈলোক্যনাথ বহু দুঃখ সহ্য করিয়া, ক্ষুধা,

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

২. "কঙ্কাবতী" পৃ. ১১৬ দ্রষ্টব্য

তৃষ্ণা উপেক্ষা করিয়া, ব্যক্তিগত সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়া দুর্গতদের সেবায় মন দিলেন। সেবার অর্থ তো আর কিছু নয়, অন্নদান। দরিদ্র স্কুলমাস্টার, ইচ্ছা যতই প্রবল হউক না কেন, ওই ক-টা টাকায় সকল দিক রক্ষা করিয়া কয়জন অভুক্তকে আহার দেওয়া যায়? যত জনকেই তিনি অন্নদান করুন না তাহা অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। যেখানে হাজার হাজার লোক অনাহারে মরিতেছে, সেখানে প্রতিদিন দুই চারিজন, না হয় বড় জোর দশজনই হইল, লোককে দুই মুঠা ভাত দিলে দেশের কতটুকু উপকার হইবে? তখন হইতেই তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তখনই তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ভারতে যাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে না পারে এমন কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি এই কথা নিঃসন্দেহে বুঝিলেন যে এদেশের লোক যদি নিজেরা একটু অবহিত হয়, তাহা হইলে দেশের অর্ধেক দুর্দশা কমিয়া যায়। ইহা কল্পনাবিলাসীর উচ্ছ্বাস বা ভাবুকের ভাবাবেগ মাত্র নয়। মহোত্তম কর্মবীরের সুনিপুণ পর্যবেক্ষার ফলেই এই ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। তিনি যে কিরূপ ব্যবহারিক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা দুই-একটি কথা হইতে সহজে বুঝা যায়:

> "যাহাতে দেশের দুঃখমোচন হয় এরূপ চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। বড় জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম উপলক্ষ্যে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুইদিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব দুঃখী লোকেরা চিরদিনের জন্য যাহাতে এক মুঠা অন্ন পায় এরূপ কার্যে কয়জনের দৃষ্টি আছে!" [১]

ত্রৈলোক্যনাথ দেশের জন্য কতখানি চিন্তা করিয়াছিলেন এবং

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

সে চিন্তার ফল কি হইয়াছিল তাহা তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের পরবর্তী অংশে দেখিতে পাইব।

১৮৬৭ সালেই উখড়া স্কুলের কাজ ছাড়িয়া তিনি পাবনা চলিয়া যান। ত্রৈলোক্যনাথ কোনও সূত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর নামক স্থানে মহর্ষির জমিদারিতে একটি স্কুল ছিল; সেই স্কুলে এক শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে পত্র দেন। ত্রৈলোক্যনাথ ২৫৲ টাকা বেতনে সেই পদ গ্রহণ করিয়া সেখানে চলিয়া যান। সেখানে তিনি কয়েক মাস মাত্র ছিলেন। আত্মকথার প্রসঙ্গে তিনি এই সময়কার কথা কিছু লিখিয়াছেন। (ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় যে চমৎকারিত্ব, বর্ণনায় যে বৈচিত্র্য এবং আখ্যানগ্রন্থনে যে নৈপুণ্য দেখা যায়, স্বীয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই যে তাহাদের প্রধান অবলম্বন, তাঁহার আত্মকথার একাধিক প্রসঙ্গে তাহার পরিচয় পাই।)

হাস্যরসের প্রধান উপাদান করুণা। এক হিসাবে করুণরসের সহিতই ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ। কুশলী রসস্রষ্টার কৃতিত্ব এইখানেই, কাঁদাইবার বস্তু দিয়া তিনি হাসান। সে-হাসি কান্নার অপেক্ষাও করুণ। জগতে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সর্বদাই আছে। উপদেষ্টার আসনে বসিয়া যখন লেখক বলেন, হিংসা করিও না, তখন সে কথা আমাদের কানে যায় না; গেলেও অন্য কান দিয়া তাহা সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু পরিহাসের আঘাত যদি যথাস্থানে পড়ে এবং যথাযথ ভাবে পড়ে, তাহা সহজে ভুলা যায় না।) গড়গড়ি মহাশয়ের গুরুদেব "শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলোক চক্রবর্তী" মহাশয়ের কাহিনী পড়িয়া দেখুন। [১] গোলোক চক্রবর্তী সদ্‌ব্রাহ্মণ। অতিশয় নিষ্ঠাবান। যদিও কসাইবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন, তথাপি নিজে মাছ-মাংস কিছুই খান না। একদিন শিষ্য গুরুদেবের

১. 'মুক্তা-মালা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেব তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণপূর্বক বসিতে দিয়াছেন। তাহার পর দুইজনে কথোপকথন হইতেছে :

"কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সংকীর্ণ ছিল। তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

"আমি বলিলাম,—ঠাকুর মহাশয়, আপনার ছাগলগুলির বোধ হয় বড় জল-পিপাসা পাইয়াছে।

"গুরুদেব উত্তর করিলেন,—দুই একদিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।

"আমি বলিলাম,—উহাদের ক্ষুধাও বোধ হয় পাইয়াছে।

"গুরুদেব বলিলেন,—ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—উহাদিগকে কি খাইতে দেন?

"গুরুদেব উত্তর করিলেন,—খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।

"আমি বলিলাম,—এরূপ কয় দিন ইহারা অনাহারে থাকে?

"গুরুদেব বলিলেন,—সাত আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?

"গুরুদেব উত্তর করিলেন,—উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তবে এ সাত আট দিন একটু জল পর্যন্ত উহারা পায় না?

"গুরুদেব বলিলেন,—পূর্বে দুই এক দিন অন্তর এক আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়াহুড়ি করে। সে জন্ম আর দিই না।

"আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে এক জন খরিদদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদদারের সহিত তাঁহার কথা-বার্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্ত মাংস লইবে না; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্ম সে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারিটি পাঁঠা ছিল, তাহার একটিকে ঠাকুর মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিতে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর তাহার মুখদেশ নিজের পা দিয়া মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক্ হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচর-শূন্ত হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম,—ঠাকুর মহাশয়! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথম উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম উত্তোলন করুন।"

"ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন,—চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে

পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্মে এক প্রকার সরু সরু রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। এরূপ চর্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কম মূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়ামায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।" [১]

অনেক গোলোক চক্রবর্তীকে লেখক স্বীয় জীবনে দেখিয়াছেন। তাহারা সকলে পাঁঠা মারে না, অনেকে মানুষ মারে। সাহাজাদপুরে অবস্থানকালে লেখকের জীবনে যে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য :

"বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামগুলি এক একখানি দ্বীপের ন্যায় দেখিতে হয়। যে দিকে চাহিবে, জল ও নৌকার মাস্তুল। স্থানান্তরে এমন কি অন্য বাড়িতে যাইতে হইলেও, নৌকা করিয়া যাইতে হয়। একদিন নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখি, একটি সামান্য মাটির ঢিপি জলের মধ্যে দ্বীপের ন্যায়; ইহার কেবলমাত্র মাথাটি জাগিয়াছিল, সেই স্থানে তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, কেবল ঘাড় কাঁপাইতে থাকে, কোথায় বাড়ি, কে তাহারা, কি করিয়া তাহারা এই মাটির ঢিপিতে আসিল, কে তাহা-দিগকে ফেলিয়া গেল, তাহার কিছুই তাহারা বলিতে পারে না। ভাবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদিগকে আহার দেয় না, কেহ তাহাদিগের খোঁজ-খবর লয় না। কয় দিন তাহারা এইভাবে সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে অতিশয় শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আমার নৌকায় তুলিয়া সাহাজাদপুরে আনিয়া আমি তাহাদিগকে যত্ন করিতে লাগিলাম। ইহাতে নায়েব মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন,—ইহারা তো অল্প দিন

১. 'মুক্তা-মালা', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পরেই মরিবে; মরিলে ফেলিবে কে? তুমি ইহাদিগকে বিদায় করিয়া দাও, তাহারা যেখানে ছিল, সেইখানে রাখিয়া এস। আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না। কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বিষয় লইয়া সে স্থানের কোন কোন ক্ষমতাবান্ লোকের সহিত আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল।[১]

সেই তিনটি অশীতিপর বৃদ্ধার কি দশা হইয়াছিল, তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কিন্তু পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লইতে পারেন। মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ নিষ্ঠুরতা দেখিয়া তিনি জীবনে যত আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহার সাহিত্যের পত্রে পত্রে তাহারই প্রত্যাঘাত। মুখের কথায় যে অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে পারেন নাই, ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাহাকে জর্জরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখন আবার আমরা জীবনী প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি।

সাহাজাদপুরে শিক্ষকতা-পদ গ্রহণ করিবার কয়েক মাস পরেই পূজার ছুটি হইল। পূজার ছুটিতে বাড়ি আসিবার সময় কুমিরের হাতে প্রাণটা যাইত। ভাগ্যবলে রক্ষা পাইয়া গিয়াছেন:

"ছুটির পর কুষ্টিয়া হইতে নৌকা করিয়া পদ্মা দিয়া সাহাজাদপুরের দিকে যাইতেছিলাম। প্রথম দিন একটি চড়ার মাঝখানে নৌকা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর আমি রন্ধন করিতেছিলাম; হঠাৎ নিকটে একটি নিশ্বাসের শব্দ হইল। আমি ভয়ে দৌড়িয়া নৌকার উপর উঠিলাম। মাঝিরা বাঁশ লইয়া সেই দিকে গিয়া তাড়া দিল। কি একটা গিয়া জলে পড়িল, এইরূপ শব্দ হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মাঝিরা বলিল, বোধ হয় জল হইতে কুমির উঠিয়া আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার নিশ্বাস পড়িল, তাই আমি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইলাম। পরদিন প্রাতে নৌকা ছাড়িলাম।"[২]

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"
২. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন বটে কিন্তু পরের যাত্রায় রক্ষা পাইবার কথা ছিল না। অদৃষ্টদেবতা তাঁহাকে লইয়া যেন রঙ্গরস করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার পরিহাসটা যে মানুষের পক্ষে সব সময় খুব সুখকর হয় না, তাহা তাঁহার জীবনী হইতে অতি সহজেই প্রমাণিত হয়। সে রাত্রি নৌকায় কাটাইয়া পরদিন সকালে তো নৌকা ছাড়া হইল। তাহার পর কি হইল ত্রৈলোক্যনাথ নিজেই বলিতেছেন ঃ

"ইতিপূর্বে বাদলা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পূর্বদিক্ হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিতেছিল। পদ্মায় অতিশয় তুফান উঠিয়াছিল। কিছুদূর গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এক স্থানে তিনখানি বড় নৌকা লাগিয়াছিল ; আমরা সেইখানে গিয়া নৌকা লাগাইলাম। পদ্মার নিজ ধারেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ ; তাহার পরে গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উত্তর দিক্ হইতে বহিতেছিল। তুফানও অতিশয় বাড়িল। কত রাত্রি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু ঘোর কোলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলাম যে, তুমুল ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকের ঝড়ে আমাদের নৌকাকে ক্রমাগত পদ্মার মাঝখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। লগি পুতিয়া, দড়ি বাঁধিয়া আমরা নৌকা রক্ষা করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু লগি উঠিয়া যায়, দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। আমাদের নিকট যে কয়খানি নৌকা ছিল, ঝড়ে একে একে তাহাদিগকে দূরে লইয়া ডুবাইয়া দিল। শেষ বড় নৌকাখানি বায়ুবেগে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। দুইখানি নৌকাই একেবারে নক্ষত্রবেগে পদ্মার মাঝখানে চলিল। অল্পক্ষণ পরেই নৌকা দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। আমাদের নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। কিন্তু চারিদিক্ হইতে মাটি ভাঙিয়া পড়িতেছিল। একবার আমার নিকটেই দশ-বার হাত মাটি ভাঙিয়া পড়িল। তখন মাটি চাপা পড়িবার ভয় হইল। কষ্টে পাড়ের উপর উঠিলাম। উঠিতেই ঝড়ে আমাকে ঠিক উড়াইয়া না হউক, ঠেলিয়া লইয়া চলিল ; আর একেবারে পদ্মার ভিতর ফেলিয়া দিল। পুনরায় বাতাসে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমি বায়ুর সহিত অতিকষ্টে

তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটি ছোট গাছ দেখিতে পাইলাম। আগ্রহের সহিত গাছটি ধরিলাম। হাতের চারিদিকে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বুঝিলাম, গাছটি চারা বাবলা গাছ। সে গাছ ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি ঝোপ পাইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। তাহার ভিতর শুইয়া পড়িলাম। অতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। আর কিছুই জানি না।

"যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে দিন হইয়াছে। একজনের বাটীতে পড়িয়া আছি। বাটীর স্ত্রীলোকেরা আমার গায়ে আগুনের সেঁক দিতেছে। ক্রমে যখন জ্ঞান হইল, তখন শুনিলাম যে, যাহাদের বাটীতে আছি, তাহারা জাতিতে চণ্ডাল। গ্রামের নাম বুলচন্দরপুর। পাবনা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। প্রাতঃকালে বাটীর পুরুষেরা জলনিমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবার প্রত্যাশায় পদ্মার ধারে গিয়াছিল। ঝড় তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে চলিতেছিল। বায়ুবেগে পদ্মা হইতে জল উঠিয়া, তুমুল বৃষ্টির ন্যায়, উপরে অনেক দূর পর্যন্ত পড়িতেছিল। যে ঝোপের ভিতর আমি পড়িয়া ছিলাম, আশ্রয়ের নিমিত্ত চণ্ডালেরা সেই স্থানে প্রবেশ করে। মৃত অবস্থায় আমি পড়িয়া রহিয়াছি, দেখিতে পায়। গলায় পইতা দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া, মাঠ পার হইয়া তাহারা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া আইসে। তাহার পর যত্ন করিয়া আমার পুনরায় চৈতন্য উৎপাদন করে। তিন চারি দিন পরে যখন কিঞ্চিৎ সবল হইলাম, তখন পাবনার দিকে যাত্রা করিলাম।

"কাদামাখা সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া, এক-ছুট অবস্থায়, আমার একটি আত্মীয় বৈদ্যবাটীনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।...তিনি পাবনায় কর্ম করিতেন। এক্ষণে তিনি বহরমপুরে আছেন। ললিতকুড়ি অথবা অন্য কোন বাঁধের তিনি ইঞ্জিনিয়ার। ৪।৫ দিন তাঁহার নিকট রহিলাম। তিনি আমাকে কাপড় চোপড় কিনিয়া দিলেন। পাবনায় নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্মার সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা দুই জনেই আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন রাখালবাবু আমাকে

খরচ দিয়া বাটী পাঠান। তখন বাটীতে কেহই ছিলেন না। বীরভূম জেলায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট সকলেই ছিলেন। বাটী আসিয়া আমার জ্বর-বিকার হইল; কোনরূপে রক্ষা পাইলাম।" [১]

শরীর একটু সুস্থ হইলে সংসারের ভাবনা আবার প্রবল হইল। কিন্তু সাহাজাদপুরের স্কুলে আর ফিরিয়া গেলেন না। বাড়িতে বসিয়া থাকিতেও ইচ্ছা হইল না, থাকিলে লাভই বা কি? আবার তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ তাঁহার মধ্যে যে যাযাবরটা ছিল, সে তাঁহাকে কখনও এক জায়গায় বাসা বাঁধিতে দিল না।

জীবনের নূতন অধ্যায়

আত্মীয় হরকালীবাবু তখন বর্ধমান হইতে কটকে গিয়াছেন তিনি সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ত্রৈলোক্যনাথ পদব্রজে কটক যাত্রা করিলেন।

"যৎসামান্য খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিড়া, নুন আর লঙ্কা খাইয়া দিন যাত্রা করিতে লাগিলাম। শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়া গেল। সে দিন খণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একেবারে ১৯ ক্রোশ রাস্তা চলিলাম। মহানদী সাঁতার দিয়া পার হইলাম। হরকালী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইলাম। অল্প আরোগ্য লাভ করিলে আমাকে পুলিসের সব ইন্‌সপেক্টরি করিয়া দিলেন। [২]

'Abstract of Services' পুস্তিকায় নিম্নলিখিত বিবরণ আছে:

1864—70: Beginning of Pensionable service, 5th May, 1868. Served as Sub-Inspector of Police in the Cuttack District.

১. ও ২. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

দারোগার চাকরি লইয়া এই তিনি প্রথম একটু নিশ্চিন্ত হইতে পাইলেন। সাংসারিক অনটন কিছুটা দূর হওয়ায় এতদিনে তাঁহার অন্যদিকে মন দিবার অবকাশ হইল। তাঁহার মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভা সুপ্ত ছিল, এই তাহা প্রথম জাগরিত হইল। উড়িষ্যায় বসিয়া তিনি প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্য ভাল করিয়া পড়িলেন। ভাষা শিখিতে তাঁহার বেশী সময় লাগে নাই। ওড়িয়া শুধু যে পড়িতেই শিখিলেন তাহা নয় স্বল্প কালের মধ্যে ওই ভাষায় লিখিবার ক্ষমতাও অর্জন করিলেন। এই ভাষার উপর তাঁহার এতখানি দক্ষতা জন্মিয়া গেল যে 'উৎকল শুভঙ্করী' নামক একটি ওড়িয়া মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে তিনি এক অসাধ্য সাধন করিবার জন্য উদ্‌যোগী হন। তাহাতে অসাধ্য সাধিত হয় নাই সত্য, কিন্তু এই মানুষটির মনস্তত্ত্বের একটি পরিচয় আমরা পাইলাম। আজ এ দেশের রাজনীতিকগণ সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে একটি রাষ্ট্রভাষার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন। সমগ্র ভারতবর্ষ একটি সাধারণ ভাষা শিক্ষা করিতে পারিলে, তাহা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেও সহজে ঐক্য আনয়ন করিতে সমর্থ হইবে। এই ধারণা ত্রৈলোক্যনাথের মনেও স্থান পাইয়াছিল। তিনি যাহা সত্য বলিয়া মনে করিলেন, রীতিমত তাহার পরীক্ষায় লাগিয়া গেলেন। তিনি উড়িষ্যা প্রদেশে ওড়িয়া ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা ভাষা চালাইবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। তাঁহার কল্পনা ছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া একটি মাত্র ভাষা ব্যবহৃত হইবে— তাহা বাঙ্গালা ভাষা। উড়িষ্যা প্রদেশেই তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

তাঁহার পরিকল্পনায় একটি ত্রুটি ছিল, বুঝিবার একটু ভুল হইয়াছিল। তিনি প্রাদেশিক ভাষা উঠাইয়া দিয়া শুধু একটি

সাধারণ ভাষা চালাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, সেই কারণেই তাঁহাকে বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহা না হইলে হয়তো সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করিতে পারিত। কিন্তু কি হইলে কি হইতে পারিত তাহা লইয়া গবেষণা করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু মনে রাখা আবশ্যক যে, দেশে ঐক্য বিধানের জন্য তিনি একটি রাষ্ট্রভাষা প্রবর্তনের উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সর্বাপেক্ষা উপযোগী ভাবিয়াছিলেন। হিন্দীর কথা তিনি ভুলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন ঃ

"ভারতবর্ষের লোক যত এক হয় ততই ভাল। এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা উঠাইয়া দিয়া এ প্রদেশে হিন্দী প্রচলন করিতেও আমি প্রস্তুত আছি।"

তিনি বাঙ্গালা ও হিন্দীর তুলনা করিয়া বুঝিয়াছিলেন বাঙ্গালা যে পরিমাণ উন্নতি লাভ করিয়াছে, হিন্দী সে পরিমাণ করে নাই। তথাপি বাঙ্গালা দেশে হিন্দী প্রচার করিতে—বাঙ্গালা উঠাইয়া দিয়া হিন্দী প্রচার করিতে—তাঁহার আপত্তি ছিল না। ইহা হইতে কেহ যেন না মনে করেন যে মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের অভাব ছিল। বস্তুতঃ মাতৃভাষাকে তিনি কতখানি ভাল বাসিতেন তাঁহার সাহিত্যের মধ্যেই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ আছে, অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই। কিন্তু দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য যে মাতৃভাষাকেও তিনি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, ইহার দ্বারা তাঁহার মানসিক ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবাবেগ অপেক্ষা যুক্তির প্রতিই তাঁহার প্রবণতা ছিল অধিক—এটাও তাঁহার প্রকৃতির আর এক পরিচয়।

যাহাই হউক উড়িষ্যায় তাঁহাকে অধিক দিন থাকিতে হইল না। এই সময় সার্ উইলিয়ম হাণ্টার[১] একবার কটকে আসেন। তাঁহার সহিত ত্রৈলোক্যনাথের পরিচয় হয়। ত্রৈলোক্যনাথের

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

কথাবার্তা শুনিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন এবং তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে হাণ্টার সাহেবের এরূপ উচ্চ ধারণা হয় যে তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে কলিকাতায় বেঙ্গল গেজেটিয়র সংকলন কার্যালয়ে তাঁহারই অধীনে ১২৫৲ টাকা বেতনে হেড ক্লার্কের পদ দিবার প্রস্তাব করেন। ত্রৈলোক্যনাথ সে পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন। ওই কার্যালয়ে তিনি সাহেবের অধীনে সেকেণ্ড লিটারারি অ্যাসিস্ট্যাণ্টরূপেও কাজ করিয়াছিলেন।[১] ১৮৭১ সালে হাণ্টার সাহেব ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারাল অফ্ স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ পদে উন্নীত হইলেন। তখনও ত্রৈলোক্যনাথ হাণ্টার সাহেবের অধীনেই কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হাণ্টার সাহেবের পরিচালনায় যে 'স্ট্যাটিস্‌টিকাল অ্যাকাউণ্ট অফ বেঙ্গল' সংকলিত হইতে থাকে—যাহা পরে ১৮৭৫ হইতে ১৮৭৭ সালের মধ্যে দশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়—তাহার সম্পাদনায় ত্রৈলোক্যনাথ সহায়তা করেন। বাঙ্গালা হস্তলিখিত দলিলপত্র সংকলনেও তাঁহার অংশ ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'Abstrat of Services' পুস্তিকায় আছে ;

> 1870—75 : Served as Second Literary Assistant and Head Clerk in the office of the Compiler of Bengal Gazetteers. Subsequently Director General of Statistics to the Government of India. Assisted in the Statistical Survey of Bengal......Assisted in the compilation of the Bengal MS. Records.

এতদ্‌ব্যতীত Annals of Bengal, Statistical Account of Bengal, Local Gazette প্রভৃতি গ্রন্থও ইহার সম্পাদিত।

১. Sir William Hunter.—[১৮৪১—১৯০০] সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ সালে বাঙ্গালায় আসেন। ১৮৭১ সালে 'ডাইরেক্টর জেনারেল অফ স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্'-এর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৭ পর্যন্ত বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৮৮৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার হন। ভারতীয় ভাষার শব্দ রোমান হরফে লিপ্যন্তরিত করিবার যে প্রণালী ইনি উদ্ভাবন করেন, তাহা Hunterian System of Transliteration নামে খ্যাত

১৮৭৫ সালে হাণ্টার সাহেব একবার বিলাত যান। তখন ত্রৈলোক্যবাবুকেও তিনি বিলাত যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায় তাঁহার সেবার বিলাত যাওয়া হইল না।

হাণ্টার সাহেব বিলাত গেলেন আর ত্রৈলোক্যবাবুও ডাইরেক্টর জেনারেল অফ স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের আফিসের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। হাণ্টার সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন না। ইংলিশম্যান আফিসে সণ্ডার্স ও বার্কেলে সাহেব তাঁহাকে লইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সেখানে তিনি গেলেন না। দেশের জন্য সত্যকার কিছু কাজ করিবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া তিনি বাঙ্গালাদেশ ত্যাগ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতে গেলেন। সেখানে তখন কৃষি-বাণিজ্যের একটি বিভাগ খোলা হইয়াছিল। ১৮৭৫ সালে তিনি এই বিভাগে হেড ক্লার্কের পদ গ্রহণ করিলেন। হেড ক্লার্কের পদ হইতে তিনি ক্রমান্বয়ে হেড সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং ডাইরেক্টরের পার্সনাল অ্যাসিস্টাণ্ট পদে উন্নীত হন।

এই কাজে ব্যাপৃত থাকিতে তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গেজেটিয়র প্রণয়নেও সহায়তা করেন। বাঙ্গালা দেশের গেজেটিয়রের কাজে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা এই সময় কাজে লাগে।

Abstract of Services পুস্তিকায় আছে:

1875—81: Served as Head Clerk. Department of Agriculture and Commers. N.-W. Provinces and Oudh; subsquently promoted to Head Superintendentship; finally made Personal Assistant to the Director. Assisted in the compilation of the N.-W. Provinces Gazetteer.

তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের কৃষি-বাণিজ্য বিভাগের কর্তা ছিলেন সার এডওঅর্ড বক। ইঁহার আফিসে কাজ করিতে করিতে

ত্রৈলোক্যনাথ দেশের উন্নতির দিকে মনোযোগ দিবার এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিজের কল্পনাকে প্রয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করেন। তাঁহার কল্পনার মধ্যে কিরূপ মৌলিকতা ছিল এবং সে কল্পনা বাস্তবক্ষেত্রে কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছিল তাহা তাঁহার কথাতেই বলি :

"উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য গঠিত হইত। যথা—কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি; লক্ষৌয়ের—গোটা, চিকন, সূচের কর্ম, সোনারূপার কাজ, বিদরীর কাজ, মুরাদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম; নগীনার কাঠের কাজ; ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে বাদশাহ, নবাব, আমীর-ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্মচারিগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্ন-কষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষিকার্যে অগ্রসর হইতেছিল। এই কারিকরদিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক্ সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম। বক্ সাহেব গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করিয়া এলাহাবাদ স্টেশনের নিকট একটি বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম। আমি নিজে হোটেল-স্বামী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিস বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি। এই হোটেলে বিলাত যাত্রী সাহেব মেমগণ দুই একদিন অবস্থিতি করিতেন। দেশে বন্ধুবান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব-বিবিরা এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেল-স্বামী এক জন ধনবান্ লোক। তাঁহার চক্ষু ফুটিল, গবর্নমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিতে লাগিলেন।" [১]

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় "বঙ্গভাষার লেখক"

দেশের শিল্পের প্রতি বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এইভাবে তিনি ভারতীয় শিল্প এবং শিল্পীর মর্যাদা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিলেন। দেশীয় শিল্পদ্রব্যসমূহের জন্য চাহিদার সৃষ্টি হইল। শিল্পীরা তাহাদের শ্রমের মূল্য পাইয়া উপেক্ষিত শিল্পের প্রতি আবার মনোযোগ প্রদান করিল।

ত্রৈলোক্যনাথের সহিত অত্যকার বাঙ্গালা দেশের পরিচয় নাই বলিলেই চলে। যৎসামান্য যেটুকু আছে তাহাও সাহিত্যিকরূপে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা ছিল বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা। সংকীর্ণ সুযোগের মধ্যেও সেই প্রতিভা তিনি বিকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৩৫০-এর মন্বন্তর তো আমাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল। লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল। সরকার পক্ষ ফুলজমিতে ফল ফলাইতে বলিলেন। তাহাতে ফল যে কি ফলিল তাহা দেশের লোক মনে করিয়া রাখিবে। কিন্তু আন্তরিকতা এবং সাধুতার অভাব না থাকিলে ত্বরিত-জন্মা ফলমূলের চাষ করিয়া যে দুর্ভিক্ষের সময় অনেকটা উপকার পাওয়া যাইতে পারে তাহার প্রমাণ দেখাইয়াছেন ত্রৈলোক্যনাথ। সে এ যুগের কথা নয়।

১৮৭৮ সালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুঃখ নিবারণকল্পে কি করা যায় তাহা গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত ভাবে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব তাহার ত্রুটি তিনি কখনও করেন নাই, আজও করিলেন না। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি হরিদ্বারের নিকটবর্তী রাজঘাটে আসিয়া পৌঁছেন এবং এইখানে কিছুদিন তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। এখানে যে কয়দিন থাকেন সে কয়দিন তিনি যব কিনিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের মধ্যে বিতরণ করেন। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হইল

যে একটি পয়সাও আর বাকী রহিল না। পরের কাছে রেল-ভাড়াটাও ধার করিয়া লইতে হয়।

দুর্ভিক্ষ দূর করিবার পথ যে ইহা নহে তাহা তিনি জানিতেন। যে উপায়ে সকলে কিছু খাইতে পায়, পরবর্তী ফসল না উঠা পর্যন্ত কোন রকমে প্রাণটা বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হয়, ত্রৈলোক্য-নাথ সেই উপায় আবিষ্কার করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। তিনি অনেক বিচার করিয়া দেখিলেন, গাজরের চাষ করিয়া এই দারুণ বিপদের হাত হইতে কিছুটা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এই আবিষ্কারের কাজ তাঁহার পক্ষে কিছু সহজ হইয়াছিল এইজন্য যে, কৃষি এবং সংখ্যাবিজ্ঞান এই উভয় বিভাগের অভিজ্ঞতাই তিনি কর্মসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। কতদিনের মধ্যে বীজ হইতে আহার-যোগ্য গাজর হয়, কখন কিরূপ জল দিবার প্রয়োজন, কি সার এই চাষের পক্ষে উপযোগী—খোঁজ করিয়া করিয়া, চাষীদের ঘরে গিয়া গিয়া, খেতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি এই সব তথ্য সন্ধান করেন। তাহার পর সরকারকে তাঁহার বক্তব্য জানান। সরকার তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া দুর্ভিক্ষকালে গাজর চাষের উপযোগিতার কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতের সরকার জেলায় জেলায় লোক পাঠাইলেন ১৮৭৮ সালের দুর্ভিক্ষে বিশেষ কিছু ফল হউক বা না হউক, দুই বৎসর পরে রায়বেরেলি, সুলতানপুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইলে সেখানে গাজরের চাষ আরম্ভ করা হয়। গাজর খাইয়া সেই দুর্ভিক্ষের সময় বহুলোক প্রাণ রক্ষা করে।

১৮৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রৈলোক্যনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কৃষিবাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারত সরকারের রাজস্ব ও কৃষি-বিভাগে বদলী হইয়া আসেন। 'Abstract of Services'-এ আছে :

> Transferred to the Revenue and Agricultural Department of the Government of India in September, 1881.

ভারতীয় শিল্পকলার চর্চা

১৮৮১ হইতে ১৮৯৬ পর্যন্ত এই পনের যোল বৎসর ধরিয়া ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন এবং কয়েকটি পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ভারতসরকারের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগে আসিয়াই ভারতীয় শিল্পকার্যের উন্নতির জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অভিজ্ঞতা এই কার্যে তাঁহার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন ভারতবর্ষে বিলাতী জিনিস যে পরিমাণ বিক্রয় হয় তাহাতে অনেক টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। বিদেশীর কাছে ভারতীয় জিনিস বিক্রয় করিতে পারিলে তাহার কিছুটা ফিরিয়া আসে। কাঁচা মাল চালান দিয়া বিদেশের টাকা দেশে আসে বটে, কিন্তু তাহাতে লাভ অল্প। এবং সেই কাঁচা মাল আবার রূপান্তরিত হইয়া যখন আমাদেরই দেশে ফিরিয়া আসে তখন আমরাই আবার বহুগুণ বেশী দাম দিয়া তাহা কিনি। তাহাতে লাভের অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হয়। তিনি সেই কারণে শিল্পদ্রব্য ব্যবসায়ের প্রতিই অধিকতর মনোযোগী হইলেন। তিনি এই বুঝিয়াছিলেন যে, কুটিশিল্পের উন্নতিতেই ভারতের উন্নতি। কিন্তু উৎসাহের অভাবে ভারতের কুটিরশিল্প লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। সস্তা বিলাতী জিনিস আসিয়া দেশীয় কুটিরজাত শৌখিন জিনিসকে হঠাইয়া দিতেছে। শিল্পীরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক না পাইয়া কাজ ছাড়িয়া দিতেছে। বংশানুক্রমিকভাবে যে সকল শিল্পী কোন না-কোন কুটির-শিল্পের ধারা অব্যাহত রাখিয়া আসিতেছিল তাহারা অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হওয়ায় সে ধারা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এইরূপে অনেক কুটিরশিল্প লুপ্ত হইয়া গেল। ত্রৈলোক্যনাথ এই কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধারকার্যেই কর্মজীবনের শেষ কয়টা বৎসর বিশেষভাবে মন দিলেন। তিনি অর্থনীতির এই তত্ত্বটা ভালরূপে জানিতেন যে, জিনিসের চাহিদা

বাড়িলেই উৎপাদন বাড়িবে। ভারতীয় কুটিরজাত শিল্পের চাহিদা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রচারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া তিনি প্রথমে একটি পুস্তক লিখিলেন।

ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ শিল্পদ্রব্য পাওয়া যায় এই পুস্তকে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল এবং সেই সেই জিনিস কোন্ প্রদেশে উৎপন্ন হয় এবং তাহাদের মূল্য কত তাহাও জানাইয়া দেওয়া হইল। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে ভারতীয় কারুশিল্পের প্রতি ইউরোপীয়গণের দৃষ্টি পড়িল। ভারতীয় কারুশিল্পীর হস্তনির্মিত বিবিধ দ্রব্য বিদেশীয়েরা প্রচুর মূল্য দিয়া কিনিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, ইউরোপীয়দের জন্য উদ্দিষ্ট বলিয়া পুস্তকটি ইংরাজীতে রচিত হইয়াছিল। উহার নাম "A Rough List of Indian Art Manufactures"; এই পুস্তক সম্বন্ধে Abstract of Services পুস্তিকায় নিম্নলিখিত বিবৃতি পাওয়া যায়:

> 1881—82 : At the request of the Honourable Member then in charge of the Department, published for Government a work entitled "A Rough List of Indian Manufactures".

'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, ইংরাজী ১৮৮২ সালে হল্যাণ্ডের আমস্টার্ডম নগরে এক প্রদর্শনী হয়। ঐ প্রদর্শনীতে যাইবার জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি যাইতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু Abstract of Services-এর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে বুঝিতে পারি যে, প্রদর্শনীর জন্য প্রেরিত দ্রব্য-নির্বাচন, তালিকা-প্রণয়ন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব তাঁহারই উপর অর্পিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তকে আছে, "......Gazetted as Officer in charge of the Indian Exhibits for the Amsterdam International Exhibition (24 Aug, 1882). 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে বলা হইয়াছে, "এই সময়ে (সম্ভবতঃ ১৮৮২ সালে) অকারাদি

বর্ণানুক্রমে ত্রৈলোক্যবাবু ভারতে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন।" 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়'[১] শীর্ষক পুস্তিকায় ত্রৈলোক্যনাথের যে ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "A Hand-book of Indian Products (Art Manufactures and Raw Materials"[২]); পুস্তকটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৭৫ এবং ১৮৮২ সালে কলিকাতা হইতে উহা প্রকাশিত। এই বই এবং পূর্বোল্লিখিত ইংরাজী অভিধান একই পুস্তক বলিয়া মনে হয়। ইংরাজী গ্রন্থ-পঞ্জীর মধ্যে ১৮৮২ সালে প্রকাশিত কোনো পুস্তকের নাম নাই। অনুমান হয়, বর্ণানুক্রমে লিখিত শিল্পতালিকার পুস্তকটি ১৮৮২ সালে লিখিত হইলেও ১৮৮৩ সালেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৮৩ সালে তাঁহার লিখিত আরও একটি শিল্পতালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল—"A Descriptive Catalogue of Indian Products contributed to the Amsterdam Exhibition 1883. Calcutta, 1883, pp. 190." সাহিত্যসাধক চরিতমালার পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত এই বিবৃতি দেখিয়া মনে হয়, আমস্টার্ডমের আন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী হয় ১৮৮৩ সালে। অথচ 'বঙ্গভাষার লেখক' প্রদর্শনীর তারিখ দিতেছেন ১৮৮২। ত্রৈলোক্যবাবুর স্বরচিত 'Abstract of Services'-এ বলা হইয়াছে যে ১৮৮২ সালের ২৪শে আগস্ট তারিখে Officer in charge of the Indian Exhibits for the Amsterdam International Exhibition—এই পদে তাঁহার নিয়োগের সংবাদ গেজেট করা হয়। খুব সম্ভব ঐ মেলা ১৮৮৩ সালের গোড়ার দিকেই অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানতঃ মেলায় পাঠাইবার জন্যই তিনি উক্ত বিবরণী-পুস্তিকা প্রণয়ন ও

১. সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩৬শ পুস্তিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ

২. উক্ত ইংরাজী গ্রন্থপঞ্জীতে 'Manufacturers' মুদ্রিত হইয়াছে, উহা নিশ্চয় মুদ্রাকরপ্রমাদ। গ্রন্থপঞ্জীর চতুর্থ পুস্তকের নামেও ঐ ভুলটি দেখা যায়।

প্রকাশ করেন। এই কারণে ১৮৮৩ সালেই উহার প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।

এদিকে ১৮৮৩ সালে কলিকাতাতেও এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী বসে। মেলাটি ১৮৮৩ সালের শেষের দিকে বসে এবং ১৮৮৪ সালের গোড়ায় ভাঙে। ইহারও ভার পড়িল ত্রৈলোক্যনাথের উপর। Abstract of Services এ আছে "....Gazetted as Officer in charge of the Exhibition Branch of the Government of India"; গেজেটের তারিখ ১৬ই মার্চ ১৮৮৩।

এই মেলার যে সমস্ত শাখা ছিল তাহার মধ্যে একটি অর্থনীতির শাখা—'Economic Court'। এই বিভাগে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হয় তাহার একটি তালিকা প্রণীত হইয়াছিল। ত্রৈলোক্যনাথ সেই তালিকা হইতে সংকলন করিয়া "A List of Indian Economic Products" নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, ১৮৮৪ সালে উহা প্রকাশিত হয়। 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক পুস্তিকার গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

১৮৮৬ সালে ইংলণ্ডে এক প্রদর্শনী হয়। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে এবার তিনি বিলাতে যান। বিলাতে তিনি দশ মাস অবস্থিতি করেন। ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে স্কটলণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, অষ্ট্রিয়া এবং ইটালি —ইউরোপের এই দেশগুলি দেখিয়া আসেন। ভারতবর্ষে ফিরিবার অল্পদিন পরেই আবার তাঁহাকে কর্মোপলক্ষে বিলাত যাইতে হয়, কিন্তু এবার তিনি তিন সপ্তাহ মাত্র বিলাতে ছিলেন। তাঁহার ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত "A Visit to Europe" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮৯ সালে এই গ্রন্থ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৭ সালের ১লা এপ্রিল তিনি কলিকাতা মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৬ পর্যন্ত এই কাজে নিযুক্ত থাকেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি কয়েকটি

শিল্পবিষয়ক পুস্তকও লিখেন। Abstract of Services-এ আছে :

1887—1896 : Services in the Indian Museum. Assistant Curator in charge of the Bengal Economic and Art Museum Collections (1 April, 1887). During the last two years under the special order of the Governmnet of Bengal I prepared two Monographs, viz, one on the 'Brass and Copper Manufactures' and the other on the 'Pottery and Glassware' of Bengal.

মিউজিয়মের সহকারী কিউরেটর পদে নিযুক্ত হইবার পরই তিনি সরকারের অনুরোধে "Art Manufactures of India" নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১] ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪৫১ এবং কলিকাতা হইতে ১৮৮৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়।[২] ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে ত্রৈলোক্যনাথ চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তেইশ বৎসর কাল বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া ১৯১৯ সালে পরলোক গমন করেন। শিল্প-বাণিজ্যবিষয়ক বহু গ্রন্থের বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। এগুলি অবশ্য বাঙ্গালায় লেখা। তাঁহার লিখিত A Visit to Europe নামক ইংরাজী ভ্রমণকাহিনী ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়পাঠ্য বহু পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত জন্মভূমি পত্রিকায় ত্রৈলোক্যনাথের নানাতথ্যসমন্বিত বহু প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। বিশ্বকোষ নামক বৃহৎ শব্দকোষ তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কিছুকালের জন্য তিনি 'Wealth of India' নামক এক ইংরাজী মাসিক পত্রিকার সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৩]

১. বঙ্গভাষার লেখক

২. ও ৩. ত্রৈলোক্যনাথ, সাহিত্যসাধক চরিতমালা

সাহিত্য-সেবা

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কিরূপে উন্নতি লাভ করিতে পারে, বিদেশীর কাছে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ভারতবর্ষের কেমন করিয়া অর্থবৃদ্ধি হয়, ভারতীয় শিল্পদ্রব্যসমূহের প্রতি কি উপায়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায়—এইসব দিকে ত্রৈলোক্যনাথ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে চিন্তা যে নিষ্ফলা হয় নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ ইতিপূর্বেই আমরা পাইয়াছি। ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের দান কতখানি তাহা এ দেশীয় অর্থনীতিকগণের বিচার্য বিষয়। কিন্তু আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে দানের পরিমাণ তো দূরের কথা দাতার নামটাই আমরা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ত্রৈলোক্যনাথের নাম মনে রাখা আমরা আবশ্যক বোধ করি নাই। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সেদিন নিতান্ত আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "সাহিত্যিক ও অর্থনৈতিক হিসাবে যে সমাদর তাঁহার প্রাপ্য আমরা তাঁহাকে তাহাতে বঞ্চিত করিয়া পূজ্যপূজার ব্যতিক্রম করিয়াছি।"[১] এই পূজ্যপূজার ব্যতিক্রম অতিশয় মর্মান্তিক হইয়াছে। আধুনিক যুগের অল্প পাঠকই তাঁহার নাম জানেন। এমন কি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু সাহিত্যিকের নিকটেও ত্রৈলোক্যনাথের নাম সুপরিচিত নয়। তাই আধুনিক সাহিত্যের মুদ্রিত ইতিহাসে ত্রৈলোক্যনাথের নাম অমুদ্রিত এবং তাঁহার রচিত সাহিত্যের কথা অনুল্লিখিত থাকিলেও আমাদের বিস্ময়োদ্রেক করে না। অথচ এই লেখকের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসসাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের আবির্ভাবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।[২]

১. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫ শ্রাবণ

২. সমালোচনা, সাধনা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ভাগ (এই ভূমিকার পরিশেষে পুনর্মুদ্রিত)

বঙ্কিমচন্দ্র যে হিসাবে ঔপন্যাসিক, শরৎচন্দ্র যে হিসাবে ঔপন্যাসিক, ত্রৈলোক্যনাথ সে হিসাবে ঔপন্যাসিক ছিলেন না, তাহা সত্য। উপন্যাসরচয়িতা বলিয়া নয়, বিশেষ ধরনের উপন্যাস লিখিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি সমাদর পাইবার অধিকারী। কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবীচৌধুরাণী প্রভৃতি উপন্যাস না লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যদি শুধু কমলাকান্তের দপ্তর লিখিতেন তাহা হইলেও আমরা যে কারণে তাঁহার দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতাম, শুদ্ধমাত্র গড্ডলিকা ও কজ্জলী বাহির হইবার পরই যে কারণে আমরা পরশুরামের আবির্ভাবকে বিস্ময়মুগ্ধচিত্তে অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম, ঠিক সেই কারণেই বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্য-নাথের দানকে শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লওয়া এবং স্মরণ করিয়া রাখা উচিত ছিল। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে যে রস পরিবেশন করিলেন, বাঙ্গালী পাঠক তৎপূর্বে তাহার আস্বাদ লাভ করে নাই। বিশুদ্ধ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে সুলভ নহে। শুধু হাসাইবার জন্য, আবোল-তাবোল বলিয়া মন ভুলাইবার জন্য যে, কেহ সাহিত্য রচনা করিতে পারে, এই জন্মবুড়ার দেশে একথা আগে কি কেহ চিন্তা করিতে পারিত? ত্রৈলোক্যনাথ শুধু হাসাইবার জন্যই কলম ধরিলেন। এমন কি যেখানে কাঁদাইবার কথা, সেখানেও হাসাইয়া ছাড়িলেন।

ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয় থাকিবার ফলে সে সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িয়া থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকারেরর কৃতিত্ব কমে না। বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিও কি ইংরাজী সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়েরই ফল নয়?

হাস্যরস অবলম্বন করিয়া ইতিপূর্বে আর কেহ উপন্যাস রচনা করেন নাই তাহা নহে। ইন্দ্রনাথ ওরফে পঞ্চানন্দের নাম এখনও অনেকের মনে আছে। তাঁহার 'কল্পতরু' বাঙ্গালায় প্রথম ব্যঙ্গ-

উপন্যাস। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও ব্যঙ্গ-উপন্যাস রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত 'মডেল ভগিনী' 'কালাচাঁদ' 'চিনিবাস চরিতামৃত' 'নেড়া হরিদাস' প্রভৃতি ব্যঙ্গ-উপন্যাস বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় হইলেও এককালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর পর ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহার রচনার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এবং এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই তাঁহাকে আর কাহারও সঙ্গে দলভুক্ত করিয়া দেওয়ার কথা মনে হয় না। বস্তুতঃ তাঁহার সাহিত্য এক হিসাবে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপেই গণ্য হইতে পারে। সাহিত্যে অদ্ভুত রসের সৃষ্টি বাঙ্গালা দেশে অনেকেই করিয়াছেন, আজও তাহার বিরতি হয় নাই। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্ট উদ্ভটরস বাঙ্গালায় একেবারে অজ্ঞাত ছিল। কঙ্কাবতী জাতীয় গল্প লিখিবার মত শক্তি এবং সাহস আজও বাঙ্গালা দেশে কয়জনের আছে?

(গল্পসাহিত্যে তাঁহার প্রথম রচনা এই কঙ্কাবতী। কঙ্কাবতীর পরে তিনি আরও অনেক গল্প উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কঙ্কাবতী এক হিসাবে তাঁহার কাল হইল। দেশের লোক বুঝিল না যে, কঙ্কাবতী উপন্যাসে যে সকল চিত্র আছে সে তাহাদেরই ঘরের চিত্র। ভূত কোম্পানির দুইজন অংশিদার স্কল ও স্কেলিটন, ব্যাঙ্ সাহেব মিস্টার গামিশ, মশকরাজ দীর্ঘশুণ্ড ও তাঁহার পরিবার পরিজন, হাতী-ঠাকুরপো, ঘ্যাঁঘোঁ ভূত, নাকেশ্বরী ভূতিনী—ইহারা সকলেই যে তাহাদের আপনার লোক দেশবাসী একথা বুঝিল না। বাঙ্গালা দেশের পিতামাতারা নিজেদের জীবনবৃত্তান্তকে ভূত ভূতিনীর গল্প মনে করিয়া নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত আপন আপন পুত্রকন্যার হাতে সমর্পণ করিলেন। কাজেই উহা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ

বলিয়া পরিগণিত হইল। এবং অনতিকাল পরে শিশু ও বয়স্ক কাহারও পাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না।)

আমাদের দেশের তো এই অবস্থা, কিন্তু পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া দেখুন। Jonathan Swift-এর Gulliver's Travels-এর সমাদর আজিও মন্দীভূত হয় নাই। বালক বালিকারা তাহা আগ্রহের সহিত পড়ে। পিতামাতারাও পড়েন।

কঙ্কাবতীর গল্পের সঙ্গে Adventures of Alice in Wonderland এর আখ্যানভঙ্গীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। প্রধান সাদৃশ্য এই যে, কঙ্কাবতী এবং অ্যালিস উভয়েই যে জগতে ভ্রমণ করিয়াছে তাহা বস্তুজগৎ নয়, তাহা স্বপ্নলোক। অ্যালিসের স্বপ্ন নিদ্রার ঘোরে, কঙ্কাবতীর স্বপ্ন রোগশয্যায়। লুইস ক্যারল অ্যালিসের ভ্রমণকাহিনীতে যে সকল জীবের সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়া দেন, তাহারা সকলেই বিচিত্র। তাহাদের ভাবভঙ্গী, চলাফেরা, কথাবার্তা, সবই অর্থহীনতার রহস্যে আবৃত। ইংরাজীতে আবোল-তাবোল কবিতার অভাব নাই। অর্থহীন বলিয়া সেগুলি কিন্তু অনাদর পায় না সৌভাগ্যক্রমে এযুগে বাঙ্গালাদেশেও কেহ কেহ ঐরূপ কবিতার সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যদিচ স্বর্গীয় সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' এবং রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' ভিন্ন উল্লেখযোগ্য "অর্থহীন" কবিতার বই আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে অনেকটা অর্থ-অসংগতির রস পাওয়া যায়। Adventures of Alice in Wonderland বইটি পড়িতে পড়িতে সেই কারণেই আমার মনে হইয়াছিল উহা যেন একটি গদ্য ভাষায় লেখা খাপছাড়া কবিতা। কঙ্কাবতীর সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলিতে ইচ্ছা হয়।

(কঙ্কাবতী গল্পে যে সকল চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই সেগুলি যে পরিচিত মানুষের চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই, তৎসত্ত্বেও উহাকে উদ্ভট উপন্যাস বলিতে বাধা দেখি না। গল্পটিকে সমগ্রভাবে দেখলে

উদ্ভট অংশটাই প্রাধান্য পায়। বাঙ্গালী পাঠক বোধ হয় সেই কারণেই বইটিকে শিশুপাঠ্য দৈত্যদানার গল্পের শামিল মনে করিয়া নিজেদের পাঠের অযোগ্য ধরিয়া লইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ আজ জীবিত থাকিলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন যে, যাহাকে গালি দিলাম সে এতই নির্বোধ যে গালির অর্থ টাও বুঝিতে পারিল না।

কঙ্কাবতীর বিশেষত্ব এইখানে : ইহার দুইরূপ। বাহ্যতঃ ইহা ভূত-প্রেতের গল্প। সে গল্প শুধু শিশুর নয়, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপযোগী। কিন্তু ভূত-প্রেতের আবরণ ভেদ করিয়া যদি আর একটু ভিতরে প্রবেশ করা যায়, তখন ইহার আসল মূর্তি ধরা পড়ে, তখনই ইহার ব্যঙ্গরসটির আস্বাদন পাই। এই রস উপলব্ধি করিতে না পারিলে রসরচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথের কৃতিত্বের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

আবোল-তাবোল লেখার ক্ষমতা সকল লোকের থাকে না। রবীন্দ্রনাথ খাপছাড়ার মুখবন্ধে লিখিয়াছেন :

"লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয়তো।"

ত্রৈলোক্যনাথ এই 'যা-তা' লেখার কঠিন আর্টে সিদ্ধহস্ত তো ছিলেনই। 'যা-তা' কে অবলম্বন করিয়া তিনি যে ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার কৃতিত্বের সমধিক পরিচায়ক।

সাহিত্যে হাস্যরসকে উচ্চস্থান দিতে আমরা সাধারণতঃ একটু কুণ্ঠাবোধ করি, বিশেষতঃ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সঞ্জাত হাস্যরসকে। তাহার এক কারণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে লেখকের একটা কোনো উদ্দেশ্য থাকেই। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যও সে হিসাবে উদ্দেশ্যমূলক, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। "যদিচ তাঁহার রচনা…নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, তথাপি তাহাদের অন্তর্নিহিত প্রেরণা অভিন্ন এবং এক। দেশের কল্যাণসাধনাই তাঁহার লেখনীধারণের আসল উদ্দেশ্য।

…ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যক্ষভাবে দেশের মঙ্গলের জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত রচনাই, সমস্ত রসরচনাও উদ্দেশ্যমূলক।[1] সমালোচকেরা যতই বলুন 'Art for art's sake', তবু একথা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই উদ্দেশ্যমূলক? "যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই। জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই ·।"[2] যদি বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি স্মরণ রাখিয়া ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই তবেই লেখকের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হইবে।

(আসল কথা উদ্দেশ্যের অস্তিত্বই সাহিত্যকে রসহীন করে না। তবে সেই উদ্দেশ্যের অভিব্যক্তির উপর রসের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে, ইহা নিঃসন্দেহ।) একই রোগ দূর করিবার জন্য কি সর্বদাই এক ঔষধ ব্যবহার করা হয়? যে রোগে এক বৈদ্য রোগীর মস্তকে ঘৃতকুমারীর প্রলেপ ব্যবস্থা করেন সেই রোগে আর একজন বৈদ্য কি রোগীর নাসারন্ধ্রে লঙ্কার ধোঁয়ার ব্যবস্থা করেন না? অনেক ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত নরম পন্থা অপেক্ষা শেষোক্ত গরম পন্থা যে অধিকতর ফলপ্রদ হয় না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথ শেষোক্ত পন্থাতেই অধিকতর আস্থাবান ছিলেন। লঙ্কার ধোঁয়ায় হাসি আসে না, কান্না আসে। কিন্তু ব্যঙ্গসঞ্জাত হাসি তো কান্নারই রূপান্তর মাত্র। এ হাসির সহিত কান্নার যদি কোনো ভেদ থাকে তো সে কেবল বেদনার মাত্রায়।

(সাহিত্যিক হাস্যরসের যে হাসি তাহা নির্মল নিরঞ্জন আনন্দ হইতে উদ্ভূত নহে, তাহার মূল উপাদান কৌতুক। যে হাসির মূলে কৌতুক নাই তাহা আর যে রসেরই হউক, হাস্যরসের উদ্রেক করিতে পারে না। "কৌতুক হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয় তাহাকে

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,' শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে শ্রাবণ ১৩৩৪

২. 'বাঙ্গালা ভাষা', "বিবিধপ্রসঙ্গ", বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঠিক আনন্দ বলা চলে না, তাহাকে আমোদ নাম দিলেই সংগত হয়। আনন্দে স্নিগ্ধতা আছে, কিন্তু আমোদে আছে উত্তেজনা। এই উত্তেজনার সঙ্গে নিষ্ঠুরতার কিছু না কিছু যোগ আছে। কৌতুকের মধ্যে সে নিষ্ঠুরতার নিদর্শন সুস্পষ্ট।" ১)

প্রিস্টলির মতে "A degree of barbarism and rusticity seems necessary to the perfection of humour."[২]

হাস্যরসের সহিত যে বর্বরতা ও গ্রাম্যতার কিছু যোগ থাকে তাহা সত্য। বাসরঘরে শ্যালিকার হস্তে কর্ণমর্দন, তন্দ্রাগত গুরুমহাশয়ের শিখা কর্তন, নিদ্রিত ব্যক্তির নাসিকায় নস্যপ্রদান, চৌকিতে বসিতে দিয়া উপবেশনকারীর অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ হইতে চৌকি অপসারণ প্রভৃতি সুপ্রচলিত কৌতুকপ্রচেষ্টা শাস্তরসাস্পদ বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। ইহাদের মধ্যে আঘাত আছে এবং সেই আঘাতই কৌতুকের প্রধান উপাদান।

কিন্তু এই আঘাতটাই শেষ কথা নয়। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, এই আঘাতের মূলে আছে অসামঞ্জস্য ও অসংগতি। যাহা হওয়া উচিত এবং যাহা হইতেছে বা হইয়াছে, অর্থাৎ সম্ভাব্য এবং সম্ভূত এই দুইয়ের মধ্যে যখন বিরোধ ঘটে তখনই কৌতুকের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। দুই জোড়ার দুই পাটি জুতা পায়ে দিলে হাসি পায়, বাড়ীতে বিলাতী কাপড় পরিয়া সভাস্থানে খদ্দর ব্যবহার করিলে হাস্যোদ্রেকের কারণ হয়, পুরুষ মানুষের মেয়েলী ভাব দেখিলে হাসি আসে; ঘরে যাহার 'ছুঁচোর কীর্তন' বাহিরে সেই ব্যক্তির কোঁচার পত্তন হাস্যকর।

> "এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসংগতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসংগতি এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে।" ৩

১. 'আনুকাল্পিক হাস্যরস', শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, "মাসিক বসুমতী", মাঘ ১৩৫১

২. English Humour, J. B. Priestley

৩. 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', "পঞ্চভূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই যে নিষ্ঠুরতা ইহার মূল কারণটাই হইল নিয়মভঙ্গ।

"নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্য নৈমিত্তিক সহজনিয়মসংগত নহে; তাহা মাঝে মাঝে একদিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।" ১

এই নিয়মভঙ্গ এবং তজ্জনিত পীড়া এবং তজ্জাত উত্তেজনা ইহাদিগকেও রুচিভেদে স্থূল সূক্ষ্ম, অমার্জিত সুমার্জিত, ইতর ভদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় এবং প্রত্যেক শ্রেণীকেও বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা চলে। ব্যক্তিগত পরিহাসই বিবর্তনবিধি অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের পরিহাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। কাজেই আদিম মানবের সহিত আধুনিক মানবের যে পার্থক্য, আদিকালের রসিকতার সহিত আধুনিক কালের রসিকতার সেই প্রভেদ। এক সমাজের মানুষ যে হিসাবে অন্য সমাজের মানুষ হইতে পৃথক, এক সম্প্রদায়ের রসিকতাও অন্য সম্প্রদায়ের রসিকতা হইতে সেই হিসাবে পৃথক হইয়া থাকে। সেই কারণেই সকলের লেখা সকলের ভাল লাগে না।

নিয়মভঙ্গই যদি কৌতুকের উপকরণ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৌতুকের উপকরণের অভাব নাই।

যাহার কণ্ঠে সুর নাই সে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেছে, যে ছন্দ মিলাইতে অক্ষম সে রাশি রাশি কাব্যগ্রন্থ ছাপাইতেছে, যে নিজে বিকৃতমস্তিষ্ক সে অন্যকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতেছে, খোশামোদপ্রিয় বলিয়া যে রামের নামে নিন্দা রটায় সেই আবার শ্যামের শ্রীচরণকমলে গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতেছে। যাহা হওয়া উচিত তাহাই নিয়ম। কিন্তু যখন উচিতের স্থলে অনুচিতটা

১. 'কৌতুকহাস্যের মাত্রা', "পঞ্চভূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘটিয়া বসে তখনই হয় নিয়মভঙ্গ। আমাদের জীবনে নিয়মভঙ্গের কি অভাব আছে?

ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী, শুধু কঙ্কাবতী কেন তাঁহার সকল রসরচনাই, এই নিয়মভঙ্গের অজস্র দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ।

অর্থের লোভে বৃদ্ধ জনার্দন চৌধুরীর সহিত তনু রায় কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করিলেন। কঙ্কাবতীর বিবাহে তাহার পিতা অপেক্ষা ভ্রাতার উৎসাহই বেশী। সে মার নিকটে গিয়া সংবাদটা জানাইলে মা তো মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

"মা বলিলেন,—সে কিরে? ওরে সে কি কথা? ওরে জনার্দন চৌধুরী যে তেকেলে বুড়ো! তার যে বয়সের গাছপাথর নাই। তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি রে?

"পুত্র উত্তর করিলেন,—বুড়ো নয় তো কি যুবো? জনার্দন চৌধুরী তুলো করিয়া দুধ খায় নাকি? না ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করে? মা যেন ঠিক পাগল। মার বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নাই। কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, তালুক-মুলুক দিবে, বাবাকে দুই হাজার টাকা দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। থুড়থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তি সামর্থ্য থাকলে এখন কত দিন বাঁচিত তার ঠিক কি? মা, তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।"[১]

বিবেচক পুত্রের সুবিবেচনার কথা শুনিয়া মাতার দুই চক্ষু বাহিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু পাঠকের মুখে হাস্য দেখা দিল। এ হাসি আনন্দের হাসি নয়। কঙ্কাবতীর প্রতি সমবেদনায় যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ তাহার ভাবী বিপদের সম্ভাবনায় হাসি আসে কোথা হইতে? এ সেই নিয়মভঙ্গের হাসি, অসংগতি-সঞ্জাত কৌতুকের হাসি। ভগ্নীর বিবাহে ভ্রাতার নিকট হইতে পাঠক যে মনোভাব আশা করেন ভ্রাতা তাহার বিপরীত

১. কঙ্কাবতী, প্রথম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভাবের পরিচয় দিল। পাঠকের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাপ্তির মধ্যে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য রহিল না।)

সুখ ও কৌতুকের মধ্যে যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে, হাস্যের দ্বারা উভয়ের অভিব্যক্তি ঘটিলেও যে উাহারা স্বতন্ত্র জাতির অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথ তাহা 'কৌতুক-হাস্য' প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

"তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যখন একঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তির তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোনো ধর্মসংগত অথবা যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কি বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়।" [১]

অতঃপর কৌতুকতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা এই যে, কৌতুকটা আসলে সুখ নহে। যে সমবেদনা-বৃত্তিপ্রভাবে তৃষিত ব্যক্তি জল পাইলে আমাদের সুখোদয় হয়, সেই একটি বৃত্তিপ্রভাবেই তৃষিত ব্যক্তি জল না পাইলে অথবা জলের বদলে বেল পাইলে আমাদের মনে দুঃখের উদয় হয়। এই যে দুঃখ, ইহাই কৌতুক। অল্প পরিমাণের দুঃখ আমাদের চেতনা শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া কৌতুক উৎপাদন করে। কিন্তু পরিমাণের সীমা লঙ্ঘন করিলেই কৌতুক আর কৌতুক থাকে না, পীড়ায় পরিণত হয়।

কশাইয়ের পক্ষে পশুহত্যা স্বাভাবিক, কিন্তু গড়গড়ি মহাশয়ের গুরুদেবের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক। তাঁহার নিষ্ঠাচরণের সহিত

১. 'কৌতুকহাস্য', "পঞ্চভূত", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিষ্ঠুরতার অসামঞ্জস্যটাই আমাদের চৈতন্যকে আঘাত করে, সেই আঘাতে আমরা বিদ্রূপের হাস্য হাসি।

গড়গড়ির গুরুদেবের কার্যকলাপে আরও অসংগতি আছে। তিনি যে শুধু পশুহত্যা করেন, তাহাই নয়। তিনি পা দিয়া ছাগলের মুখ মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই তাহার মুণ্ডের দিক হইতে ছাল ছাড়ান। নিষ্ঠুরতার দিক হইতে ইহার অপেক্ষা মর্মান্তিক আর কি হইতে পারে! কিন্তু তথাপি ইহা যে-রসের সৃষ্টি করে তাহাকে ঠিক করুণ রস বলা চলে না। ত্রৈলোক্যনাথ পাঠকের মূক হৃদয়-বেদনাকে বিদ্রূপের অট্টহাস্যে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন।

কৌতুকতত্ত্বের দিক দিয়া এখানে একটা সংশয়ের উদয় হয়। বলা হইয়াছে, অল্প পরিমাণের আঘাত আমাদের চৈতন্যকে ঈষৎ উত্তেজিত করিয়া যে সুখাবহ দুঃখের উৎপত্তি করে তাহাই কৌতুক, সেই কৌতুকে আমরা হাসি। আঘাতের পরিমাণ অধিক হইলে দুঃখের পরিমাণও বাড়ে, এবং নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিলে কৌতুক বেদনা-জনক দুঃখে পরিণত হয়। তখন মানুষ আর হাসে না, কাঁদে। এখন তর্কচ্ছলে যদি প্রশ্ন করা হয়, জীয়ন্ত ছাগলের চামড়া ছাড়ানোর বিবরণ কি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট দুঃখজনক নয়? কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটা জীবিত ছাগলের চামড়া ছাড়ায় তবে কি আমরা কৌতুক অনুভব করিয়া হাসিব?

না, হাসিব না। কিন্তু গড়গড়ি মহাশয়ের গুরুদেব যখন এই কাজ করেন তখন হাসি। তাহার কারণ বেদনার অল্পতা নয়, অসংগতির আধিক্য। গুরুদেবের ব্যবহারে নিষ্ঠুরতা আছে এবং অসামঞ্জস্যও আছে। এই উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে নিষ্ঠুরতার অপেক্ষা অসামঞ্জস্যটাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই কৌতুকহাস্যের কারণ।

নিষ্ঠুরতার প্রসঙ্গে গদাধর ঘোষের নাম স্বভাবতই মনে আসে। গদাধর ঘোষ অতিশয় সদাচারপরায়ণ স্বধর্মনিষ্ঠ লোক। একদিন খেতু

গদাধরের হাতে একটু বরফ দিয়া উহা খাইয়া দেখিতে বলে। গদাধর তাহা কিছুতেই খাইল না। সে বলিল, "সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন, সে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জাতি যায়।" এ হেন ধর্মনিষ্ঠ গদাধর ঘোষ—জাতিপাত হইবার ভয়ে যে বরফ পর্যন্ত স্পর্শ করে না, ব্রাহ্মণের পদধূলি না লইয়া যে জলগ্রহণ করে না, এবং ব্রাহ্মণমাত্রকেই যে দেবতার সমান বলিয়া মনে করে—সেই গদাধর ঘোষ যৌবনকালে বিশুদ্ধ ঠেঙ্গাড়ে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিয়া আসিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ বলিয়াও কোনো পথিককে রেয়াত করে নাই। গদাধর ঘোষ একবার কিভাবে তিনটি ব্রাহ্মণকে 'সাবাড়' করিয়াছিল, তাহার বিবরণও জীয়ন্ত ছাগলের ছাল-ছাড়ানো অপেক্ষা কম নিদারুণ নহে, হাস্যকরতার দিক দিয়াও দুই ঘটনার মধ্যে মিল আছে, বরং গদাধরের কাহিনীতে কৌতুকের পরিমাণ কিছু অধিক।

গদাধরের দলের সর্দার ছিল কমল। কমল জাতিতে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়াই দ্বিজভক্ত গদাধর এবং তাহার অনুগামীরা কমলকে সর্দার করিয়াছিল। কমল মানুষ খুন করিত, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কমল যে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। মুখ দিয়া যাহা একবার উচ্চারণ করে তাহার অন্যথা হইবার উপায় নাই, কাহাকেও অভিশাপ দিলে তাহা না ফলিয়া যায় না। গদাধর কমলের সেই ব্রাহ্মণ্যশক্তির পরিচয় দিতেছে। তিনটি ব্রাহ্মণকে মারিয়া সেবার কমল-গদাধর সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লাভ হয়। নশিরাম সর্দার কি করিয়া সংবাদটা পান। তিনি ভাগ চাহিয়া বসিলেন। কমল ভাগ দিতে রাজী নহে। রাজী না হইবার যুক্তিসংগত কারণ ছিল। এ কাজে নশিরামকে তো কোনো পরিশ্রম করিতে হয় নাই।

কথায় কথায় কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল; ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পইতা ছিঁড়িয়া নশিরামকে শাপ দিলেন। কমল ভট্টাচার্য। সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ।

শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল।"

জনার্দন চৌধুরী ও গোবর্ধন শিরোমণির সম্মুখেই ঐ ব্রাহ্মণবধের বিবরণ দিবার সময় গদাধর যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সহিত কমলের নাম উল্লেখ করিতেছে তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গদাধর ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলেই ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া উঠে। এমন কি যে পথিক ব্রাহ্মণের মাথাটি স্বহস্তে পাথর দিয়া ছেঁচিয়া দিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধেও গদাধরের ভক্তি কম নয়। সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়া গদাধর বলিতেছে :

"কমল তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভিকুণ্ডলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ দেবতার এমনি প্রাণ যে তিনি অজ্ঞানও হন না মরেনও না।"

যাহাই হউক, ব্রাহ্মণ দেবতার "মাথাটি ছেঁচিয়া" দিবার পর যে গরদের কাপড়গুলি হস্তগত হয় গদাধর ও কমল তাহা হইতে একজোড়া ভাল কাপড় শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিল। শিরোমণি মহাশয়ও পরম নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ। শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর তাঁহার জিহ্বাগ্রে। ব্রাহ্মণহত্যা প্রসঙ্গে গদাধর ঘোষের মুখেই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে :

"...আমরা সেই দুইজনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটি পলাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন, আমিও আমার কাজটি সমাধা করিয়া তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া 'ব্রহ্মহত্যা হয়; ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করুন',—এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুরবচনে বলিলেন,—জীবন

ক্ষণভঙ্গুর। পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু! এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া বাটীর বাহিরে দিয়া শিরোমণি মহাশয় ঝনাৎ করিয়া বাটীর দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন কমল পুনরায় তাঁহাকে মাঠের দিকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন।"

মনুষ্যচরিত্রের অসংগতিই লেখকের প্রধান লক্ষ্য। সেই অসংগতির প্রতিই তাঁহার বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়াছে। ভণ্ডামির প্রতি তাঁহার প্রচণ্ড আক্রোশ কৌতুকের শর্করামণ্ডিত ছুরিকার ন্যায় একেবারে মর্মস্থলে যাইয়া আঘাত করে। গোঁড়ামির প্রতি তাঁহার অসহ্য বিদ্বেষ। কঙ্কাবতী গল্পের গদাধর ঘোষ, গোবর্ধন শিরোমণি, জনার্দন চৌধুরী, ষাঁড়েশ্বর, কমলের বিধবা পত্নী প্রভৃতি চরিত্রে লেখকের সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সুলভ।

মানুষের চরিত্রে দুর্বলতার অভাব নাই। এবং অভাব নাই বলিয়াই তাহা সর্বদা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। ব্যঙ্গ-সাহিত্যিকগণের নজর কিন্তু সেই দিকেই বেশী। তাঁহারা কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে পাঠককে ডাকিয়া ডাকিয়া সেই দিকে তাঁহাদের মনোযোগ পরিচালিত করেন, আবার কখনো বা ফিসফিস করিয়া কানে কানে কথা বলিয়া মুখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া আঙুল বাড়াইয়া সেদিকে ইঙ্গিত করেন। অন্যশ্রেণীর সাহিত্যিকের সহিত ব্যঙ্গশিল্পীর প্রভেদ এইখানে।

"ব্যঙ্গশিল্পী ও অন্যশ্রেণীর সাহিত্যিকদের মধ্যে দৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ আছে। জগৎ ভালোয় মন্দে রচিত। কোনো কোনো লেখকের চোখে ভালোর দিকটাই বেশী করিয়া পড়ে; জগতের আনন্দরূপের দ্বারা তাঁহারা অনুপ্রাণিত হন। আবার কোনো কোনো লেখক জগতের দুঃখের দিকটা অভাব অভিযোগ ত্রুটি বিচ্যুতির দিকটাই বেশী করিয়া দেখিতে পান। জগৎতন্ত্রে আনন্দের অভাবটাই তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। শেষোক্তগণও আনন্দের প্রার্থী, নতুবা আনন্দের অভাব তাঁহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত না। তাঁহারাও

আনন্দযুদ্ধে অবতীর্ণ, কেবল তাঁহারা পরাজিত, এইমাত্র প্রভেদ। তাঁহাদিগকে বলা যায় আনন্দের ভগ্নদূত।"[১]

ত্রৈলোক্যনাথ এই শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্পী, আনন্দযুদ্ধের অন্যতম ভগ্নদূত। তিনি সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই দেখিয়াছেন যে, মানুষের কাছে স্বার্থের মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বার্থের জন্য সে সব করিতে পারে, স্বার্থের জন্য সে দয়ামায়া পরিত্যাগ করিতে পারে, স্বার্থের জন্য সে সত্য-মিথ্যার ভেদ ভুলিতে পারে, স্বার্থের জন্য সে আত্মীয়ের সর্বনাশ করিতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ মানুষকে নিঃস্বার্থ হইতে বলেন না। তিনি জানেন মানুষ কখনো দেবতা হইবে না। কিন্তু তাঁহার রাগটা ঐ ভণ্ডামির উপর। তিনি বলেন—তুমি চুরি করিতে চাও কর কিন্তু সাধু সাজিও না; মানুষ খুন করিতে চাও কর কিন্তু কেহ বরফ খাইতে দিলে জাত যাইবে বলিয়া লাফাইয়া উঠিও না; মদ্যসহযোগে হ্যাম খাইতে চাও খাও কিন্তু নীচের তলায় হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ রাখ; কসাইবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জন করিতে চাও কর কিন্তু শিষ্য সেবক যজমানদের মাথায় শ্রীচরণ তুলিও না। তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিবে কে? তাই রাগ করিয়া বিদ্রূপ করিয়া তিনি সকলকে শুনাইতে চান।

ত্রৈলোক্যনাথ দুই চোখ দিয়া পৃথিবীটাকে উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া লইয়াছেন। তাঁহার মনে কোনো মোহ নাই, কোনো সংশয় নাই। জীবতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু গবেষক চিড়িয়াখানার পশুগুলাকে যে ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, এই পৃথিবীর মানুষগুলাকে তিনি তেমনি ভাবে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তেমনিভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ তিলক কাটুন, টিকি রাখুন, পূজা অর্চনা করুন তাহাতে ত্রৈলোক্যনাথের আপত্তি নাই। কিন্তু মদও খাইবে আর

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যকীর্তি' প্রমথনাথ বিশী. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ শ্রাবণ ১৩৫৪

টিকিও রাখিবে তাহা তিনি সহিতে পারেন না। ত্রৈলোক্যনাথের 'ভূত ও মানুষ' গ্রন্থের বাঙ্গাল নিধিরাম গল্প হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

"এক জন বলিলেন, 'উদ্ধব দাদার মদটুকু খাওয়া আছে, আবার টিকিও রাখা আছে।'

"উদ্ভব দাদা উত্তর করিলেন, 'ওহে তোমাদের টিকি না রাখিলে চলে, আমার চলে না; বংশজ ব্রাহ্মণ, বিয়ে হয় নাই। কাওরানীর ঘরে থাকি, দেখা সাক্ষাৎ কাওরানীর ভাত খাই। কেহ কিছু গোল তুলিলে অমনি টিকিটা খাড়া করিয়া ধরি। বলি, 'এই দেখ বাবা; টিকি আছে।' অমনি সবাই চুপ, আর কথাটি কবার জো থাকে না;

"আর একজন বলিলেন, 'কেন? ফোঁটা কাটিলেই তো হয়? রামেশ্বর খুড়োর মত ফোঁটা দেখালেই তো চলে?'

"উদ্ভব দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রামেশ্বর খুড়ো কি করিয়াছিলেন?' লোকটি বলিল, 'রামেশ্বর খুড়োর নাত্নীর বিবাহের কথা হইতেছিল। পাত্রপক্ষীয় লোকেরা কন্যা দেখিতে আসিবেন। রামেশ্বর খুড়োর ছেলে কিনু বলিল, 'বাবা! আজ আর মদ খাইও না। বাড়ীতে আজ দুইজন ভদ্রলোক আসিবে, একটা দিন নাই খাইলে?'

"রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন, 'রাম রাম! আজ কি মদ খাইতে পারি? যাই সকাল সকাল স্নান করিয়া আসি। তুমি জলখাবার আর রান্না-বান্নার জোগাড় করিয়া দাও।' এই বলিয়া রামেশ্বর খুড়ো স্নান করিতে গেলেন। স্নান-টান কিছু নয়, আস্তে আস্তে গিয়া শুঁড়ির বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সেই দুই প্রহর পর্যন্ত বসিয়া মদ খাইতে লাগিলেন। এদিকে নাতিনীকে দেখিতে ঘরে সেই ভদ্র লোকেরা আসিয়াছেন। 'কর্তা কোথায়? কর্তা কোথায়?' বলিয়া কিনুকে তাঁহারা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। 'স্নান করিতে গিয়াছেন, এখনি আসিবেন' এইরূপ বলিয়া কিনু তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। দুই প্রহর হইয়া গেল, রান্না প্রস্তুত, তবুও কর্তার দেখা নাই; যা হইয়াছে, কিনু তাহা বুঝিলেন। বাড়ী আসিয়া পাছে ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে ঢলাঢলি করেন, সেজন্য পিতাকে সাবধান

করিবার নিমিত্ত কিনু শুঁড়ির বাড়ীর দিকে চলিলেন; শ্রদ্ধাস্পদ পিতার সহিত পথে সাক্ষাৎ হইল। বগলে এক বোতল মদ লইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছেন। কিনু বলিলেন, 'বাবা! তোমার কি মান অপমানের ভয় একেবারেই গিয়াছে? তোমাতে আর কি কোনো পদার্থই নাই? এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার কি জ্ঞানগোচর একেবারেই গিয়াছে?' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন, 'কেন বাবা! হইয়াছে কি? এত রাগ কেন?' কিনু উত্তর করিলেন, 'হইয়াছে কি? বগলে ও কি!' রামেশ্বর খুড়ো বলিলেন, 'বগলে এ কি? বটে! আর কপালে এ কি? এটি দেখিলে আর ওটি বুঝি দেখিলে না।' রামেশ্বর খুড়ো শুঁড়ির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পানাপুকুর হইতে একটু কাদা লইয়া কপালে একটি ফোঁটা কাটিয়াছিলেন। ছেলেকে সেই ফোঁটাটি দেখাইলেন। টিকি না রাখিয়া ফোঁটা কাটিলেও চলে, না চলে এমন নয়।"

'ডমরু-চরিত' হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইল। ত্রৈলোক্যনাথ মানুষকে কিভাবে দেখেন কিভাবে বিচার করেন, তাহার অন্তরের অভিপ্রায় এবং বাহিরের আচরণের মধ্যকার অসংগতি কিভাবে লক্ষ্য করেন তাহার কয়েকটি অপরূপ দৃষ্টান্ত এই অংশটিতে আছে। তিনটা পাসকরা শঙ্কর ঘোষ, যাঁহারা "ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন" সেইরূপ বক্তা, ডমরুধর,—বাঙ্গালা ব্যঙ্গসাহিত্যে এসব চরিত্রের তুলনা নাই।

"আমি বলিলাম,—বাপু! তোমার নাম কি?

"সে উত্তর করিল,—আমার নাম শঙ্কর ঘোষ।

"তাহার বাড়ী কোথায়, সে কি কাজ করে, প্রভৃতি তাহার পরিচয় গ্রহণ করিলাম। তাহার পর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তুমি তিনটা পাস দিয়াছ। পাঁচ দ্রব্য মিশাইয়া নূতন বস্তু প্রস্তুত করিতে পার। ঔষধ বেচিয়া কি হইবে? কোন একটা লাভের বস্তু প্রস্তুত করিতে পার না?

"কিছুক্ষণ নীরবে সে চিন্তা করিয়া আমাকে বলিল,—কল্য আসিয়া আপনাকে এ কথার উত্তর দিব।

"পরদিন সে একরাশি এঁটেল ও চারি পাঁচ খানি ধবধবে চিক্কণ কাগজ আনিয়া আমাকে দেখাইল। সে বলিল—এঁটেল মাটি হইতে

আমি এই কাগজ প্রস্তুত করিয়াছি। এক টাকার এঁটেল মাটি হইতে দশ টাকার কাগজ হইবে। নয় টাকা লাভ থাকিবে। প্রথম প্রথম যাহা অল্প খরচ হইবে, তাহা যদি আপনি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা এক স্বদেশী কোম্পানি খুলিব। লাভ অর্ধেক আপনার অর্ধেক আমার।

এঁটেল মাটি ও কাগজ দেখিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। স্বদেশী সম্বন্ধে আমার একটু অভিজ্ঞতা আছে। ভাবিলাম যে, এ কাজ হাঁদাগুলো বাঙ্গালীর উপযুক্ত বটে। তাহার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

"চারি পাঁচ দিন পরে আমরা দুই জনে কলিকাতা গমন করিলাম। ভালরূপ একটা স্বদেশী কোম্পানি খুলিতে হইলে দুই চারি জন বড়-লোকের নাম আবশ্যক। আমরা তাহার জোগাড় করিলাম। একটি মীটিং হইল। এঁটেল মাটি ও কাগজের নমুনা দেখিয়া বড়লোকেরা ঘোরতর আশ্চর্য হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন বলিলেন,—এঁটেল মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আমি মনে করিতাম যে, খড়ি মাটি দিয়া কাগজ প্রস্তুত হয়।

"শঙ্কর ঘোষ উত্তর করিলেন—খড়ি মাটি দিয়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক পড়ে।

"কাগজ সম্বন্ধে ইঁহার এইরূপ গভীর জ্ঞান দেখিয়া অন্য সকলে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

"সেই যাঁহারা ইংরেজীতে বক্তৃতা করেন, যাঁহাদের বক্তৃতা শুনিয়া স্কুল-কলেজের ছোঁড়াগুলো আনন্দে হাততালি দিয়া গগন ফাটাইয়া দেয়, আমরা সেইরূপ দুই জন বক্তার জোগাড় করিয়াছিলাম। তাঁহারা ইজের দিয়া কোমর আঁটিয়া রাখেন। তাঁহাদের একজন বক্তৃতা করিলেন।

"আমাদের কোম্পানির নাম হইল,—গ্র্যাণ্ড স্বদেশী কোম্পানি লিমিটেড। কয়েকজন বড়লোক ও উগ্র বক্তা ডাইরেক্টর বা পরিচালক হইলেন। কারণ, এই সকল বড়লোক ও বক্তারা সকল প্রকার কারুকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে হুনুহর। ইঁহারা না জানেন, এমন বিষয় নাই। শঙ্কর ঘোষ ইংরাজী ও বাঙ্গালায় কোম্পানির বিবরণ প্রদান করাইয়া কাগজ ছাপাইলেন ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ

করিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, যে ব্যক্তি একশত টাকায় শেয়ার বা অংশ কিনিবে, প্রতিমাসে লাভ স্বরূপ তাহাকে পঁচিশ টাকা দেওয়া হইবে।

"দেশে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলে বলিতে লাগিল যে, আর আমাদের ভাবনা নাই। যখন এঁটেল মাটি হইতে কাগজ প্রস্তুত হইবে, তখন বালি হইতে কাপড় হইবে। বিদেশ হইতে কোন দ্রব্য আর আমাদিগকে আমদানি করিতে হইবে না। দেশ টাকায় পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া কলিকাতায় বাঙ্গালীরা একদিন সন্ধ্যাবেলা আপন আপন ঘর আলোকমালায় আলোকিত করিল।

"প্রথম প্রথম শত শত লোক শেয়ার কিনিতে লাগিল। হুড়হুড় করিয়া টাকা আসিতে লাগিল। আমি কোষাধ্যক্ষ ছিলাম টাকা সব আমার কাছে আসিতে লাগিল।

"কয়েক মাস গত হইয়া গেল। এঁটেল মাটি দিয়া শঙ্কর ঘোষ এক খানও কাগজ প্রস্তুত করিলেন না। মাসে পঁচিশ টাকা লাভ দিবার কথা ছিল, তাহার একটি পয়সাও কেহ পাইল না। আসল টাকার মুখও কেহ দেখিতে পাইল না। জনকয়েক আমাদের নামে নালিশ করিল। শঙ্কর ঘোষ চমৎকার এক হিসাবের বহি প্রস্তুত করিয়া কাছারিতে দাখিল করিলেন। লাভ দূরে থাকুক, হিসাবে লোকসান প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোম্পানি 'লিমিটেড' ছিল। মকদ্দমা ফাঁক হইয়া গেল। আমাদের কাহারও গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগিল না।

"অনেকগুলি টাকা লোকে দিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে সে টাকা-গুলি সমুদয় আমি লইলাম। শঙ্কর ঘোষ ভাগ চাহিল আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম,—হিসাবের বহি তুমি নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়াছ। তাহাতে তুমি লিখিয়াছ যে, লোকসান হইয়াছে। কোম্পানি ফেল হইয়া গিয়াছে। টাকা আর কোথা হইতে আসিবে। বরং যাহা লোকসান হইয়াছে, তাহা আমাকে দিয়া যাও।" [১]

হাস্যরসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করিতে গেলে দেখিতে হয় লেখকের আক্রমণের পাত্রটা কে। আক্রমণের ক্ষেত্র যত সংকীর্ণ

১. 'স্বদেশী কোম্পানি' "ডমরুচরিত", পঞ্চম গল্প, প্রথম পরিচ্ছেদ

যত সীমাবদ্ধ হয় হাস্যরসের মর্যাদা তত ক্ষুণ্ণ হয়। রাম যখন কৃপণ প্রতিবেশী শ্যামের সম্বন্ধে বলে যে তাহার নাম করিলে হাঁড়ি ফাটিয়া যাইবে তখন আক্রমণটা হয় ব্যক্তিগত। ইহাতে যদিও হাস্যরসের উদ্ভব হয় তবু তাহাকে উচ্চস্তরের হাস্যরস বলা যায় না। আক্রমণের ক্ষেত্র যত ব্যাপক হয়, যত বিস্তার লাভ করে, হাস্যরসও ততই মধুর হইতে মধুরতর হইতে থাকে। বস্তুতঃ হাস্যরসের আবেদন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সর্বজনের অভিমুখী হইলে তবেই সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে তাহাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে ব্যাপকতারও মাত্রাভেদ আছে। ভীরুতাকে আমরা ঘৃণা করি, মানুষের চরিত্রে উহা একটা নিন্দাজনক দোষ বলিয়া আমরা মনে করি। সে ভীরুতা যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিন্দার যোগ্য, তেমনি জাতিবিশেষের পক্ষেও। আবার সমগ্র মানবসমাজের পক্ষেও তাহা নিন্দনীয়।

আমরা যখন ব্যক্তিবিশেষের ভীরুতা লইয়া রসিকতা করি তখন তাহা ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়। কিন্তু যদি বাঙ্গালী জাতির ভীরুতা লইয়া ঠাট্টা করি, তখন তাহা ততটা অপাংক্তেয় থাকে না। বাঙ্গালীর দোষ বাঙ্গালীর দুর্বলতা লইয়া যদি বিদ্রূপ করি তাহা সাহিত্যের দরবারে প্রত্যাখ্যাত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলি: [১]

"বড়ো কথা শুনি বড়ো কথা কই,
জড়ো করে নিয়ে পড়ি বড়ো বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড়ো হই
    কে পারে রাখিতে চেপে।
কেদারায় বসে সারাদিন ধরে
বই পড়ে পড়ে মুখস্থ করে
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে
    বুঝি বা যাইব খেপে।"

১. 'বঙ্গবীর', "মানসী", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে যাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, জাতিকে আক্রমণ করিলে তাহাই রসসৃষ্টির সহায়ক হইল।) রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' কবিতাটি ইহার আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, একজাতীয় কবিতার রসগ্রহণ কেবল এক শ্রেণীর লোকের পক্ষেই সম্ভব। সমগ্র পৃথিবীর পাঠকের জন্য এ সব রচনা নয়।

আবার হাস্যরসের এমন উপাদানও আছে যাহা সকল মানুষেরই গ্রহণযোগ্য, সকল লোকই যাহা পড়িয়া উপভোগ করিতে পারে, অনুবাদ করিলেও যাহার রস ব্যাহত হয় না। উদাহরণস্বরূপ সুকুমার রায়ের 'বাবুরাম সাপুড়ে'র নাম উল্লেখ করি। ভীরুতার প্রতি কাপুরুষতার প্রতি বিদ্রূপ—ইহাই তো এ কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু এ বিদ্রূপের পাত্র দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়। পৃথিবীর সকল দেশে এ জাতীয় ভীরু আছে এবং থাকিবে; (কবি সর্বদেশের সর্বজাতির সর্ব সম্প্রদায়ের কাপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া যে শর নিক্ষেপ করিলেন তাহা অতীত হইতে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সর্বকালকে ভেদ করিয়া লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যান্তরে ছুটিয়া চলিবে।)

(ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় এই উভয় প্রকারের রসই দেখিতে পাই। লক্ষ্যবস্তুর পরিধি যত সংকীর্ণ তাঁহার হাসির নির্মলতা তত অল্প, সে হাসিতে ঝালের পরিমাণ কিছু বেশী। আক্রমণের পাত্র যতই সীমা ছাড়াইয়া যায় হাসির তাপও তত কমে। কঙ্কাবতী, ডমরুচরিত, মুক্তামালা প্রভৃতির মধ্যে এই উভয় রসের দৃষ্টান্ত অজস্র রহিয়াছে।) কিন্তু এই উত্তাপের একান্ত অভাব যে হাস্যরসে—যাহার নাম দিয়াছি উদ্ভটরস—তাহাই ত্রৈলোক্যনাথের বিশেষত্ব। কঙ্কাবতীতে তাহার অনেক উদাহরণ আছে। নাকেশ্বরী, ঘ্যাঁঘোঁ, খর্বুর, দীর্ঘশুণ্ড মশা, হাতী ঠাকুরপো, নক্ষত্রদের বউ, আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী প্রভৃতির বর্ণনা পাঠকের মনে যে রসের সঞ্চার করে তাহা কৌতুকরস হইলেও তাহাতে

উত্তাপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু এরূপ হাস্যরসের সর্বাধিক নিদর্শন পাই ডমরুচরিতে।')

ভিকু ডাক্তার কলিকাতার ডাক্তারখানায় ছয়মাস কম্পাউণ্ডারি করিয়া এক্ষণে স্বগ্রামে আসিয়া ডাক্তার হইয়াছেন। "সচরাচর হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তারদের—বিশেষতঃ হাতুড়েদের যেমন হয়, ভিকুর মুখ দিয়া সেইরূপ চড়বড় করিয়া কথার যেন খই ফুটিতে থাকে।" এই ভিকু ডাক্তার নিজের বিদ্যা জাহির করিতেছেন ঃ

"নেহালা গ্রামের ত্রিলোচন সরকেলের পেট ক্রমে ক্রমে ফুলিতে লাগিল; পেট ফুলিয়া ক্রমে জালার মত হইল। কত ডাক্তার কত বৈদ্য আসিল। কেহ বলিল উদরী, কেহ বলিল টিউমার। কত ঔষধ তিনি খাইলেন। কিছুতে কিছু হইল না। অবশেষে তাঁহার লোকেরা আমাকে লইয়া গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার পেটটি দেখিলাম। অবশেষে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের ঘরে মাছ ধরিবার সুতা বঁড়শি আছে? তাহারা সুতা বঁড়শি আনিয়া দিল। বঁড়শিতে হোমিয়োপ্যাথিক গুলির টোপ করিয়া সুতা সহিত রোগীকে গিলিতে বলিলাম। মুখের বাহিরে সুতাটির অপর দিক্ ধরিয়া আমি একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সুতা যেই একটু নড়িয়া উঠিল, আর সেই সময় আমি টান মারিলাম। বলিব কি মহাশয়! ধামার মত একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ তাঁহার পেট হইতে আমি বাহির করিলাম। জলের সহিত সামান্য শিশু কচ্ছপ সরকেল মহাশয় ভক্ষণ করিয়াছিলেন। উদরে সেই কচ্ছপ ক্রমে বড় হইয়া তাঁহার জীবন সংশয় করিয়াছিল। আমার চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হইলেন।

"আর একবার রাত্রি দুপ্রহরের সময় আমি ঝিল গ্রামের শ্মশান-ঘাটের নিকট দিয়া যাইতেছিলাম। দেখিলাম যে, সে স্থানে কয়েকটি ভূত কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া কমিটী করিতেছে। আমি একটু দূরে বসিয়া হোমিয়োপ্যাথিক পুস্তক বাহির করিলাম। দিয়াশালাই জ্বালিয়া তাহার আলোকে ভূতের ঔষধ দেখিলাম। তাহার পর যেই ঔষধের শিশি বাহির করিয়াছি, আর তাহার গন্ধ পাইয়াই ভূতেরা রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। একটু বিলম্ব করিলে আমার ঔষধের গুণে তাহারা

ভস্ম হইয়া যাইত। ভূতের ছাই দিয়া হিস্টিরিয়া রোগের চমৎকার চমৎকার ঔষধ আমি প্রস্তুত করিতে পারিতাম।

"ভিকু ডাক্তার আরও বলিলেন যে,—ভূতগণ যখন পলায়ন করিল, তখন আমি সেই স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, তাহারা এক মড়া ভক্ষণ করিতেছিল। মড়ার সর্ব শরীর হাত পা তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছিল, কেবল মুখটি অবশিষ্ট ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ দুইটি হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের গুলি বাহির করিয়া তাহার মুখে দিলাম। মুখে গুলি দিবামাত্র সে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর আশ্চর্য কথা কি বলিব মহাশয়! আমার ঔষধের গুণে তাহার শরীর গজাইতে লাগিল। প্রথম গলা হইল, তাহার পর বক্ষঃস্থল হইল, তাহার পর উদর হইল, তাহার পর হাত পা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তখন আমি বুঝিলাম যে, সে হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী নহে। সে রাত্রিতে আমি তাহাকে আমার বাটীতে লইয়া যাইলাম। পরদিন সে আপনার দেশে চলিয়া গেল। এখানে থাকিলে আপনাদিগকে দেখাইতাম। হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের গুণ আছে বটে, কিন্তু ঠিক ঔষধটি ধরা বড় কঠিন। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা হইয়াছে। রোগীর চেহারা দেখিলে আমি ঠিক ঔষধ ধরিতে পারি। আমার হাতে একটিও রোগী মারা পড়ে না। সেজন্য কলিকাতার হোমরা চোমরা ডাক্তারগণ, যাঁহারা ষোল টাকা বত্রিশ টাকা ভিজিট গ্রহণ করেন তাঁহাদের যখন হালে পানি পায় না, তখন তাঁহারা বলেন, ঝিঁঝিডাঙ্গার ভিকু ডাক্তারকে লইয়া এস, তিনি না হইলে এ রোগের ঔষধ ঠিক করিতে পারিবেন না। সেজন্য মাঝে মাঝে আমাকে কলিকাতায় যাইতে হয়।

"ভিকু পুনরায় বলিলেন, আমি আর একটি চমৎকার ঔষধ বাহির করিয়াছি। যে ঔষধে প্রজাপতি দক্ষের গলায় ছাগলের মুণ্ড জোড়া লাগিয়াছিল ইহা সেই ঔষধ। হাত পা এমন কি মানুষের মাথা কাটিয়া দুইখানা হইয়া গেলেও, আমি এক বড়িতে পুনরায় জুড়িয়া দিতে পারি।"[১]

ডমরুচরিতের অনেক গল্পই উদ্ভটরসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গাছে ঝোলা সাধু, ছালছাড়ানো বাঘ, সুন্দরবনের অদ্ভুত জীব, মশার মাংস,

১. ডমরুচরিত, পঞ্চম গল্প, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শূন্যপথে লোহার সিন্দুক, কুম্ভীর-বিভ্রাট প্রভৃতি গল্পাংশ না পড়িলে বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এখানে ডমরুচরিতের একটি গল্প তুলিয়া দিতেছি :

কুম্ভীর-বিভ্রাট

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুনিয়াছি যে, সুন্দরবনে নদী-নালায় অনেক কুমির আছে। তোমার আবাদে কুমির কিরূপ ?

ডমরুধর বলিলেন,—কুমির! আমার আবাদের কাছে যে নদী আছে, কুমিরে তাহা পরিপূর্ণ। খেজুর গাছের মত তাহারা বেড়ায়, অথবা কিনারায় উঠিয়া পালে পালে তাহারা রৌদ্র পোহায়। গরুটা, মানুষটা, ভেড়াটা, ছাগলটা, বাগে পাইলেই লইয়া যায়। কিন্তু এ সব কুমিরকে আমরা গ্রাহ্য করি না। একবার আমার আবাদের নিকট এক বিষম কুমিরের আবির্ভাব হইয়াছিল। গন্ধমাদন পর্বতে কালনেমির পুকুরে যে কুম্ভীর হনুমানকে ধরিয়াছিল, ইহা তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক, গঙ্গাদেবী যে মকরের পিঠে বসিয়া বায়ু সেবন করেন, সে মকরকে এ কুমির এক গালে খাইতে পারে। পর্বত প্রমাণ যে গজ সেকালে বহুকাল ধরিয়া কচ্ছপের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সে গজ-কচ্ছপকে এ কুমির নস্য করিতে পারে। ইহার দেহ বৃহৎ, তাল গাছের ন্যায় বড়, ইহার উদর এই দালানটির মত, অন্যান্য কুমির জীব-জন্তুকে ছিঁড়িয়া ভক্ষণকরে। কিন্তু এ কুমিরটা আস্ত গরু, আস্ত মহিষ গিলিয়া ফেলিত। রাত্রিতে সে লোকের ঘরে ও গোয়ালে সিঁদ দিয়া মানুষ ও গরু বাছুর লইয়া যাইত, লাঙ্গুলে জল আনিয়া দেওয়াল ভিজাইয়া গর্ত করিত। ইহার জ্বালায় নিকটস্থ আবাদের লোক অস্থির হইয়া পড়িল। প্রজাগণ পাছে আবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করে, আমাদের সেই ভয় হইল। তাহার পর লাঙ্গুলের আঘাতে নৌকা ডুবাইয়া আরোহীদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। সে নিমিত্ত এ পথ দিয়া নৌকায় যাতায়াত অনেক পরিমাণে বন্ধ হইয়া গেল।

এই ভয়ানক কুম্ভীরের হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাই, এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় আমার আবাদের নিকট একখানি নৌকা ডুবাইয়া তাহার আরোহীদিগকে একে একে আমাদের সমক্ষে সে গিলিয়া

ফেলিল। এই নৌকায় এক ভদ্রলোক কলিকাতা হইতে সপরিবারে পূর্বদেশে যাইতেছিলেন। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহিণীর সর্বাঙ্গ বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তোমরা জান যে, কুমিরের পেটে মাংস হজম হয়, গহনা পরিপাক পায় না। কুমির যখন সেই স্ত্রীলোককে গিলিয়া ফেলিল, তখন আমার মনে এই চিন্তা হইল,—চিরকাল আমি কপালে পুরুষ; যদি এই কুমিরটাকে আমি মারিতে পারি, তাহা হইলে ইহার পেট চিরিয়া ঐ গহনাগুলি বাহির করিব, অন্ততঃ পাঁচ ছয় হাজার টাকা আমার লাভ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি কলিকাতায় গমন করিলাম। বড় একটি জাহাজের নঙ্গর কিনিয়া উকো ঘষিয়া তাহাতে ধার করিলাম, তাহার পর যে কাছিতে মানোয়ারি জাহাজ বাঁধা থাকে, সেইরূপ এক কাছি ক্রয় করিলাম। এইরূপ আয়োজন করিয়া আমি আবাদে ফিরিয়া আসিলাম। আবাদে আসিয়া শুনিলাম যে, কুমীর আর একটা মানুষ খাইয়াছে। চারিদিন পূর্বে এক সাঁওতালনী এক ঝুড়ি বেগুন মাথায় লইয়া হাটে বেচিতে যাইতেছিল। সে যেই নদীর ধারে গিয়াছে, আর কুমীর তাহাকে ধরিয়া বেগুনের ঝুড়ির সহিত আস্ত গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে সাঁওতাল প্রজাগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; বলিতেছে যে, আবাদ ছাড়িয়া তাহারা দেশে চলিয়া যাইবে।

আবাদে আসিয়া নঙ্গরটিকে আমি বঁড়শি করিলাম। তাহাতে জাহাজের কাছি বাঁধিয়া দিলাম, মাছ ধরিবার জন্য লোকে যে হাতসুতা ব্যবহার করে, বৃহৎ পরিমাণে এও সেইরূপ হাতসুতার ন্যায় হইল। নঙ্গরের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগে এক মহিষের বাছুর গাঁথিয়া নদীর জলের নিকট বাঁধিয়া দিলাম। কাছির অন্যদিক এক গাছে পাক দিয়া রাখিলাম। বেলা তিনটার সময় আমাদের এই সমুদয় আয়োজন সমাপ্ত হইল।

বঁড়শিতে মহিষের বাছুর বিঁধিয়া দিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহার প্রাণ আমরা একেবারে বধ করি নাই। নদীর ধারে দাঁড়াইয়া সে গাঁ গাঁ শব্দে ডাকিতে লাগিল, তাহার ডাক শুনিয়া সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে সেই প্রকাণ্ড কুমির আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার লেজের ঝাপটে পর্বত প্রমাণ এক ঢেউ উঠিল, সেই ঢেউয়ে বাছুরটি ডুবিয়া গেল তখন আর আমরা কিছুই দেখিতে পাইলাম না, পরক্ষণেই কাছিতে টান পড়িল

তখন আমরা বুঝিলাম যে, নঙ্গরবিদ্ধ বাছুরকে কুমির গিলিয়াছে, বঁড়শির ন্যায় নঙ্গর কুমিরের মুখে বিঁধিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই পঞ্চাশ জন লোক আসিয়া দড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল। ভাগ্যে গাছে পাক দিয়া রাখিয়াছিলাম, তা না হইলে কুমিরের বলে এই পঞ্চাশ জন লোককে নদীতে গিয়া পড়িতে হইত। আমরা সেই রাক্ষস কুমিরকে বঁড়শিতে গাঁথিয়াছি, ঐ কথা শুনিয়া চারিদিকের আবাদ হইতে অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল। প্রায় পাঁচ শত লোক সেই রশি ধরিয়া টানিতে লাগিল। দারুণ আসুরিক বলে কুমির সেই পাঁচ শত লোকের সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিল। কখন আমাদের ভয় হইল যে তাহার বিপুল বলে নঙ্গর বা ভাঙ্গিয়া যায়, কখন ভয় হইল যে সে জাহাজের দড়া বা ছিঁড়িয়া যায়, কখন ভয় হইল গাছ উৎপাটিত হইয়া নদীতে গিয়া বা পড়ে। নিশ্চয় একটা না একটা বিভ্রাট ঘটিত যদি না সাঁওতালগণ কুমিরের মস্তকে ক্রমাগত তীর বর্ষণ করিত, যদি না নিকটস্থ দুইটি আবাদের লোক বন্দুক আনিয়া কুমিরের মাথায় গুলি মারিত। তীর গুলি খাইয়া কুমির মাঝে মাঝে জলমগ্ন হইতে লাগিল। কিন্তু নিঃশ্বাস লইবার জন্য পুনরায় তাহাকে ভাসিয়া উঠিতে হইল। সেই সময় লোকে তীর ও গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। কুমিরের রক্তে নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি কুমিরের সহিত আমার যুদ্ধ চলিল। প্রাতঃকালে কুম্ভীর হীনবল হইয়া পড়িল। বেলা নয়টার সময় তাহার মৃতদেহ জলে ডুবিয়া গেল। তখন অতি কষ্টে আমরা তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিলাম।

বড় বড় ছোরা বড় বড় কাস্তে আনিয়া তাহার পেট চিরিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে রাক্ষস কুমিরের পেট অতি কঠিন ছিল। আমাদের সমুদয় অস্ত্র ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে করাতী আনাইয়া করাতের দ্বারা তাহার উদর কাটাইলাম। কিন্তু পেট চিরিয়া তাহার পেটের ভিতর যাহা দেখিলাম, তাহা দেখিয়াই আমার চক্ষু স্থির।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দেখিলে?

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দেখিলে?

অন্যান্য শ্রোতৃগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি দেখিলে?

ডমরুধর বলিলেন, বলিব কি ভাই আর দুঃখের কথা, কুমিরের পেটের ভিতর দেখি না যে, সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমির যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্র মহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিয়াছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ভাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপরে বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে।

শঙ্কর ঘোর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমিরের পেটের ভিতর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল?

ডমরুধর বলিলেন,—হাঁ ভাই! কুমিরের পেটের ভিতর সেই ঝুড়ির উপর মাগী বসিয়া বেগুন বেচিতেছিল।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল? কুমিরের পেটের ভিতর সে খরিদদার পাইল কোথা?

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন, তোমার এক কথা! কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না। সমুদয় গহনাগুলি সে নিজের গায়ে পরিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই আমার হাড় জ্বলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—মাগী! ও গহনা আমার। অনেক টাকা খরচ করিয়া আমি কুমির ধরিয়াছি, ও গহনা খুলিয়া দে। কেঁউ মেউ করিয়া মাগী আমার সহিত ঝগড়া করিতে লাগিল। তাহার পর তাহার পুত্রগণ ও জ্ঞাতি-ভাইগণ কাঁড়বাঁশ ও লাঠি সোঁটা লইয়া আমাকে মারিতে দৌড়িল। আমার প্রজাগণ কেহই আমার পক্ষ হইল না। সুতরাং আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সাঁওতালগণ সে মাগীকে ঘরে লইয়া গেল। দিনকয়েক শূকর মারিয়া ও মদ খাইয়া তাহারা আমোদ-প্রমোদ করিল। পূর্বদেশীয় সে ভদ্র মহিলার একখানি গহনাও আমি পাইলাম না। মনে মনে ভাবিলাম যে, কপালে পুরুষের ভাগ্যও সকল সময় প্রসন্ন হয় না।

লম্বোদর বলিলেন,—এত আজগুবি গল্প তুমি কোথায় পাও বল দেখি?

ডমরুধর বলিলেন,—এতক্ষণ হাঁ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে গল্পটি শুনিতেছিলে। যেই হইয়া গেল, তাই এখন বলিতেছ যে, আজগুবি গল্প। কলির ধর্ম বটে!

শঙ্কর ঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কুমিরের গল্প যে সত্য, তাহার কোন প্রমাণ আছে?

ডমরুধর উত্তর করিলেন—প্রমাণ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথার জন্য এই দেখ সেই কুমিরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে কুমির যদি তাল গাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন? ঠিক অন্য কুমিরের দাঁতের মত কেন?

ডমরুধর উত্তর করিলেন,—অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমিরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল। [১]

উল্লিখিত গল্পটি শুধু হাস্যরসের দৃষ্টান্ত হিসাবেই উদ্ধৃত করি নাই, ত্রৈলোক্যনাথের গল্প বলিবার ক্ষমতা যে কিরূপ অসামান্য ইহা তাহারও একটি প্রমাণ। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পসাহিত্য পড়িবার সময় অদৃশ্য কথকের সান্নিধ্য অনুভব করি। তাঁহার গল্পগুলি যেন বলা কথার লিখিত রূপ। যদিচ সাধুভাষাই তাহার বাহন, তথাপি কথক এবং শ্রোতার মধ্যকার ফাঁকটা সে সম্পূর্ণরূপে ভরাট করিয়া তুলিতে পারে নাই। আজিকার দিন হইলে লেখক যে চলিত ভাষার আশ্রয় লইতেন তাহাতে সন্দেহ করি না। কিন্তু তিনি যখন বাঙ্গালায় সাহিত্য রচনা আরম্ভ করেন—সে আজ অর্ধ শতাব্দী আগেকার কথা—তখনও চলিত বাঙ্গালা সাহিত্যের বাহন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তবু হালকা বিষয়ের রচনায় সাধু ভাষাকেই যথাসম্ভব হালকা করিয়া লেখা হইত। বঙ্কিমের রসরচনাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সাধুভাষার প্রধান লক্ষণ—একমাত্র লক্ষণ নহে—ক্রিয়াপদ এবং সর্বনাম পদের পূর্ণতার রূপ, সে রূপও স্বাভাবিক ভাবেই সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করিয়াছে। বঙ্কিমের রচনায়, লঘুতর আলোচনার সময়, বাঙ্গালা ভাষার এই যে চলিত রূপের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করি তাহা পরবর্তী গল্পলেখকদের মধ্যেও ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইয়াছে।

১. "ডমরুচরিত", দ্বিতীয় গল্প, অষ্টম পরিচ্ছেদ

ত্রৈলোক্যনাথের রচনার মধ্যেও সেই চলিত ভাষার সূত্রপাতের লক্ষণ সুস্পষ্ট। কঙ্কাবতী গ্রন্থের মধ্যেই এই শব্দগুলি পাইয়াছি :

স র্ব না ম

তাকে (তাহাকে) তাঁকে (তাঁহাকে) তার (তাহার) তাঁর (তাঁহার) তাঁরা (তাঁহারা) এর (ইহার) এঁরা (ইহারা) কারা (কাহারা) তাও (তাহাও), ওর (উহার), পিপড়ে (পিপড়া), যারে (যাহারে, যাহাকে), তা (তাহা), তাঁদের (তাঁহাদের) ইত্যাদি।

ক্রি য়া প দ

হবে (হইবে) শুননি (শুন নাই), সামলাব (সামলাইব), উঠবে (উঠিবে), বিষিয়ে (বিষাইয়া), শুয়েছে (শুইয়াছে), যাবে (যাইবে), শুনলে (শুনিলে), নিয়ে (লইয়া) ইত্যাদি।

যে ভাষায় কথা বলি না, সে ভাষায় কখনও গল্প জমে না। চেষ্টা করিয়া কষ্ট করিয়া কতকদূর পর্যন্ত যাওয়া চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নয়। তাই কথকের মুখে কথ্যভাষা বাহির হইয়া পড়াই স্বাভাবিক। অশিষ্টতার অজুহাতে বঙ্গীয় পাণিনি-বোপদেব ক্রমদীশ্বরের দল লেখকগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত কথ্যভাষাভিমুখিতার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে আজ বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাষার চলিতরূপ একটি স্বতন্ত্র এবং স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে।

কথ্যভাষার গতিরোধ করার অর্থ কথকের কণ্ঠরোধ করা। ভাষার সমালোচনা করিতে গিয়া পাছে ত্রৈলোক্যনাথের প্রতি অবিচার করিয়া বসি, সেইজন্যই একথা বলিয়া রাখিতে হইল।

ত্রৈলোক্যনাথের অধিকাংশ গল্পেই ভূত-প্রেত দৈত্য-দানার সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু তাঁহার গল্প ভূতের গল্প নয়। আমরা ভূত বলিতে যে মৃত লোকের অশরীরী আত্মার কথা বুঝি, ত্রৈলোক্যনাথের ভূত ঠিক তাহা নয়। তাহারা দিব্য চলে ফিরে, ঘুরে বেড়ায়, ঘর-সংসার করে। তাহাদের ক্রোধ আছে, হিংসা আছে, আনন্দ-বিষাদ সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। তাহারা কোম্পানি খুলে, বক্তৃতা করে,

স্বকার্য সাধনের জন্য স্বজাতির মহিমাপ্রচারের জন্য টাকাকড়ি খরচ করে। তাহাদের জন্মের খবর জানি না, কিন্তু তাহাদের মৃত্যু হয় এবং "ভূত মরিয়া মার্বেল হয়।" আর তাহাদের বিবাহও হইয়া থাকে এবং সে বিবাহে পাড়ার লোক ভাংচিও দেয়। তাহাদের মৃত্যু যখন আছে তখন রোগও অবশ্য আছে। মনুষ্য জগতে সর্বাপেক্ষা বড় রোগ ক্ষয়কাস, ভূতেরও সে রোগ হয়। তবে মানুষের সঙ্গে তফাত এই যে মানুষের কাশিতে রক্ত বাহির হয়, ভূতের কাশিতে বাহির হয় আলকাতরা। মানুষে খবর-কাগজের সম্পাদক হয়। ত্রৈলোক্যনাথ বলেন সে কাজে মানুষ অপেক্ষা ভূতের যোগ্যতা অনেক বেশী। লুল্লু গল্পের আমীর তাহার আফিমের কৌটাটির ঢাকনা খুলিয়া গোঁগাঁ ভূতকে দেখাইলে গোঁগাঁ জিজ্ঞাসা করিল, উহার মধ্যে ভূত ধরিয়া রাখার উদ্দেশ্য কি?

> "আমীর বলিলেন, 'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি; সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদকের প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি সম্পাদক করিব।' গোঁগাঁ বলিল, 'আমি যে লেখা-পড়া জানি না।' আমীর বলিলেন, 'পাগল আর কি! লেখা-পড়া জানার আবশ্যক কি? গালি দিতে জানিস্ ত?' গোঁগাঁ বলিল 'ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' আমীর বলিলেন, 'তবে আর কি! আবার চাই কি? এত দিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত সব খরচ হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।"

বস্তুতঃ ভূতের ভয় দেখাইবার জন্য নয়, মানুষের অসংগতি দেখাইবার জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ ভূত ভূতিনীর অবতারণা করিয়াছেন। "সুইফ্‌ট্ গালিভারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ক্ষুদ্রকায় লিলিপুট ও অতিকায় ব্রবডিংনাগের অবতারণা করিয়াছেন। কি জন্য? মানবচরিত্রের অসংগতি প্রদর্শনই তাঁহার লক্ষ্য। এই অসংগতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া

তুলিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রকায়িক ও অতিকায়িক জীবের সৃষ্টি করিয়া তুলনায় মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা শক্তি সামর্থ্যের নিরর্থকতা দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠিক এই কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে ভূত প্রেতের আবির্ভাব।" ১

কঙ্কাবতী উপন্যাসটিকে দুইটি স্বতন্ত্র খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ডটি কঙ্কাবতীর রোগশয্যার স্বপ্নবিবরণ। শুধু কঙ্কাবতী নয়, অন্যান্য অনেক গল্পেই এইরূপ স্বপ্নাবস্থা সৃষ্টি করা হইয়াছে। সে স্বপ্ন কখনও নিদ্রায়, কখনও রোগে, কখনও মূর্ছায়, আবার কখনও বা ঔষধপ্রভাবে। বীরবালা গল্পে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট তন্দ্রাগত দেবী-সিংহের ক্ষণকালীন স্বপ্ন, ডমরুচরিতে সন্ন্যাসীর ঔষধপ্রভাবে ডমরুধরের শরীর হইতে "আমি"র পলায়ন প্রভৃতি গল্প বলার অতি পুরাতন টেকনিক মাত্র। আরব্য-পারস্য-উপন্যাসের গল্পে, ভারতীয় রূপকথায় ও পৌরাণিক উপাখ্যানে এই স্বপ্নের ব্যবহার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ত্রৈলোক্যনাথের বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহা রূপকথা বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বাহনমাত্র হইবার উপযোগী, সেই স্বপ্ন সেই মূর্ছা সেই অজ্ঞানতাকে—সুখ-দুঃখ-ভাবনা-চিন্তা-আশা-আকাঙ্ক্ষা-সমন্বিত আমাদের একান্ত পরিচিত—এই পৃথিবীবাসী মানুষের জীবনকথা বলিবার কাজে লাগাইয়াছেন। এটা তাঁহার একটা পরীক্ষা। কঙ্কাবতী গল্পে এই পরীক্ষার আরম্ভ। এ পরীক্ষায় তিনি কতটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন পাঠক নিজেই তাহার বিচার করুন। ত্রৈলোক্যনাথের অন্যান্য গল্পে 'স্বপ্ন' থাকিলেও বাস্তব জীবনের কথা এবং স্বপ্নাবস্থার কাহিনী উভয়কে একই মূল্য দেওয়া হয় নাই। কঙ্কাবতীতে উভয়কে সমান মূল্য দেওয়া হইয়াছে। গল্প হিসাবে উহার একখণ্ডের সহিত অন্য খণ্ডের যে যোগ তাহা অবিচ্ছেদ্য। অথচ সে যোগ হইল লৌকিকের সহিত অলৌকিকের, প্রাকৃতের সহিত

১. 'ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রসসাহিত্য', প্রমথনাথ বিশী, বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

অতিপ্রাকৃতের, বিচারশীল যুক্তিপ্রবণ মন ঐ দুটার যোগ খুব সহজে মানিয়া লইতে চায় না। সে যোগও মানিয়া লওয়া এত কঠিন হইত না, যদি না গল্পের প্রথমাংশ অর্থাৎ লৌকিক অংশ এতটা গুরুগম্ভীর হইত। বস্তুতঃ কঙ্কাবতীর মূল গল্পটির অন্তর্নিহিত রসটি গম্ভীর বলিয়াই স্বপ্নবিবরণের সহিত উহার মিলটা বাধা প্রাপ্ত হয়। ডমরুর গল্পেও তো লৌকিক অলৌকিক উভয়ই আছে। তবে সেখানে রস এমন নিবিড় হইল কি কারণে? কারণ এই যে, ডমরুচরিতের যে অংশ লৌকিক তাহাও লৌকিকতার উর্ধ্বে। সে গল্পে যদি কোথাও গাম্ভীর্য থাকে তো সে প্রকৃত গাম্ভীর্য নয়, গাম্ভীর্যের ছদ্ম-বেশধারী কৌতুক মাত্র।)

ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চায় হাত দেন প্রৌঢ়বয়সে। তাঁহার প্রথম রচনা কঙ্কাবতী প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালে (ইং ১৮৯৩) অর্থাৎ তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে। তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালে। এই ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর ধরিয়া তিনি সমানে গল্প উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ভূত ও মানুষ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৭ সালে, কঙ্কাবতী প্রকাশিত হইবার চারি বৎসর পরে। এ পুস্তকে 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'বীরবালা', 'লুল্লু', এবং 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'—এই চারিটি গল্প সংকলিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'বাঙ্গাল নিধিরাম' গল্পটি Hugoর Toilers of the Sea নামক বিখ্যাত উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে রচিত। গল্পগুলি ১২৯৮ হইতে ১৩০২ সালের মধ্যে 'জন্মভূমি' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।[১]

'ফোকলা দিগম্বর' একটি সামাজিক উপন্যাস। ইহা প্রকাশিত হয় ১৩০৭ (ইং ১৯০১) সালে। এই পুস্তক সম্বন্ধে বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে যে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন

'বিয়ে-পাগলা বুড়ো দিগম্বরের কার্যকলাপ-কাহিনী পড়িয়া হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া যাইবে। আবার তাঁহার পত্নী গলাভাঙ্গা দিগম্বরী আসিয়া যখন যোগ দিবেন তখন একেবারে সামাল সামাল।......"

এই দিগম্বরীর চিত্র অভিনব।

"তাঁহার লম্বা-চওড়া চেহারা দেখিয়া, প্রথম তাঁহাকে পুরুষ-মানুষ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া সে ভ্রম আমার দূর হইল। কস্তাপেড়ে শাড়ি তিনি পরিয়াছিলেন; মুখখানি তাঁহার বড় একটি হাঁড়ির মত ছিল। সেই হাঁড়ির মধ্যস্থল উচ্চ নাসিকা দ্বারা, দুই পার্শ্ব দুই চলের অস্থি দ্বারা, নিম্নদেশ মুখ-গহ্বর দ্বারা আর তাহার উপর কতকগুলি বড় বড় গোঁফের কেশ দ্বারা সুশোভিত ছিল। যদি কোন মানুষের ঠিক বাঁশির মত নাক থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ছিল। মাথার চুলগুলি অধিকাংশ পাকিয়া গিয়াছিল, তবে পাকার ভিতর কাঁচা চুলও অনেক ছিল। মাথার সম্মুখ-ভাগে টাক পড়িয়াছিল। কতক সেই টাকের উপর হইতে, কতক কাঁচা-পাকা চুলের ভিতর হইতে সিন্দূরের ছটা বাহির হইতেছিল। শীতলাদেবী কি সুভদ্রা ঠাকুরানীও ললাটদেশের এতখানি অংশ সিন্দূরে রঞ্জিত করেন কি না, তা সন্দেহ। সেই সিন্দূরের ছটা দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাঁহার সমস্ত শরীরটি পতিভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, শরীরে পতিভক্তি আর ধরে না, তাই তাহার কতকটা এখন মাথা ফুঁড়িয়া বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকটি শ্যামবর্ণা, তাঁহার দেহটি যেমনি দীর্ঘে, তেমনি প্রস্থে; পাঠানদিগের দেশেও তাঁহার প্রতি একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়। তাঁহার নাকে নথ ও হাতে শাঁখা ছিল। বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার দেহে যে অপরিমিত বল ছিল, তাহা তাঁহার আকৃতি ও ভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতেছিল। স্ত্রীলোকটি যে আমাদের দেশের লোক, বাঙ্গালী, পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া প্রথমেই তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আরও ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি ভদ্রকন্যা ও ভদ্ররমণী, আকৃতি-প্রকৃতি যেরূপ হউক না কেন। সিন্দুর

প্রসঙ্গে আমি তাঁহার পতিভক্তির উল্লেখ করিয়াছি। সেই সম্বন্ধে তাঁহার দম্ভপূর্ণ মুখখানি আরও পরিচয় প্রদান করিতেছিল। সেই মুখখানি যেন পৃথিবীর সমস্ত নারীকুলকে বলিতেছিল, "ওরে অভাগীরা! পতিপরায়ণা সতী কাহারে বলে, যদি তাদের দেখিতে সাধ থাকে, তবে আয়! এই আমাকে দেখিয়া যা; আমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত, সাক্ষাৎ পতিভক্তি মূর্তিমতী হইয়া আমি এই পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি।"

'মুক্তামালা' নামক গল্পগ্রন্থও ১৯০১ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১] মুক্তামালা একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসও নয় বড় গল্পও নয়, ইহা আরব্যোপন্যাস পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির মত পরস্পরসংযুক্ত বহু-গল্পের একটি শৃঙ্খল। পুস্তকের নামেও সে আভাস আছে। গ্রন্থের সূচনাতে গল্পের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের আরম্ভ হইল মহাদেব বাবুর মজলিসে বর্ষণমুখর মেঘাচ্ছন্ন এক সন্ধ্যায়। প্রমথ চৌধুরীর 'চার-ইয়ারী কথা'র জন্মও এইরূপ আড্ডায়; মহাদেব বাবুর গাঁজার আড্ডা তাহারই একটু অমার্জিত গ্রাম্যসংস্করণ।

"মহাদেব বাবু বলিলেন, এই দুর্যোগের সময় মজার দুই একটি গল্প না হইলে প্রাণ শিথিল হইয়া যায়। কাহারও তবিলে কি একটিও ভাল গল্প নাই?

"যাদব বলিলেন, কি গল্প শুনিতে ইচ্ছা করেন? একটা ভূতের গল্প করিব?

"মহাদেব বাবু উত্তর করিলেন, নূতন ধরনের ভূতের গল্প হয় তো বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।

"হলধর বলিলেন, ভূতের গল্প, সাপের গল্প, বাঘের গল্প, চোর ডাকাতের গল্প, রাজা-রানীর গল্প, যুদ্ধের গল্প, এ সব অনেক হইয়া গিয়াছে। নূতন আর কিছু নাই।

"মহাদেব বাবু বলিলেন, সেকালের মত একালে আশ্চর্য ঘটনাও ঘটে না। আরব্য উপন্যাসের লোকে কত জিন্ দেখিতে পাইত। পঞ্চাশের উপর আমার বয়স হইয়া গেল। এ পর্যন্ত একটাও জিন্ কি

১ "ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়", সাহিত্যসাধক চরিতমালা

একটাও পরী দেখি নাই। সে জন্ত আরব্য উপন্যাসের মত গল্পও আর একালে হয় না।

"রাঘব বলিলেন, একালে তেমন বাদশাও নাই, তেমন রাজাও নাই। বিক্রমাদিত্যের মত রাজা একালে থাকিলে, কত বত্রিশ সিংহাসন, কত বেতালপঞ্চবিংশতি হইত।

"ঘনশ্যাম বলিলেন, ভাল কথা বলিলে। একটি লোকের কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। কিছুদিন পূর্বে বাঁকুড়া হইতে আমাদের বাসায় একটি লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই গল্প তিনি আমাদের নিকট করিয়াছিলেন। তাহার অনেক কথা আমি একখানি খাতায় লিখিয়া লইয়াছিলাম। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাস কি বেতাল পঁচিশের গল্প। এ কলিকালে যে এরূপ ঘটনা হইতে পারে, তাহা বিশ্বাস হয় না।

"মহাদেব বাবু বলিলেন, গল্পটি যদি এত ভাল, তবে বলই না কেন, ছাই! কিন্তু সকলে যতই তোমায় অনুরোধ করিল, ততই যেন তোমার লেজ মোটা হইয়া উঠিল।

"ঘনশ্যাম বলিলেন, আপনার যখন শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে, তখন নিশ্চয় আমি বলিব। কিন্তু এ একটি গল্প নয়। আরব্য উপন্যাসের মত অনেকগুলি গল্প। দিনারজাদির মত আজ সূচনা করিয়া রাখি। তাহার পর আমার খাতাখানি আনিয়া প্রতিদিন কিস্তিবন্দি করিয়া কিছু কিছু বলিব।

"মহাদেব বাবু সে কথায় সম্মত হইলেন। ঘনশ্যাম বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

"ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন, যাঁহার নিকট আমি এ গল্প শুনিয়াছি, তাঁহার নাম সুবল গড়গড়ি। আমার নিজের কথায় আমি এ গল্প করিব না; গড়গড়ি মহাশয় যে ভাবে আমাদের বাসায় বলিয়াছিলেন, আমিও সেই ভাবে তাঁহার কথায় গল্পটি করিব।"

আরব্য উপন্যাসের ভঙ্গীতেই গল্পটি লেখা আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম প্রথম পরিচ্ছেদের স্থানে 'রজনী' শব্দের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সপ্তম রজনীর গল্প শেষ হইলে রজনী নামে পরিচ্ছেদ

বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সপ্তম রজনীর পাদটীকায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

মুক্তামালায় 'আতুরী ও আরশি', 'ভূতের বাড়ী' পুরাতন কূপ', 'শম্ভু ঘোষের কন্যা' 'ললিত ও লাবণ্য', 'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' 'বেতাল ষড়্‌বিংশতি' প্রভৃতি অনেকগুলি চমৎকার মজার গল্প আছে। মুক্তামালার পরিশিষ্টাংশটি উল্লেখযোগ্য।

"হলধর বাবু উত্তর করিলেন, গড়গড়ি মহাশয় যদি শ্বশুরালয়ে শয্যাশায়ী হইয়া রহিলেন, তাহা হইলে কি করিয়া তিনি কলিকাতা গমন করিলেন?

"দুই পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া অবশেষে মহাদেব বাবু ধীর-গম্ভীর স্বরে আপনার রায় প্রকাশ করিলেন।

"মহাদেব বাবু বলিলেন, গড়গড়ি মহাশয় যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাঁহার জড় দেহ শ্বশুরালয়ে পড়িয়াছিল। নাক্ষত্রিক দেহ অবলম্বন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন।

"হলধর বলিলেন, সে কথা সম্ভব। তা হইতে পারে। সেই যারে বলে তাড়িত-দেহ। সেই তাড়িত-দেহে গড়গড়ি মহাশয় এই সকল কাণ্ড করিয়াছিলেন।

"অদ্ভুত ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে আড্ডাধারী মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। তাহাতে সকলের মন হইতে সন্দেহ দূর হইল। প্রফুল্ল মনে সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।"

এ যেন গৌড়ানন্দ সাধু কর্তৃক 'হিং টিং ছট' এর ব্যাখ্যা শুনিয়া

"দুর্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্মল।"

'ময়না কোথায়' নামক উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩১১ সালে। ১৩১১ সালে আর একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়। উহার নাম 'মজার গল্প।' ইহাতে আটটি গল্প আছে। গল্পগুলির নাম,— 'সোনা-করা জাদুগরের গল্প', 'ভানুমতী ও রুস্তম', 'জাপানের উপকথা', 'পূজার ভূত', 'পিঠে পার্বণে চীনে ভূত', 'বিদ্যাধরীর

অরুচি', 'মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফকি' এবং 'একঠেঙো হুকু'। গল্পগুলির মধ্যে যে মজা আছে তাহা নিঃসন্দেহ। বইয়ের নাম 'মজার গল্প' সার্থক হইয়াছে।

'পাপের পরিণাম' একটি "শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস।...স্ত্রীর পরামর্শে ভাই ভাইকে বিষয়ে ফাঁকি দিয়া ভাইকে বিষয়ে বঞ্চিত করিয়া নিজে বিষয়ের মালিক হইয়া, শেষে অদৃষ্টের ফেরে কিভাবে যন্ত্রণাদায়ক পক্ষাঘাত রোগে পূর্বকৃত পাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইল; যিনি ভাইকে ফাঁকি দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন সেই পত্নীও কত কষ্টে ক্ষয়কাস রোগে মারা পড়িলেন, তাহার নিখুঁত চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে।" বইখানি উপদেশমূলক হইলেও আখ্যানবস্তু নীরস হয় নাই। এ বই প্রকাশিত হয় ১৩১৫ সালে।

বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত সাতটি ডমরুধরের গল্প একত্র করিয়া 'ডমরু চরিত' নামক এক গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালের ১৩ই আশ্বিন। ডমরুধরের চরিত্র চিত্রণে লেখক অদ্ভুত দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভট গল্প বলিবার অসামান্য শক্তি-বলে ডমরুধরের গল্পগুলি অপূর্ব রসে অভিষিক্ত হইয়া চিরন্তন সাহিত্যের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ডমরুচরিতের গল্প যে কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে মর্যাদা পাইবার অধিকারী। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণও এই গ্রন্থ এবং ইহার গ্রন্থকারকে সব সময়ে স্মরণ করিবার অবকাশ পান না। বঙ্গবাসী পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতেই তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকের বিজ্ঞাপনে যদিও বলা হইয়াছে "এভাবের সামাজিক চিত্র এত সুন্দর করিয়া বঙ্গসাহিত্যপটে আর কেহ কখনও ফুটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।"—(ফোকলা দিগম্বর)। "উপকথার আশ্চর্যত্ব এবং উপন্যাসের চমৎ-কারিত্বের সমাবেশে এই পুস্তকখানি বড়ই মধুর হইয়াছে।"

—(কঙ্কাবতী)। "অদ্ভুত অপূর্ব গ্রন্থ। ভূত ও মানুষের আশ্চর্য কাহিনী—সরল মধুর— কৌতূহলোদ্দীপক।··মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিপিচাতুর্যের পরিচয় এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে পরিস্ফুট।"—(ভূত ও মানুষ)।"······মজার গল্পচিত্র, গার্হস্থ্যচিত্র, দাম্পত্য প্রণয়চিত্র এমনই প্রস্ফুটভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, পুস্তক পড়িলেই মনে হইবে, যেন ইটালির প্রসিদ্ধ চিত্রকর গাইডো চক্ষের সম্মুখে একখানি করিয়া সুন্দর চিত্র আঁকিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন।"—(মজার গল্প), তথাপি বঙ্গবাসী হইতেও তিনি প্রাপ্য সম্মান পান নাই। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারে সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইল, বঙ্গবাসী হইতে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে তাহার শতাংশের একাংশও বলা হইল না কেন, জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়। ত্রৈলোক্যনাথের সুদীর্ঘ ২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনবৃত্তান্তে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যসাধনা সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর কর্তৃপক্ষ আড়াই ছত্রের অধিক বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই। সে আড়াই ছত্র এই:

" 'কঙ্কাবতী' 'ভূত ও মানুষ' 'ফোকলা দিগম্বর' 'মুক্তামালা' প্রভৃতি (প্রভৃতি! সব কয়টা নাম উল্লেখ করিতেও আলস্য!) ত্রৈলোক্য বাবুর কয়েকখানি নূতন ধরনের গ্রন্থ আছে। এই সকল গল্পগ্রন্থেও তাঁহার বহু গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে।"

এ মন্তব্যের তাৎপর্য কি এই নয় যে,—গল্পগ্রন্থ না লিখিলেও ক্ষতি ছিল না?—তিনি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এতই কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্যের চর্চা তাঁহার পক্ষে বাহুল্য। তাঁহার পক্ষে হয়তো তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহা সত্য নয়, 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের সম্পাদকের পক্ষে তো কোনোক্রমেই নয়।

কঙ্কাবতীর আলোচনা সম্পর্কে বহু পুস্তক পুস্তিকা এবং প্রবন্ধাদি হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। পাদটীকায় নামোল্লেখপূর্বক

সর্বত্রই তাহা স্বীকার করিয়াছি। কঙ্কাবতীর পাঠ মিলাইবার জন্য বসুমতী সংস্করণ ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থাবলীর সাহায্য লইয়াছি। সাধনার যে সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথকৃত কঙ্কাবতীর সমালোচনা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে তাহা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেনের এবং প্রথম সংস্করণ কঙ্কাবতী এক খণ্ড ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের নিকট হইতে পাইয়াছিলাম। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ত্রৈলোক্যনাথের পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত একাধিকবার আলোচনা করিবার সুযোগ হয়। সে আলোচনার ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি।

আশুতোষ কলেজ। কলিকাতা
ফাল্গুন। ১৩১৪

সম্পাদক

রবীন্দ্রনাথকৃত কঙ্কাবতীর সমালোচনা

সাধনা, দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম ভাগ (ফাল্গুন, ১২৯৯) হইতে পুনর্মুদ্রিত

কঙ্কাবতী, শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভাল লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ

বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়তঃ, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধ রাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমত করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে "অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" নামক একটি ইংরাজী গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই সমস্ত ত্রুটী মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার

লেখা আমাদের দেশের বালক বালিকাদের এবং তাহাদের পিতা-মাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালকবালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরল গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্পলোকই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলা ধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর লেখারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে। চার্লস্‌ ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাঙ্গালায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত—তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কি? ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কি, লক্ষ্য কি? তাহারা পাকা লোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ, সরস্বতীর সঙ্গেও

লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কি রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙে মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান্ খাঁ্যাঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটী সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানব-হৃদয়জলধি বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতি-ভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক, কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়্‌ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

৺

কঙ্কাবতী

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন কথা

কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলা কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

কঙ্কাবতীর ভাই একটি আঁব আনিয়াছিলেন। আঁবটি ঘরে রাখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন, "আমার আঁবটি যেন কেহ খায় না; যে খাইবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব।"

কঙ্কাবতী সে কথা জানিতেন না। ছেলে মানুষ! অত বুঝিতে পারেন নাই, আঁবটি তিনি খাইয়াছিলেন।

সেজন্য ভাই বলিলেন, "আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।"

মাতা পিতা সকলে বুঝাইলেন, "ভাই হইয়া কি ভগিনীকে বিবাহ করিতে আছে?"

কিন্তু কাহারও কথা তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন, "কঙ্কাবতী আমার আঁব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।"

কঙ্কাবতীর বড় লজ্জা হইল, মনে বড় ভয় হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকাখানিতে বসিয়া খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর গল্প এইরূপ। একথা কিন্তু বিশ্বাস হয় না। একটি আঁবের জন্য কেহ কি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চায়? কথা সম্ভব নয়। যাহা সম্ভব, তাহা আমি বলিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমঘাটী

শহর অঞ্চলে নয়, বন্য প্রদেশে, কুসুমঘাটী বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। গ্রামখানি বড়, অনেক লোকের বাস। গ্রামের নিকটে মাঠ। সেকালে এই মাঠ দিয়া অনেক লোক যাতায়াত করিত। সুবিধা পাইলে, নিকটস্থ গ্রামসমূহের দুষ্ট লোকেরা পথিকদিগকে মারিয়া ফেলিত ও তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু টাকা-কড়ি পাইত, তাহা লইত। মাঠের মাঝখানে যে সব পুষ্করিণী আছে, তাহার ভিতর হইতে আজ পর্যন্ত মড়ার মাথা বাহির হয়। মানুষ মারিয়া দুষ্ট লোকেরা এই পুকুরের ভিতর লুকাইয়া রাখিত।

মৃতদেহ গোপন করিবার আর একটি উপায় ছিল। পথিককে মারিয়া মড়াটি লইয়া, দুষ্ট লোকেরা এ গ্রাম হইতে সে গ্রামে ফেলিয়া আসিত। অপর গ্রামে মড়াটি রাখিয়া, একপ্রকার "কুঃ" শব্দ করিয়া তাহারা চলিয়া যাইত। সে গ্রামের চৌকিদার সেই "কুঃ" শব্দটি শুনিয়া বুঝিতে পারিত যে, তাহার সীমানায় মড়া পড়িয়াছে। চৌকিদার ভাবিত যদি আমার সীমানায় মড়া পড়িয়া থাকে তাহা হইলে কাল প্রাতঃকালে আমাকে লইয়া টানাটানি হইবে। এই কথা ভাবিয়া সেও আপনার বন্ধুবর্গের সহায়তায়, মৃতদেহটি অপর গ্রামে রাখিয়া সেইরূপ "কুঃ" শব্দ করিয়া আসিত। এইরূপে রাতা-রাতি মড়াটি দশ বার ক্রোশ দূরে গিয়া পড়িত। কোথা হইতে লোকটি আসিতেছিল, কে তাহাকে মারিল, অতদূরে আর তাহার কোনো সন্ধান হইত না।

একে বন্য দেশ, তাহাতে আবার এইরূপে শতশত অপঘাত মৃত্যু! সে স্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানাপ্রকার ভূত আছে,—সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সন্ধ্যা হইলে, ঘরে বসিয়া, লোকে নানারূপ ভূতের গল্প করে, সেই গল্প শুনিয়া বালক-বালিকার শরীর শিহরিয়া উঠে।

গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকা-

দিগকে সাবধান করিয়া দেন, "ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।"

স্থলে, সেখানকার লোকের এইরূপ পদে পদে বিপদের ভয়। জলেও কম নয়। গ্রামের একপার্শ্বে একটি নদী আছে। পাহাড় হইতে নামিয়া, "কুলকুল" করিয়া নদীটি সাগরের দিকে বাহিয়া যাইতেছে। হাঙ্গর কুম্ভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে "জ'টে-বুড়ী" তো আছে-ই, তা ছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।

কুসুমঘাটীর অনতিদূরে পর্বতশ্রেণী। পাহাড় বনে আবৃত। বনে বাঘ-ভালুক আছে। বাঘে সর্বদাই লোকের গরু-বাছুর খাইয়া যায়। মাঝে মাঝে এক-একটি বাঘ মনুষ্য খাইতে শিক্ষা করে। তখন সে বাঘ মানুষ ভিন্ন আর কিছুই খায় না। লোকে উৎপীড়িত হইয়া নানা কৌশলে ব্যাঘ্রটিকে বধ করে।

এক-একটি বাঘ কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়—সে মনুষ্য। বনে একপ্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শত্রুকে বিনাশ করে। তাহার পর আবার মাথার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না। সে চিরকালই বাঘ থাকিয়া যায়। এই বাঘে লোকের প্রতি ভয়ানক উপদ্রব করে।

কুসুমঘাটীর লোকের মনে এইরূপ নানাপ্রকার বিশ্বাস। কিন্তু আজ-কাল সকলের মন হইতে এই সব ভয় ক্রমে দূর হইতেছে। এখানকার অনেকে এখন তসরের গুটি ও গালা লইয়া কলিকাতায় আসিত। কেহ কেহ কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ অংরজিও পড়িয়াছেন। ভূত ডাইনীর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। ভূতের কথা পড়িলে, তাঁহারা উপহাস করেন, "পৃথিবীতে ভূত নাই। আর যদিও থাকে তো আমাদের তাহারা কি করিতে পারে?" তাঁহাদের দেখা-দেখি আজ-কালের ছেলে-মেয়েদের প্রাণেও কিছু কিছু সাহসের সঞ্চার হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তনু রায়

শ্রীযুক্ত রামতনু রায় মহাশয়ের বাস কুসুমঘাটী। রামতনু রায় বলিয়া কেহ তাঁহাকে ডাকে না, সকলে তাঁহাকে "তনু রায়" বলে। ইনি ব্রাহ্মণ, বয়স হইয়াছে; ব্রাহ্মণের যাহা কিছু কর্তব্য, তাহা ইনি যথাবিধি করিয়া থাকেন। ত্রিসন্ধ্যা করেন, পিতা-পিতামহ-আদির শ্রাদ্ধতর্পণাদি করেন, দেবগুরুকে ভক্তি করেন, দলাদলি লইয়া আন্দোলন করেন। এখনকার লোকে ভাল করিয়া ধর্ম-কর্ম করে না বলিয়া রায় মহাশয়ের মনে বড় রাগ।

তিনি বলেন, "আজ-কালের ছেলেরা সব নাস্তিক, ইহাদের হাতে জল খাইতে নাই।" তিনি নিজে সব মানেন, সব করেন। বিশেষতঃ কুলীন ও বংশজের যে রীতিগুলি, সেইগুলির প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি।

তিনি নিজে বংশজ ব্রাহ্মণ। তাই তিনি বলেন, "বিধাতা যখন আমাকে বংশজ করিয়াছেন, তখন বংশজের ধর্মটি আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। যদি না করি, তাহা হইলে বিধাতার অপমান করা হইবে, আমার পাপ হইবে, আমাকে নরকে যাইতে হইবে। যদি বল বংশজের ধর্মটি কি? বংশজের ধর্ম এই যে, কন্যাদান করিয়া পাত্রের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ ধন গ্রহণ করিবে। বংশজ হইয়া যিনি এ কার্য না করেন, তাঁহার ধর্ম লোপ হয়, তিনি একেবারেই পতিত হন। শাস্ত্রে এইরূপ লেখা আছে।"

শাস্ত্র-অনুসারে সকল কাজ করেন দেখিয়া তনু রায়ের প্রতি লোকের বড় ভক্তি। স্ত্রীলোকেরা ব্রত-উপলক্ষে ইঁহাকেই প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। সকলে বলেন যে, "রায় মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে অতি বিরল।" বিশেষতঃ শূদ্রমহলে ইঁহার খুব প্রতিপত্তি।

তনু রায় অতি উচ্চদরের বংশজ। কেহ কেহ পরিহাস করিয়া বলেন যে, "ইঁহাদের কোনো পুরুষে বিবাহ হয় না। পিতা পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল কি না, তাও সন্দেহ।"

ফল কথা, ইঁহার নিজের বিবাহের সময় কিছু গোলযোগ হইয়াছিল। "পাঁচশত টাকা পণ দিব" বলিয়া একটি কন্যা স্থির করিলেন। পৈতৃক ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহের দিন উপস্থিত হইলে সেই টাকাগুলি লইয়া বিবাহ করিতে যাইলেন। কন্যার পিতা টাকাগুলি গণিয়া ও বাজাইয়া লইলেন। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তবুও তিনি কন্যা-সম্প্রদান করিতে তৎপর হইলেন না। কেন বিলম্ব করিতেছেন, কেহ বুঝিতে পারে না।

অবশেষে তিনি নিজেই খুলিয়া বলিলেন, "পাত্রের এত অধিক বয়স হইয়াছে, তাহা আমি বিবেচনা করিতে পারি নাই। এক্ষণে আর এক শত টাকা না পাইলে কন্যাদান করিতে পারি না।"

কন্যাকর্তার এই কথায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। সেই গোলযোগে লগ্ন অতীত হইয়া গেল, রাত্রি প্রায় অবসান হইল। যখন প্রভাত হয় হয়, তখন পাঁচজনে মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, রায় মহাশয়কে আর পঞ্চাশটি টাকা দিতে হইবে। খত লিখিয়া তনু রায় আর পঞ্চাশ টাকা ধার করিলেন ও কন্যার পিতাকে তাহা দিয়া বিবাহকার্য সমাধা করিলেন।

বাসর-ঘরে গাহিবেন বলিয়া তনু রায় অনেকগুলি গান শিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সব বৃথা হইল। কারণ, বাসর হয় নাই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছিল। এ দুঃখ তনু রায়ের মনে চিরকাল ছিল।

এক্ষণে তনু রায়ের তিনটি কন্যা ও একটি পুত্রসন্তান। কুলধর্ম রক্ষা করিয়া দুইটি কন্যাকে তিনি সুপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতারা তনু রায়ের সম্মান রাখিয়াছিলেন। কেহ পাঁচশত, কেহ হাজার গণিয়া দিয়াছিলেন। কাজেই সুপাত্র বলিতে হইবে।

সম্মান কিছু অধিক পাইবেন বলিয়া, রায় মহাশয় কন্যা দুইটিকে বড় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "অল্প বয়সে বিবাহ দিলে, কন্যা যদি বিধবা হয়, তাহা হইলে সে পাপের দায়ী কে হইবে? কন্যা বড় করিয়া বিবাহ দিবে। কুলীন ও বংশজের তাহাতে কোন দোষ নাই। ইহা শাস্ত্রে লেখা আছে।"

তাই, যখন ফুলশয্যার আইন পাস হয়, তখন তনু রায় বলিলেন, "পূর্ব হইতেই আমি আইন মানিয়া আসিতেছি। তবে আবার নূতন

আইন কেন? আইনের তিনি ঘোরতর বিরোধী হইলেন; সভা করিলেন, চাঁদা তুলিলেন, চাঁদার টাকাগুলি সব আপনি লইলেন।

তনু রায়ের জামাতা দুইটির বয়স নিতান্ত কচি ছিল না। ছেলে মানুষ বরকে তিনি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারেন না। তাহারা একশত কি দুইশত টাকায় কাজ সারিতে চায়। তাই একটু বয়স্ক পাত্র দেখিয়া কন্যা দুইটির বিবাহ দিয়াছিলেন। একজনের বয়স হইয়াছিল সত্তর, আর এক জনের পঁচাত্তর।

জামাতাদিগের বয়সের কথায় পাড়ার মেয়েরা কিছু বলিলে, তনু রায় সকলকে বুঝাইতেন, "ওগো! তোমরা জান না, জামাইয়ের বয়স একটু পাকা হইলে, মেয়ের আদর হয়।"

জামাতাদিগের বয়স কিছু অধিক পাকিয়াছিল। কারণ, বিবাহের পর বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে দুইটি কন্যাই বিধবা হয়।

তনু রায় জ্ঞানবান লোক। জামাতাদগের শোকে একেবারে অধীর হন নাই। মনকে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিয়া থাকেন, বিধাতার ভবিতব্য! কে খণ্ডাতে পারে? কত লোক যে বার বৎসরের বালকের সহিত পাঁচ বৎসরের বালিকার বিবাহ দেয়, তবে তাহাদের কন্যা বিধবা হয় কেন? যাহা কপালে থাকে, তাহাই ঘটে। বিধাতার লেখা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না।

তনু রায়ের পুত্রটি ঠিক বাপের মত। এখন তিনি আর নিতান্ত শিশু নন, পঁচিশ পার হইয়াছেন। লেখাপড়া হয় নাই তবে পিতার মত শাস্ত্রজ্ঞান আছে। পিতা কন্যাদান করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেছেন, সেজন্য তিনি আনন্দিত, নিরানন্দ নন। কারণ পিতার তিনিই একমাত্র বংশধর। বিধবা কয়টা আর কে বল? তবে বিধবাদিগের গুণ-কীর্তন তিনি সর্বদাই করিয়া থাকেন।

তিনি বলেন "আমাদের বিধবারা সাক্ষাৎ সরস্বতী। সদা ধর্মে রত, পরোপকার ইহাদের চিরব্রত। কিসে আমি ভাল খাইব, কিসে বাবা ভাল খাইবেন, ভগিনী দুইটির সর্বদাই এই চিন্তা। তিনদিন উপবাস করিয়াও আমাদের জন্য পাঁচ ব্যঞ্জন রন্ধন করেন। ভগিনী দুইটি আমার অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীস্তথা। প্রাতঃস্মরণীয়া।"

আজ-কাল আর সহমরণ প্রথা নাই বলিয়া, ইনি মাঝে মাঝে খেদ

করেন। কারণ, তাহা থাকিলে ভগিনী দুইটি নিমিষের মধ্যে স্বর্গে যাইতে পারিতেন। বসিয়া বসিয়া মিছামিছি বাবার অন্নধ্বংস করিতেন না। সাহেবেরা স্বর্গের দ্বারে এরূপ আগড় দিয়া দেন কেন?

তনু রায়ের স্ত্রী কিন্তু অন্য প্রকৃতির লোক। এক-একটি কন্যার বিবাহ হয়, আর পাত্রের রূপ দেখিয়া তিনি কান্নাকাটি করেন। তনু রায় তখন তাঁহাকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আর বলেন, "মনে করিয়া দেখ দেখি, তোমার বাপ কি করিয়াছিলেন?" এইরূপ নানাপ্রকার খোঁট দিয়া তবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। কন্যাদিগের বিবাহ লইয়া স্ত্রীপুরুষের চির বিবাদ। বিধবা কন্যা দুইটির মুখপানে চাহিয়া সদাই চক্ষের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যায়। মেয়েদের সঙ্গে মাও একপ্রকার একাদশী করেন। একাদশীর দিন কিছুই খান না, তবে স্বামীর অকল্যাণ হইবার ভয়ে, কেবল একটু একটু জল পান করেন।

প্রতিদিন পূজা করিয়া একে একে সকল দেবতাদিগের পায়ে তিনি মাথা খুঁড়েন, আর তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করেন যে, হে মা কালী! হে মা দুর্গা! হে ঠাকুর! যেন আমার কঙ্কাবতীর বরটি মনের মত হয়।

কঙ্কাবতী তনু রায়েব ছোট কন্যা। এখনও ।নতান্ত শিশু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খেতু

তনু রায়ের পাড়ায় একটি দুঃখিনী ব্রাহ্মণী বাস করেন। লোকে তাঁহাকে "খেতুর মা, খেতুর মা" বলিয়া ডাকে। খেতুর মা আজ দুঃখিনী বটে, কিন্তু এক সময়ে তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার স্বামী শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখাপড়া জানিতেন, কলিকাতায় কর্ম করিতেন, দু'পয়সা উপার্জন করিতেন।

কিন্তু তিনি অর্থ রাখিতে জানিতেন না। পরদুঃখে তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন ও যথাসাধ্য পরের দুঃখ মোচন করিতেন। অনেক লোককে অন্ন দিতেন ও অনেকগুলি ছেলের তিনি লেখাপড়ার খরচ দিতেন। এরূপ লোকের হাতে পয়সা থাকে না।

অধিক বয়সে তাঁহার স্ত্রীর একটি পুত্রসন্তান হয়। ছেলেটির নাম "ক্ষেত্র" রাখেন, সেইজন্য তাঁহার স্ত্রীকে সকলেই "খেতুর মা" বলে।

যখন পুত্র হইল, তখন শিবচন্দ্র মনে করিলেন এইবার আমাকে বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। আমার অবর্তমানে স্ত্রী-পুত্র যাহাতে অন্নের জন্য লালায়িত না হয়, আমাকে সে বিলি করিতে হইবে।

মানস হইল বটে, কিন্তু কার্যে পরিণত হইল না। পৃথিবী অতি দুঃখময়। এ দুঃখ যিনি নিজ দুঃখ বলিয়া ভাবেন, চিরকাল তাঁহাকে দরিদ্র থাকিতে হয়।

খেতুর যখন চারি বৎসর বয়স, তখন হঠাৎ তাহার পিতার মৃত্যু হইল। স্ত্রী ও শিশু সন্তানটিকে একেবারে পথে দাঁড় করাইয়া গেলেন। খেতুর বাপ অনেকের উপকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বড়লোক হইয়াছেন। কিন্তু এই বিপদের সময় কেহই একবার উঁকি মারিলেন না। কেহই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, খেতুর মা! তোমার হবিষ্যের সংস্থান আছে কি না? এই দুঃখের সময় কেবল রামহরি মুখোপাধ্যায় ইঁহাদের সহায় হইলেন।

রামহরি ইহাদের জ্ঞাতি, কিন্তু দূর-সম্পর্ক। খেতুর বাপ তাঁহার একটি সামান্য চাকরি করিয়া দিয়াছিলেন। দেশে অভিভাবক নাই, সে জন্য কলিকাতায় তাঁহাকে পরিবার লইয়া থাকিতে হইয়াছে। যে কয়টি টাকা পান, তাহাতেই কষ্টে-স্থষ্টে দিনপাত করেন।

তিনি কোথায় পাইবেন? তবুও যাহা কিছু পারিলেন, বিধবাকে দিলেন ও চাঁদার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন। খেতুর বাপের খাইয়া যাহারা মানুষ, আজ তাহারা রামহরিকে কতই না ওজর আপত্তি অপমানের কথা বলিয়া দুই এক টাকা চাঁদা দিল। তাহাতেই খেতুর বাপের তিল-কাঞ্চন করিয়া শ্রাদ্ধ হইল। চাঁদার টাকা হইতে যাহা কিছু বাঁচিল, রামহরি তাহা দিয়া খেতুর মা ও খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

দেশে পাঠাইয়া দুঃখিনী বিধবাকে তিনি চাউলের দামটি দিতেন; অধিক আর কিছু দিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণী পইতা কাটিয়া কোনো মতে অকুলান কুলান করিতেন। দেশে বান্ধব কেহই ছিল না। নিরঞ্জন কবিরত্ন কেবল মাত্র ইঁহাদের দেখিতেন শুনিতেন; বিপদে আপদে তিনিই বুক দিয়া পড়িতেন।

খেতুর মায় এইরূপ কষ্টে দিন কাটিতে লাগিল। ছেলেটি শান্ত সুবোধ, অথচ সাহসী ও বিক্রমশীল হইতে লাগিল। তাহার রূপ-গুণে, স্নেহ-মমতায়, মা সকল দুঃখ ভুলিলেন। ছেলেটি যখন সাত বৎসরের হইল, তখন রামহরি দেশে আসিলেন।

খেতুর মাকে তিনি বলিলেন, "খেতুর এখন লেখাপড়া শিখবার বয়স হইল, আর ইহাকে এখানে রাখা হইবে না। আমি ইহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। আপনার কি মত?"

খেতুর মা বলিলেন, "বাপরে! তা কি কখনও হয়? খেতুকে ছাড়িয়া আমি কি করিয়া থাকিব? নিমিষের নিমিত্তও খেতুকে চক্ষুর আড় করিয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না। না বাছা! এ প্রাণ থাকিতে আমি খেতুকে কোথাও পাঠাইতে পারিব না।"

রামহরি বলিলেন, "দেখুন এখানে থাকিলে খেতুর লেখাপড়া হইবে না। মথুর চক্রবর্তীর অবস্থা কি ছিল জানেন তো? গাজনের শিবপূজা করিয়া অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালন করিত। 'গাজুনে বামুন' বলিয়া

সকলে তাহাকে ঘৃণা করিত। তাহার ছেলে ষাঁড়েশ্বর আপনার বাসায় দিন কতক রাঁধুনী বামুন থাকে। অল্পবয়স্ক বালক দেখিয়া শিব কাকার দয়া হয়, তিনি তাহাকে স্কুলে দেন। এখন সে উকিল হইয়াছে। এখন সে একজন বড়লোক।”

খেতুর মা উত্তর করিলেন, “চুপ কর! কলিকাতায় লেখা-পড়া শিখিয়া যদি ষাঁড়েশ্বরের মত হয়, তাহা হইলে আমার খেতুর লেখা-পড়া শিখায় কাজ নাই।”

রামহরি বলিলেন, “সত্য বটে, ষাঁড়েশ্বর মদ খায়, আর মুসলমান সহিসের হাতে নানারূপ অখাদ্য মাংসও খায়, আবার এদিকে প্রতিদিন হরি-সংকীর্তন করে। কিন্তু তা বলিয়া কি সকলেই সেইরূপ হয়? পুরুষ মানুষে লেখা-পড়া না শিখিলে কি চলে? পুরুষ মানুষের যেরূপ বাঁচিয়া থাকার প্রার্থনা, বিদ্যাশিক্ষারও সেইরূপ প্রার্থনা।”

খেতুর মা বলিলেন, “হাঁ সত্য কথা। পুত্রের যেরূপ বাঁচিবার প্রার্থনা বিদ্যার প্রার্থনাও তাহার চেয়ে অধিক। যে মাতা-পিতা ছেলেকে বিদ্যা-শিক্ষা না দেন, সে মাতা-পিতা ছেলের পরম শত্রু। তবে বুঝিয়া দেখ, আমার মার প্রাণ, আমি অনাথিনী সহায়হীনা বিধবা। পৃথিবীতে আমার কেহ নাই, এই এক রতি ছেলেটিকে লইয়া সংসারে আছি। খেতুকে আমি নিমেষে হারাই! খেলা করিয়া ঘরে আসিতে খেতুর একটু বিলম্ব হইলে, আমি যে কত কি কু ভাবি, তাহা আর কি বলিব? ভাবি, খেতু বুঝি জলে ডুবিল, খেতু বুঝি আগুনে পুড়িল, খেতু বুঝি গাছ হইতে পড়িয়া গেল, খেতুকে বুঝি পাড়ার ছেলেরা মারিল! খেতু যখন ঘুমায়, রাত্রিতে উঠিয়া উঠিয়া আমি খেতুর নাকে হাত দিয়ে দেখি, খেতুর নিশ্বাস পড়িতেছে কি না। ভাবিয়া দেখ দেখি, এ দুধের বাছাকে দূরে পাঠাইতে মার মহাপ্রাণী কি করে। তাই কাঁদি, তাই বলি ‘না’।”

পুনরায় খেতুর মা বলিলেন, “রামহরি! খেতু আমার বড় গুণের ছেলে। কেবল দুই বৎসর পাঠশালায় যাইতেছে, ইহার মধ্যেই তালপাতা শেষ করিয়াছে, কলাপাতা ধরিয়াছে। গুরুমহাশয় বলেন, খেতু সকলের চেয়ে ভাল ছেলে।

“আর দেখ রামহরি! খেতু আমার অতি সুবোধ ছেলে। খেতুকে আমি যা করিতে বলি, খেতু তাই করে। যেটি মানা করি সেটি আর

খেতু করে না। একদিন দাসেদের মেয়ে আসিয়া বলিল, ওগো! তোমার খেতুকে পাড়ার ছেলেরা বড় মারিতেছে। আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। দেখিলাম, ছয় জন ছেলে একা খেতুর উপর পড়িয়াছে। খেতুর মনে ভয় নাই, মুখে কান্না নাই। আমি দৌড়িয়া গিয়া খেতুকে কোলে লইলাম। খেতু তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল, মা! আমি উহাদের সাক্ষাতে কাঁদি নাই, পাছে উহারা মনে করে যে, আমি ভয় পাইয়াছি। একা একা আমার সঙ্গে কেহই পারে না। উহারা ছয় জন, আমি একা, তা আমিও মারিয়াছি। আবার যখন একা একা পাইব, তখন আমিও ছয় জনকে খুব মারিব। আমি বলিলাল, না বাছা! তা করিতে নাই। প্রতিদিন যদি সকলের সঙ্গে মারামারি করিবে, তবে খেলা করিবে কার সঙ্গে? খেতু আমার কথা শুনিল। কতদিন সে ছেলেদের খেতু একলা পাইয়াছিল, মনে করিলে খুব মারিতে পারিত; কিন্তু আমি মানা করিয়াছিলাম বলিয়া কাহাকেও সে আর মারে নাই।

"আর একদিন আমি খেতুকে বলিলাম, খেতু! তনু রায়ের আঁব গাছে ঢিল মারিও না। তনু রায় খিট্‌খিটে লোক, সে গালি দিবে। খেতু বলিল, মা! ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট গো! একটি আঁব পাকিয়া টুক্‌টুক্ করিতেছিল। আমার হাতে একটি ঢিল ছিল। তাই মনে করিলাম, দেখি, পড়ে কি না? আমি বলিলাম, বাছা! ও গাছের আঁব বড় মিষ্ট হইলে কি হইবে, ও গাছটি তো আর আমাদের নয়! পরের গাছে ঢিল মারিলে, যাদের গাছ, তাহারা রাগ করে; যখন আপনা-আপনি তলায় পড়িবে, তখন কুড়াইয়া খাইও, তাহাতে কেহ কিছু বলিবে না।

"তাহার পর, আর একদিন খেতু আমাকে আসিয়া বলিল, মা! জেলেদের গাবগাছে খুব গাব পাকিয়াছে। পাড়ার ছেলেরা সকলে গাছে উঠিয়া গাব খাইতেছিল। আমাকে তাহারা বলিল, খেতু! আয় না ভাই! দূরের গাব যে আমরা পাড়িতে পারি না! তা মা আমি গাছে উঠি নাই। গাব গাছটি তো, মা! আর আমাদের নয়, যে উঠিব? আমি তলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। ছেলেরা ছুটি একটি গাব আমাকে ফেলিয়া দিল। মা! সে গাব কত যে গো মিষ্টি, তাহা আর তোমাকে কি বলিব! তোমাব জন্ত একটি গাব আনিয়াছি, তুমি বরং, মা! খাইয়া দেখ! মা! আমাদের

যদি একটি গাব গাছ থাকিত, তাহা হইলে বেশ হইত। আমি বলিলাম, খেতু! বুড়ো মানুষে গাব খায় না, ও গাবটি তুমি খাও। আর পরের গাছে পাকা গাব পাড়িতে কোনও দোষ নাই, তার জন্য জেলেরা তোমাকে বকিবে না। কিন্তু গাছের ডগায় গিয়া উঠিও না, সরু ডালে পা দিও না, ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া যাইবে। গাবের আঁটি চুষিয়া চুষিয়া ফেলিয়া দিও, আঁটি গিলিও না, গলায় বাধিয়া যাইবে। গাব খাইতে অনুমতি পাইয়া বাছার যে কত আনন্দ হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?

"দেখ, এ গ্রামে একবার একজন কোথা হইতে সন্দেশ বেচিতে আসিয়াছিল। পাড়ার ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাদের বাপ মা, যার যেরূপ ক্ষমতা, সন্দেশ কিনিয়া আপনার আপনার ছেলের হাতে দিল। মুখ চুনপানা করিয়া আমার খেতু সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। তাড়াতাড়ি গিয়া আমি খেতুকে কোলে লইলাম, আমার বুক ফাটিয়া যাইল, চক্ষুর জল রাখিতে পারিলাম না। আঁচলে চক্ষু পুছিতে পুছিতে ছেলে নিয়ে বাটী আসিলাম। খেতু নীরব, খেতুর মুখে কথা নাই। তার শিশুমনে সে যে কি ভাবিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে আমার মুখে হাত দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, মা! তুমি কাঁদ কেন? আমি বলিলাম, বাছা আমার ঘরে একদিন সন্দেশ ছড়াছড়ি যাইত, চাকর বাকরে পর্যন্ত খাইয়া আলিয়া যাইত। আজ যে তোমার হাতে এক পয়সার সন্দেশ কিনিয়া দিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কি আর রাখিতে স্থান আছে? এমন অভাগিনী মার পেটেও বাছা তুই জন্মেছিলি। সাত বৎসরের শিশুর একবার কথা শুন! খেতু বলিল, মা! ও সন্দেশ ভাল নয়। দেখিতে পাও নাই, সব পচা? আর মা তুমি তো জান! সন্দেশ খাইলে আমার অসুখ করে। সেই যে মা, চৌধুরীদের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, সেখানে সন্দেশ খাইয়াছিলাম, তার পরদিন আমার কত অসুখ করিয়াছিল! সন্দেশ খাইতে নাই, মুড়ি খাইতে আছে। ঘরে যাদ মা, মুড়ি থাকে তো দাও আমি খাই।"

খেতুর মার মুখে খেতুর কথা আর ফুরায় না। রামহরির নিকট কত যে কি পরিচয় দিলেন, তাহা কি আর বলিব?

অবশেষে রামহরি বলিলেন, "খুড়ী-মা! ভয় করিও না। আমার নিজেও ছেলের চেয়েও আমি খেতুর যত্ন করিব। শিব কাকার আমি

অনেক খাইয়াছি। তাঁহার অনুগ্রহে আজ পরিবারবর্গকে একমুঠা অন্ন দিতেছি। আজ তাঁহার ছেলে যে মূর্খ হইয়া থাকিবে, তাহা প্রাণে সহ্য হবে না। খেতু কেমন আছে, কেমন লেখাপড়া করিতেছে, সে বিষয় আমি সর্বদা আপনাকে পত্র লিখিব। আবার, খেতু যখন চিঠি লিখিতে শিখিবে, তখন সে নিজে আপনাকে চিঠি লিখিবে। পূজার সময় ও গ্রীষ্মের ছুটির সময় খেতুকে দেশে পাঠাইয়া দিব। বৎসরের মধ্যে দুই তিনমাস সে আপনার নিকট থাকিবে। আজ আমি এখন যাই। আজ শুক্রবার। বুধবার ভাল দিন। সেইদিন খেতুকে লইয়া কলিকাতায় যাইব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিরঞ্জন

তনু রায়ের সহিত নিরঞ্জন কবিরত্নের ভাব নাই। নিরঞ্জন তনু রায়ের প্রতিবেশী।

নিরঞ্জন বলেন, "রায় মহাশয়! কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা লইবেন না, টাকা লইলে ঘোর পাপ হয়।"

তনু রায় তাই নিরঞ্জনকে দেখিতে পারেন না, নিরঞ্জনকে তিনি ঘৃণা করেন। যেদিন তনু রায়ের কন্যার বিবাহ হয়, নিরঞ্জন সেইদিন গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অপর গ্রামে গমন করেন। তিনি বলেন, "কন্যাবিক্রয় চক্ষে দেখিলে, কি সে কথা কর্ণে শুনিলেও পাপ হয়।"

নিরঞ্জন অতি পণ্ডিত লোক! নানাশাস্ত্র তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন। বিদ্যা-শিক্ষার শেষ নাই, তাই রাত্রিদিন তিনি পুথি-পুস্তক লইয়া থাকেন। লোকের কাছে আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতে ইনি ভালবাসেন না। তাই জগৎ জুড়িয়া ইঁহার নাম হয় নাই। পূর্বে অনেকগুলি ছাত্র ইঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিত। দিবারাত্রি তাহাদিগকে বিদ্যা-শিক্ষা দিয়া, ইনি পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। আহার পরিচ্ছদ দিয়া ছাত্রগুলিকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিতেন। লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ গিয়া বিদায়ের জন্য ইনি মারামারি করিতেন না। কারণ, ইঁহার অবস্থা ভাল ছিল। পৈতৃক অনেক ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল।

গ্রামের জমিদার জনার্দন চৌধুরীর সহিত এই ভূমি লইয়া কিছু গোলমাল হয়। একদিন দুই প্রহরের সময় জমিদার একজন পেয়াদা পাঠাইয়া দেন।

পেয়াদা আসিয়া নিরঞ্জনকে বলে, "ঠাকুর! চৌধুরী মহাশয় তোমাকে ডাকিতেছেন, চল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আমার আহার প্রস্তুত, আমি আহার করিতে যাইতেছি। আহার হইলে জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইব। তুমি এক্ষণে যাও।"

পেয়াদা বলিল, "তাহা হইবে না, তোমাকে এইক্ষণেই আমার সহিত যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে, ঠাঁই হইয়াছে ভাত প্রস্তুত, ভাত দুইটি মুখে দিয়া, চল, যাইতেছি। কারণ, আমি আহার না করিলে গৃহিণী আহার করিবেন না, ছাত্রগণেরও আহার হইবে না। সকলেই উপবাসী থাকিবে।"

পেয়াদা বলিল, "তাহা হইবে না, তোমাকে এক্ষণেই যাইতে হইবে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এইক্ষণেই যাইতে হইবে, বটে? আচ্ছা, তবে চল যাই।"

পেয়াদার সহিত নিরঞ্জন গিয়া জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "কখন আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছি, আপনার যে আর আসিবার বার হয় না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, আমার একটু বিলম্ব হইয়াছে।"

জমিদার বলিলেন, "বামুনমারীর মাঠে আপনার যে পঞ্চাশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি আছে, জরিপে তাহা পঞ্চান্ন বিঘা হইয়াছে। আপনার দলিলপত্র ভাল আছে, সেজন্য সবটুকু ভূমি আমি কাড়িয়া লইতে বাসনা করি না, তবে মাপে যেটুকু অধিক হইয়াছে, সেটুকু আমার প্রাপ্য।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ মহাশয়, দলিলপত্র আমার ভাল আছে। দেখুন দেখি; এই কাগজখানি কি না?"

জনার্দন চৌধুরী কাগজখানি হাতে লইয়া বলিলেন, "হাঁ, এই কাগজখানি বটে, ইহা আমি পূর্বে দেখিয়াছি, এখন আর দেখিবার আবশ্যক নাই।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জনের হাতে তিনি কাগজখানি ফিরাইয়া দিলেন। নিরঞ্জন কাগজখানি তামাক খাইবার আগুনের মালসায় ফেলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে কাগজখানি জ্বলিয়া উঠিল।

জমিদার বলিলেন, "হাঁ হাঁ, করেন কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কেবল পাঁচ বিঘা কেন? আজ হইতে আমার সমুদায় ব্রহ্মোত্তর আপনার। যিনি জীব দিয়াছেন, নিরঞ্জনকে তিনি আহার দিবেন।"

পাছে ব্রহ্মশাপে পড়েন, সেজন্য জনার্দন চৌধুরীর ভয় হইল। তিনি বলিলেন, "দলিল গিয়াছে গিয়াছে, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আপনি ভূমি ভোগ করুন, আপনাকে আমি কিছু বলিব না।"

নিরঞ্জন উত্তর করিলেন "না মহাশয়! জীব যিনি দিয়াছেন, আহার তিনি

দিবেন। সেই দীনবন্ধুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার প্রতি জীবন সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করাই ভাল। বিষয়বৈভবচিন্তায় যদি ধর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে, চিত্ত যদি বিচলিত হয়, তাহা হইলে সে বিষয়-বিভব পরিত্যাগ করাই ভাল। আমার ভূমি ছিল বলিয়াই তো আজ দুই প্রহরের সময় আপনার যবন পেয়াদার নিষ্ঠুর বচন আমাকে শুনিতে হইল? সুতরাং সে ভূমিতে আর আমার কাজ নাই। স্পৃহাশূন্য ব্যক্তির নিকট রাজা, ধনী, নির্ধন, সবাই সমান। আপনি বিষয়ী লোক, আপনি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। বুঝিতে পারিলেও আপনি সংসার-বন্ধনে নিতান্ত আবদ্ধ। মরীচিকা-মায়া-জালের অনুসরণ আপনাকে করিতেই হইবে। আতপ-তাপিত তৃষিত মরু-প্রান্তর হইতে আপনি মুক্ত হইতে পারিবেন না। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন কখনও কাহারও নিকট কোনও বিষয়ের নিমিত্ত নিজের জন্য আমাকে প্রার্থী না হইতে হয়।"

এই কথা বলিয়া নিরঞ্জন প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জনের সেই দিন হইতে অবস্থা মন্দ হইল। অতিকষ্টে তিনি দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া গোবর্ধন শিরোমণির চতুষ্পাঠীতে যাইল।

গোবর্ধন শিরোমণি জনার্দন চৌধুরীর সভা-পণ্ডিত, অনেকগুলি ছাত্রকে তিনি অন্নদান করেন। বিদ্যাদান করিবার তাঁহার অবকাশ নাই। চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে সকাল সন্ধ্যা উপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা ব্যতীত অধ্যাপকের নিমন্ত্রণে সর্বদা তাঁকাকে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে হয়। সুতরাং ছাত্রগণ আপনা-আপনি বিদ্যা শিক্ষা করে।

সেজন্য কিন্তু কেহ দুঃখিত নয়। গোবর্ধন শিরোমণির উপর রাগ হয় না, অভিমানও হয় না। কারণ, তিনি অতি মধুরভাষী, বাক্যসুধা দান করিয়া সকলকেই পরিতুষ্ট করেন। বিশেষতঃ ধনবান্ লোক পাইলে শ্রাবণের বৃষ্টিধারায় তিনি বাক্যসুধা বর্ষণ করিতে থাকেন; তৃষিত চাতকের ন্যায় তাঁহারা সেই সুধা পান করেন।

একদিন জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে আসিয়া তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতেছিলেন। নিরঞ্জন, গোবর্ধন প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তনু রায় বলিলেন, "কন্যাদান করিয়া বংশজ কিঞ্চিৎ সম্মান গ্রহণ করিবে। শাস্ত্রে ইহার বিধি আছে।"

নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ শাস্ত্রে আছে?" এরূপ শুল্কগ্রহণ করা তো ধর্মশাস্ত্রে একেবারেই নিষিদ্ধ।"

গোবর্ধন চুপি চুপি বলিলেন, "বল না, মহাভারতে আছে!"

তনু রায় তাহা শুনিতে পাইলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দাতা-কর্ণে আছে।"

এই কথা শুনিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিলেন। নিরঞ্জনের হাসি দেখিয়া তনু রায়ের রাগ হইল।

নিরঞ্জন বলিলেন, "রায় মহাশয়, কন্যার বিবাহ দিয়া টাকা গ্রহণ করা মহাপাপ! পাপ করিতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু শাস্ত্রের দোষ দিবেন না, শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিবেন না। শাস্ত্র আপনি জানেন না, শাস্ত্র আপনি পড়েন নাই।"

তনু রায় আর রাগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। নিরঞ্জনের প্রতি নানা কটু কথা প্রয়োগ করিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমি শাস্ত্র পড়ি নাই? ভাল, কিসের জন্য আমি পরের শাস্ত্র পড়িব? যদি মনে করি তো আমি নিজে কত শাস্ত্র করিতে পারি। যে নিজে শাস্ত্র করিতে পারে, সে পরের শাস্ত্র কেন পড়িবে?"

নিরঞ্জনকে এইবার পরাস্ত মানিতে হইল। তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল যে, যে লোক নিজে শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারে, পরের শাস্ত্র তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদায়

যেদিন রামহরির সহিত কথাবার্তা হইল, সেইদিন রাত্রিতে মা খেতুর গায়ে স্নেহের সহিত হাত রাখিয়া বলিলেন, "খেতু, বাবা, তোমাকে একটি কথা বলি।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা?"

মা উত্তর করিলেন, "বাছা, তোমার রামহরি দাদার সহিত তোমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।" খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোথায় মা?" মা বলিলেন, "তোমার মনে পড়ে না? সেই যে, যেখানে গাড়ি-ঘোড়া আছে।"

খেতু বলিলেন, "সেইখানে? তুমি সঙ্গে যাবে তো মা?"

মা উত্তর করিলেন, "না বাছা, আমি যাইব না, আমি এইখানেই থাকিব।"

খেতু বলিলেন, "তবে মা আমিও যাইব না।"

মা বলিলেন, "না গেলে বাছা চলিবে না। আমি মেয়ে মানুষ, আমাকে যাইতে নাই। রামহরি দাদার সঙ্গে যাইবে, তাতে আর ভয় কি?"

খেতু বলিলেন, "ভয়! ভয় মা আমি কিছুতে করি না। তবে তোমার জন্য আমার মন কেমন করিবে। তাই মা বলিতেছি যে, যাব না।"

মা বলিলেন, "খেতু, সাধ করিয়া কি তোমাকে আমি কোথাও পাঠাই? কি করি বাছা, না পাঠাইলে নয়, তাই পাঠাইতে চাই। তুমি এখন বড় হইয়াছ, এইবার তোমাকে স্কুলে পড়িতে হইবে। না পড়িলে শুনিলে মূর্খ হয়। মূর্খকে কেহ ভালবাসে না, কেহ আদর করে না। তুমি যদি স্কুলে যাও আর মন দিয়া লেখাপড়া কর, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে ভালবাসিবে। আর খেতু, তোমার এই দুঃখিনী মার দুঃখ ঘুচিবে। এই দেখ, আমি আর সরু পইতা কাটিতে পারি না, চক্ষে দেখিতে পাই না। আর কিছুদিন পরে হয়তো মোটা পইতাও কাটিতে পারিব না। তখন বল, পয়সা কোথায় পাইব? লেখাপড়া শিখিয়া তুমি টাকা আনিতে পারিলে, আমাকে আর পইতা কাটিতে হইবে না। আমি তখন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিব, পূজা-আর্চা করিব, আর ঠাকুরদের কাছে বলিব, খেতু আমার বড় সুছেলে, খেতুকে তোমরা বাঁচাইয়া রাখ।"

খেতু বলিলেন, "মা, আমি যদি যাই, তুমি কাঁদবে না?"

মা উত্তর করিলেন, "না বাছা, কাঁদব না।"

খেতু বলিলেন, "ওই যে মা কাঁদিতেছ!"

মা উত্তর করিলেন, "এখন কান্না পাইতেছে, ইহার পর আর কাঁদিব না। আর খেতু, সেখানে তোমাকে বারমাস থাকিতে হইবে না, ছুটি পাইলে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ি আসিবে। আমি পথপানে চাহিয়া থাকিব, আগে থাকিতে দত্তদের পুকুরধারে গিয়া বসিয়া থাকিব, সেইখান হইতে তোমাকে কোলে করিয়া আনিব। মন দিয়া লেখাপড়া করিলে, তুমি আবার আমাকে চিঠি লিখিতে শিখিবে। তুমি আমাকে কত চিঠি লিখিবে, আমি সে চিঠিগুলি তুলিয়া রাখিব, কাহাকেও খুলিতে দিব না, কাহাকেও পড়িতে দিব না। তুমি যখন বাড়িতে আসিবে, তখন সেই চিঠিগুলি খুলিয়া আমাকে পড়িয়া পড়িয়া শুনাইবে।"

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সেখানে মালা পাওয়া যায়?"

মা বলিলেন, "মালা কি?"

খেতু বলিলেন, "সেই যে মা, তুমি একদিন বলিয়াছিলে যে, রাত্রিতে ঘুম হয় না, যদি একছড়া মালা পাই তো বসিয়া বসিয়া জপ করি।"

মা উত্তর করিলেন, "হাঁ বাছা, মালা সেখানে অনেক পাওয়া যায়।"

খেতু বলিলেন, "আমি তোমার জন্য মা, ভাল মালা কিনিয়া আনিব।"

মা উত্তর করিলেন, "তাই ভাল, আমার জন্য মালা আনিও।"

মাতা-পুত্রে এইরূপ কথার পর, কলিকাতার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে খেতু নিদ্রিত হইলেন।

তাহার পরদিন সকালে উঠিয়া খেতু বলিলেন, "মা! এই কয়দিন আমি পাঠশালায় যাইব না, খেলা করিতেও যাইব না, সমস্ত দিন তোমার কাছে থাকিব।"

মা উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তাই ভাল, তবে তোমার নিরঞ্জন কাকাকে একবার নমস্কার করিতে যাইও।"

খেতু বলিলেন, "তা যাব। আমি আর একটি কথা বলি। তোমার খাওয়া হইলে, এ কয়দিন আমি তোমার পাতে ভাত খাইব। পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, কেন তা জান মা? যাহা তোমার মুখে ভাল লাগে, নিজে না খাইয়া আমার জন্য রাখ। তাই আমি বলি, দুপুর বেলা মা,

আমার ক্ষুধা পায় না, আমার জন্য পাতে ভাত রাখও না। ক্ষুধা কিন্তু মা খুব পায়। লোকের গাছতলায় কত ফুল কত বেল পড়িয়া থাকে, স্বচ্ছন্দে কুড়াইয়া খাই। কিন্তু তোমার ক্ষুধা পাইলে তুমি তো মা তা খাও না! তাই পাতে ভাত রাখিতে মানা করি, পাছে মা তোমার পেট না ভরে।"

ব্রাহ্মণী খেতুকে কোলে লইলেন, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিতে লাগিলেন, আর বলিলেন, "বাবা, এ দুঃখের কান্না নয়। তোমা হেন চাঁদ ছেলে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তার আবার দুঃখ কিসের? তোমার সুধামাখা কথা শুনিলে ভয় হয়, এ হতভাগিনীর কপালে তুমি কি বাঁচিবে?"

সেইদিন আহারাদির পর, খেতুর ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়গুলি মা সেলাই করিতে বসিলেন।

খেতু বলিলেন, "মা! আমি ছেঁড়ার দুই ধার এক করিয়া ধরি, তুমি, ওদিক হইতে সেলাই কর, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র হইবে। আর মা, যখন সুঁচে সুতা না থাকিবে, তখন আমি পরাইয়া দিব। তুমি ছিদ্রটি দেখিতে পাও না, সুতা পরাইতে তোমার অনেক বিলম্ব হয়।"

এইরূপে মাতা-পুত্রে কথা কাহতে কাহতে কাপড় সেলাই হইতে লাগল। তাহার পর মা সেইগুলিকে ক্ষারে কাচিয়া পরিষ্কার করিয়া লইলেন। খেতু কলিকাতায় যাইবেন, তাহার আয়োজন এইরূপে হইতে লাগিল।

বৈকালবেলা খেতু নিরঞ্জনের বাটী যাইলেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইয়া কলিকাতায় যাইবার কথা তাঁহাদিগকে বলিলেন। রামহরির নিকট নিরঞ্জন পূর্বেই সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন।

এক্ষণে খেতুকে আশীর্বাদ করিয়া, নানারূপ উপদেশ দিয়া নিরঞ্জন বলিলেন, "খেতু, সর্বদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কখনও বলিও না। নীচতা ও নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে। জীবে দয়া করিবে। যথাসাধ্য পরোপকার করিবে। ইহাই সনাতন ধর্ম। সুখ-দুঃখের সকল কথা তোমার রামহরি দাদাকে বলিবে, কোনও কথা তাঁহার নিকট গোপন করিবে না। অনেক বালকের সহিত তোমাকে পড়িতে হইবে, তাহার মধ্যে কেহ দুষ্ট, কেহ শিষ্ট। সুতরাং বালকে বালকে বিবাদ হইবে। অন্যায় করিয়া কাহাকেও শাস্তিও না, দুর্বলকে মারিও না, পাঁচজনে পড়িয়া একজনকে মারিও না।

দুর্বলকে কেহ মারিতে আসিলে তাহার পক্ষ হইও। দুর্বলের পক্ষ হইয়া যদি মার খাইতে হয়, সেও ভাল। প্রতিদিন রাত্রিতে শুইবার সময় মনে করিয়া দেখিবে যে, সেদিন কি সুকার্য, কি কুকার্য করিয়াছ। যদি কোনও প্রকার কুকার্য করিয়া থাক, তো মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিবে যে, আর এমন কাজ কখনও করিব না।"

এইরূপে খেতু নিরঞ্জন কাকার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন

মঙ্গলবার রাত্রিতে মাতা-পুত্রের নিদ্রা হইল না। দুইজনে কেবল কথা কহিতে লাগিলেন, কথা আর ফুরায় না।

কতবার মা বলিলেন, "খেতু ঘুমাও, না ঘুমাইলে অসুখ করিবে।"

খেতু বলিলেন, "না মা, আজ রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আর মা, কাল রাত্রিতে তো আর তোমার সঙ্গে কথা কাহতে পাব না। কাল কতদূর চলিয়া যাব। সে কথা যখন মা মনে করি, তখন আমার কান্না পায়।"

মা বলিলেন, "পূজার ছুটির আর অধিক দিন নাই, দেখিতে দেখিতে এ কয়মাস কাটিয়া যাইবে। তখন তুমি আবার বাড়ি আসিবে।"

প্রাতঃকালে রামহরি আসিলেন। খেতুর মা, খেতুর কাপালে দধির ফোঁটা করিয়া দিলেন, চাদরের খুঁটে বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিলেন। নীরবে নিঃশব্দে রামহরির হাতের উপর খেতুর হাতটি দিলেন। চক্ষু ফুটিয়া জল আসিতেছিল, অনেক কষ্টে তাহা নিবারণ করিলেন।

অবশেষে ধীরে ধীরে কেবল এই কথাটি বলিলেন, "দুঃখিনীর ধন তোমাকে দিলাম।"

রামহরি বলিলেন, "খেতু, মাকে নমস্কার কর।"

খেতু প্রণাম করিলেন, রামহরি নিজেও প্রণাম করিয়া দুইজনে বিদায় হইলেন।

যতক্ষণ দেখা যাইল, ততক্ষণ খেতুর মা অনিমিষ নয়নে সেই পথপানে চাহিয়া রহিলেন। খেতুও মাঝে মাঝে পশ্চাৎদিকে চাহিয়া মাকে দেখিতে লাগিলেন। যখন আর দেখা গেল না, তখন খেতুর মা পথের ধুলায় শুইয়া পড়িলেন। ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া অবিরল ধারায় চক্ষের জলে সেই ধুলা ভিজাইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কঙ্কাবতী

পথে পড়িয়া খেতুর মা কাঁদিতেছেন, এমন সময় তনু রায়ের স্ত্রী সেইখানে আসিলেন।

তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "দিদি, চুপ কর। চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিতে নাই, চক্ষের জল ফেলিলে ছেলের অমঙ্গল হয়।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন, "সব জানি বোন্? কিন্তু কি করি? চক্ষের জল যে রাখিতে পারি না, আপনা-আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমি যে আজ পৃথিবী শূন্য দেখিতেছি। কি করিয়া ঘরে যাই? আজ যে আমার আর কোনও কাজ নাই। আজ তো আর খেতু পাঠশালা হইতে কালি-ঝুলি মাখিয়া ক্ষুধা ক্ষুধা করিয়া আসিবে না। এতক্ষণ খেতু কতদূর চলিয়া গেল! আহা, বাছার কত না মন কেমন করিতেছে।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "চল দিদি, ঘরে চল। সেইখানে বসিয়া, চল, খেতুর গল্প করি। আহা, খেতু কি গুণের ছেলে! দেশে এমন ছেলে নাই। তোমার কপালে এখন বাঁচিয়া থাকে—তবেই, তা না হইলে সব বৃথা।"

এই বলিয়া তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে খেতুর গল্প করিলেন।

খেতু খাইয়া গিয়াছিল, তনু রায়ের স্ত্রী সেই বাসনগুলি মাজিলেন ও ঘর-দ্বার সব পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বেলা হইলে খেতুর মা রাঁধিয়া খাইবেন, সে নিমিত্ত তরকারিগুলি কুটিয়া দিলেন, বাটনাটুকু বাটিয়া দিলেন।

খেতুর মা বলিলেন, "থাক বোন্ থাক্, আজ আর আমার খাওয়া দাওয়া! আজ আর আমি কিছু খাইব না।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "না দিদি! উপবাসী কি থাকিতে আছে? খেতুর অকল্যাণ হইবে।"

"খেতুর অকল্যাণ হইবে" এই কথাটি বলিলেই খেতুর মা চুপ! যা করিলে খেতুর অকল্যাণ হয় তা কি তিনি করিতে পারেন?

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন, "এই সব ঠিক করিয়া দিলাম। বেলা হইলে রান্না চড়াইয়া দিও। কাজ-কর্ম সারা হইলে আমি আবার ওবেলা আসিব।"

অপরাহ্নে তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় আসিলেন। কোলের মেয়েটিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

খেতুর মা বলিলেন, "আহা! কি সুন্দর মেয়েটি বোন্! যেমন মুখ, তেমনি চুল, তেমনি রং।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "হাঁ! সকলেই বলে, এ কন্যাটি তোমার গর্ভের সুন্দর। তা দিদি! এ পোড়া পেটে কেন যে এরা আসে? মেয়ে হইলে ঘরের মানুষটি আহ্লাদে আটখানা হন; কিন্তু আমার মনে হয় যে, আঁতুড় ঘরেই মুখে নুন দিয়া মারি। গ্রীষ্মকালে একাদশীর দিন, মেয়ে দুইটির যখন মুখ শুকাইয়া যায়, যখন একটু জলের জন্য বাছাদের প্রাণ টা টা করে, বল দেখি, দিদি! মার প্রাণ তখন কিরূপ হয়? পোড়া নিয়ম! যে এ নিয়ম করিয়াছে, তাহাকে যদি একবার দেখিতে পাই, তো ঝাঁটা-পেটা করি। মুখপোড়া যদি একটু জল খাবারও বিধান দিত, তাহা হইলে কিছু বলিতাম না!"

খেতুর মা বলিলেন, "আর জন্মে যে যেমন করিয়াছে, এ জন্মে সে তার ফল পাইয়াছে, আবার এ জন্মে যে যেরূপ করিবে সে তার ফল পাইবে।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "তা বটে, কিন্তু মার প্রাণ কি সে কথায় প্রবোধ মানে গা?"

তনু রায়ের স্ত্রী পুনরায় বলিলেন, "এক একবার মনে হয় যে, যদি বিদ্যাসাগরী মতটা চলে তো ঠাকুরদের সিন্নি দিই।"

খেতুর মা উত্তর করিলেন, "চুপ কর বোন্! ছি ছি! ও কথা মুখে আনিও না! বিদ্যাসাগরের কথা শুনিয়া সাহেবরা যদি বলেন যে, দেশে আর বিধবা থাকিতে পাবে না, সকলকেই বিবাহ করিতে হইবে, ছি, ছি! ও মা, কি ঘৃণার কথা! এই বৃদ্ধ বয়সে তাহা হইলে যাব কোথা? কাজেই তখন গলায় দড়ি দিয়া কি জলে ডুবিয়া মরিতে হইবে!"

তনু রায়ের স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "দিদি! এতদিন তুমি কলিকাতায় ছিলে, কিন্তু তুমি কিছুই জান না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বুড়োহাবড়া সকলকেই ধরিয়া বিবাহ দিতে চান নাই। অতি অল্পবয়সে যাহারা বিধবা হয়, কেবল সেই বালিকাদিগের বিবাহের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তাও যাহার ইচ্ছা হবে, সে দিবে; যাহার ইচ্ছা না হবে, না দিবে।"

খেতুর মা বলিলেন, "কি জানি, ভাই! আমি অত শত জানি না।"

তনু রায়ের স্ত্রীর দুইটি বিধবা মেয়ে, তাহাদের দুঃখে তিনি সর্বদাই কাতর। সেজন্য বিধবা-বিবাহের কথা পড়িলে তিনি কান দিয়া শুনিতেন। কলিকাতায় বাস করিয়া খেতুর মা যাহা না জানেন, তাহা ইনি জানেন।

তনু রায় পণ্ডিত লোক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতটি যেই বাহির হইল, আর ইনি লুফিয়া লইলেন।

তিনি বলিলেন, "বিধবা-বিবাহের বিধি যদি শাস্ত্রে আছে, তবে তোমরা মানিবে না কেন? শাস্ত্র অমান্য করা ঘোর পাপের কথা। দুই-বার কেন? বিধবাদিগের দশবার বিবাহ দিলেও কোন দোষ নাই, বরং পুণ্য আছে। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশ ঘোর কুসংস্কারে পরিপূর্ণ, এ দেশের আর মঙ্গল নাই।"

তনু রায়ের মত নিষ্ঠাবান্ লোকের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া প্রথম প্রথম সকলে কিছু আশ্চর্য হইয়াছিল। তারপর সকলে ভাবিল, "আহা! বাপের প্রাণ! ঘরে দুইটি বিধবা মেয়ে, মনের খেদে উনি এইরূপ কথা বলিতেছেন।"

কেবল নিরঞ্জন বলিলেন, "হাঁ! বিধবা-বিবাহটি প্রচলিত হইলে তনু রায়ের ব্যবসাটি চলে ভাল।"

এই কথা শুনিয়া সকলে নিরঞ্জনকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলে বলিল, "নিরঞ্জনের মনটি হিংসায় পরিপূর্ণ। তা না হইলেই বা ওঁর এমন দশা হইবে কেন? যার দুইশত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী; কোনও দিন অন্ন হয়, কোনও দিন অন্ন হয় না।"

খেতুর মাতে আর তনুর রায়ের স্ত্রীতে নানারূপ কথাবার্তা হইতে লাগিল।

খেতুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ মেয়েটি বুঝি একবৎসরের হইল?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "হাঁ, এই একবৎসর পার হইয়া দুই বৎসরে পড়িবে।"

খেতুর মা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটির নাম রাখিয়াছ কি?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "ইহার নাম হইয়াছে কনকাবতী।"

খেতুর মা বলিলেন, "কঙ্কাবতী। দিব্য নামটি তো? মেয়েটিও যেমন নরম নরম দেখিতে, নামটিও সেইরূপ নরম নরম শুনিতে।"

এইরূপ খেতুর মাতে আর তনু রায়ের স্ত্রীতে ক্রমে ক্রমে বড়ই সদ্ভাব হইল। অবসর পাইলে তনু রায়ের স্ত্রী খেতুর মার কাছে আসেন, আর খেতুর মাও তনু রায়ের বাটীতে যান। মাঝে মাঝে তনু রায়ের স্ত্রী কঙ্কাবতীকে খেতুর মার কাছে ছাড়িয়া যান।

মেয়েটি এখনও হাঁটিতে শিখে নাই; হামাগুড়ি দিয়া চারিদিকে বেড়ায়, কখনও বা বসিয়া খেলা করে, কখনও বা কিছু ধরিয়া দাঁড়ায়। খেতুর মা আপনার কাজ করেন ও তাহার সহিত দুটি একটি কথা কন। কথা কহিলে মেয়েটি ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে, মুখে হাসি ধরে না। মেয়েটি বড় শান্ত, কাঁদিতে একেবারে জানে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বালক-বালিকা

কলিকাতায় গিয়া খেতু ভালরূপে লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। শান্ত, শিষ্ট, সুবুদ্ধি। খেতুর নানা গুণ দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

রামহরির এক্ষণে কেবল একটি শিশু-পুত্র, তাহার নাম নরহরি। তিন বৎসর পরে একটি কন্যা হয়; তাহার নাম হইল সীতা।

রামহরি ও রামহরিব স্ত্রী, খেতুকে আপনাদিগের ছেলেব চেয়ে অধিক স্নেহ করিতেন। খেতুর প্রখর বুদ্ধি দেখিয়া স্কুলে সকলেই বিস্মিত হইলেন। খেতু সকল কথা বুঝিতে পাবেন, সকল কথা মনে করিয়া রাখিতে পারেন। যখন যে শ্রেণীতে পড়েন, তখন সেই শ্রেণীর সর্বোত্তম বালক—খেতু; খেতুর উপর কেহ উঠিতে পাবে না। যখন যে কয়খানি পুস্তক পড়েন, তাহার ভিতর হইতে প্রশ্ন করিয়া খেতুকে ঠকানো ভার। এইরূপে খেতু এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীতে উঠিতে লাগিলেন।

জল খাইবার নিমিত্ত রামহবি খেতুকে একটি করিয়া পয়সা দিতেন, খেতু কোনও দিন খাইতেন, কোনও দিন খাইতেন না। কি করিয়া রামহরি এই কথা জানিতে পারিলেন।

খেতুকে তিনি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতু! তুমি জল খাও না কেন? পয়সা লইয়া কি কর?"

খেতু কিছু অপ্রতিভ হইলেন, একটুখানি চুপ করিয়া উত্তর করিলেন, "দাদা মহাশয়! যেদিন বড ক্ষুধা পায়, যেদিন আব থাকিতে পারি না, সেইদিন জল খাই; যেদিন না খাইয়া থাকিতে পারি, সেইদিন আব খাই না। যা পয়সা বাঁচিয়াছে, তাহা আমার কাছে আছে। যখন মাব নিকট হইতে আসি, তখন মাকে বলিয়াছিলাম যে, মা তোমার জন্য আমি একছড়া মালা কিনিয়া আনিব, সেইজন্য এই পয়সা রাখিতেছি।"

যখন এই কথা হইতেছিল, তখন রামহরির নিকট খেতু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রামহরি খেতুর মাথায় হাত দিয়া সম্মুখের চুলগুলি পশ্চাৎদিকে ফিরাইতে লাগিলেন। খেতু বুঝিলেন, দাদা রাগ করেন নাই, আদর করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রামহরি বলিলেন, "খেতু, যখন মালা কিনিবে আমাকে বলিও আমি ভাল মালা কিনিয়া দিব।"

পূজার ছুটি নিকট হইল। তখন খেতু বলিলেন, "দাদা মহাশয়, কই! এইবার মালা কিনিয়া দিন?"

রামহরি বলিলেন, "তোমার কতগুলি পয়সা হইয়াছে, নিয়ে এস দেখি?"

খেতু পয়সাগুলি আনিয়া দাদার হাতে দিলেন। রামহরি গণিয়া দেখিলেন যে, এক টাকারও অধিক পয়সা হইয়াছে। আটআনা দিয়া রামহরি একছড়া ভাল রুদ্রাক্ষের মালা কিনিয়া, বাকি পয়সাগুলি খেতুকে ফিরাইয়া দিলেন।

খেতু বলিলেন, "দাদা মহাশয়, আমি এ পয়সা লইয়া আর কি করিব? এ পয়সা আপনি নিন্।"

রামহরি উত্তর করিলেন, "না খেতু, এ পয়সা আমার নয়, এ পয়সা তোমার, বাড়ি গিয়া মাকে দিও, তোমার মা কত আহ্লাদ করিবেন।"

বাড়ি যাইবার দিন নিকট হইল। এখানে খেতুর মনে, আর সেখানে মার মনে আনন্দ আর ধরে না। তসর ও গালার ব্যবসায়ীরা সকলে এখন দেশ যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত রামহরি খেতুকে পাঠাইয়া দিলেন, আর কবে কোন্ সময় দেশে পৌছিবেন, সে সমাচার আগে থাকিতে খেতুর মাকে লিখিলেন।

দত্তদের পুকুরধারে কেন, খেতুর মা আরও অনেক দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। দূর হইতে খেতু মাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। খেতুর মা ছেলেকে বুকে করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিলেন।

খেতু বলিলেন, "ওই যা! মা আমি তোমাকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গিয়াছি।"

মা উত্তর করিলেন, "থাক্, আর প্রণামে কাজ নাই। অমনি তোমাকে আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও, তোমার সোনার দোয়াত-কলম হউক্।"

খেতু বলিলেন, "মা, আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি দত্তদের পুকুর-ধারে থাকিবে, এত দূরে আসিবে তা জানিতাম না!"

মা বলিলেন, "বাছা, যদি উপায় থাকিত, তো আমি কলিকাতা পর্যন্ত যাইতাম। খেতু, তুমি রোগা হইয়া গিয়াছ।"

খেতু উত্তর করিলেন, "না মা, রোগা হই নাই, পথে একটু কষ্ট হইয়াছে, তাই রোগা রোগা দেখাইতেছে। মা, এখন আমি হাঁটিয়া যাই, এত দূর তুমি আমাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

মা বলিলেন, "না না, আমি তোমাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইব।"

কোলে যাইতে যাইতে খেতু পয়সাগুলি চুপি চুপি মার আঁচলে বাঁধিয়া দিলেন। বাড়ি যাইয়া যখন খেতু মার কোল হইতে নামিলেন, তখন মার আঁচল ভারী ঠেকিল।

মা বলিলেন, "এ আবার কি? খেতু, তুমি বুঝি আমার আঁচলে পয়সা বাঁধিয়া দিলে?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন, আর বলিলেন, "মা, রও তোমাকে আবার একটা তামাশা দেখাই।"

এই বলিয়া খেতু মালা-ছড়াটি মার গলায় দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, "কেমন মা মনে আছে তো?"

মা খেতুর গালে ঈষৎ ঠোনা মারিয়া বলিলেন, "ভারী দুষ্ট ছেলে।" খেতু হাসিয়া উঠিলেন, মাও হাসিলেন।

পরদিন খেতু দেখিলেন যে, তাঁহাদের বাটীতে কোথা হইতে একটি ছোট মেয়ে আসিয়াছে।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ও মেয়েটি কাদের গা?"

মা বলিলেন, "জান না? ও যে তোমার তনু কাকার ছোট মেয়ে! ওর নাম কঙ্কাবতী। তনু রায়ের স্ত্রী এখন সর্বদাই আমার নিকট আসেন। আমি পইতা কাটি, আর দুইজনে বসিয়া গল্পগাছা করি। মেয়েটিকে তিনি আমার কাছে মাঝে মাঝে ছাড়িয়া যান। মেয়েটি আপনার মনে খেলা করে, কোনও রূপ উপদ্রব করে না। আমার কাছে থাকিতে ভালবাসে।"

তনু রায়ের সহিত খেতুর কোনও সম্পর্ক নাই, কেবল পাড়া-প্রতিবাসী সুবাদে কাকা কাকা করিয়া ডাকেন।

কঙ্কাবতীকে খেতু বলিলেন, "এস, এই দিকে এস।"

কঙ্কাবতী সেইদিকে যাইতে লাগিল। খেতু বলিলেন, "দেখ দেখ মা, কেমন এ টল্ টল্ করিয়া চলে।"

খেতুর মা কহিলেন, "পা এখনও শক্ত হয় নাই।"

একটি পাতা দেখাইয়া খেতু বলিলেন, "এই নাও।"

পাতাটি লইবার নিমিত্ত কঙ্কাবতী হাত বাড়াইল ও হাসিল।

খেতু বলিলেন, "মা, কেমন হাসে দেখ!"

মা উত্তর করিলেন, "হাঁ বাছা, মেয়েটি খুব হাসে, কাঁদিতে একেবারে জানে না, অতি শান্ত।"

খেতু বলিলেন, "মা, আগে যদি জানিতাম তো ইহার জন্য একটি পুতুল কিনিয়া আনিতাম।"

মা বলিলেন, "এইবার যখন আসিবে, তখন আনিও।"

নবম পরিচ্ছেদ

মৈনী

পূজার ছুটি ফুরাইলে, খেতু কলিকাতায় যাইলেন; সেখানে অতি মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে লাগিলেন। বৎসরের মধ্যে দুইবার ছুটি হইলে তিনি বাটী আসেন। সেই সময় মার জন্য কোনও না কোনও দ্রব্য, আর কঙ্কাবতীর জন্য পুতুলটি খেলানাটি লইয়া আসেন। খেতুর মার নিকট কঙ্কাবতী সর্বদাই থাকে, কঙ্কাবতীকে তিনি বড় ভালবাসেন।

খেতুর যখন বার বৎসর বয়স, তখন তিনি একটি বড় মানুষের ছেলেকে পড়াইতে লাগিলেন। বালকের পিতা খেতুকে মাসে পাঁচ টাকা করিয়া দিতেন।

প্রথম মাসের টাকা কয়টি, খেতু রামহরির হাতে দিয়া বলিলেন, "দাদা মহাশয়! এ মাস হইতে মার চাউলের দাম আর আপনি দিবেন না, এই টাকা মাকে দিবেন। আমি শুনিয়াছি, আপনার ধার হইয়াছে তাই যত্ন করিয়া আমি এই টাকা উপার্জন করিয়াছি।"

রামহরি বলিলেন, "খেতু, তুমি উত্তম করিয়াছ। উদ্যম, উৎসাহ, পৌরুষ মনুষ্যের নিতান্ত প্রয়োজন। এ টাকা আমি তোমার মার নিকট পাঠাইয়া দিব। তাঁহাকে লিখিব যে, তুমি নিজে এ টাকা উপার্জন করিয়াছ। আর আমি সকলকে বলিব যে, দ্বাদশ বৎসরের শিশু আমাদের খেতু, তাহার মাকে প্রতিপালন করিতেছে।"

এইবার যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন মার জন্য একখানি নামাবলি, আর কঙ্কাবতীর জন্য একখানি রাঙা কাপড় আনিলেন। রাঙা কাপড়খানি পাইয়া কঙ্কাবতীর আর আহ্লাদ ধরে না। ছুটিয়া তাহার মাকে দেখাইতে যাইলেন।

খেতু বলিলেন, "মা, কঙ্কাবতীকে লেখাপড়া শিখাইলে হয় না?"

মা বলিলেন, "কি জানি বাছা, তনু রায় এক প্রকারের লোক। কি বলিতে কি বলিয়া বসিবে।"

খেতু বলিলেন, "তাতে আর দোষ কি, মা? কলিকাতায় কত মেয়ে স্কুলে যায়।"

মা বলিলেন, "কঙ্কাবতীর মাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।"

সেইদিন তনু রায়ের স্ত্রী আসিলে, খেতুর মা কথায় কথায় বলিলেন, "খেতু বলিতেছে, এবার যখন বাটী আসিব, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি বই আনিব, কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব। আমি বলিলাম না বাছা! তাতে আর কাজ নাই, তোমার তনু কাকা হয় তো রাগ করিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "তাতে আবার রাগ কি? আজকাল তো ওই সব হইয়াছে। জামা গায়ে দেওয়া, লেখাপড়া করা, আজকাল তো সকল মেয়েই করে। তবে আমাদের পাড়া-গাঁ তাই, এখানে ও-সব নাই।"

বাটী গিয়া কঙ্কাবতীর মা স্বামীকে বলিলেন, "খেতু বাড়ি আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর জন্য কেমন একখানি কাপড় আনিয়াছে!"

তনু রায় বলিলেন, "খেতু ছেলেটি ভাল। লেখাপড়ায় মন আছে। দু-পয়সা আনিয়া খাইতে পারিবে। তবে বাপের মতো ডোকলা না হয়।"

স্ত্রী বলিলেন, "খেতু বলিতেছিল যে, এইবার যখন বাটী আসিব, তখন একখানি বই আনিয়া কঙ্কাবতীকে একটু একটু পড়িতে শিখাইব।"

তনু রায় বলিলেন, "স্ত্রীলোকের আবার লেখাপড়া কেন? লেখাপড়া শিখিয়া আর কাজ নাই।"

না বুঝিয়া তনু রায় এই কথাটি বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন তিনি স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, লেখাপড়ায় অনেক গুণ আছে।

আজকালের বরেরা শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে ভালবাসে। এরূপ কন্যার আদর হয়, মূল্যও অধিক হয়।

তবে কথা এই, কাজটি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কি না? শাস্ত্রসম্মত না হইলে তনু রায় কখনই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে দিবেন না। মনে মনে তনু রায় শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন। বিচার করিয়া দেখিলেন যে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বটে, তবে এ নিষেধটি সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের নিমিত্ত, কলিকালের জন্য নয়। পূর্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা

করিতে নাই। তাহার দৃষ্টান্ত, নরমেধ যজ্ঞ। এখন মানুষ বলি দিলে ফাঁসি যাইতে হয়। আর এক দৃষ্টান্ত, সমুদ্রযাত্রা এখন করিলে জাতি যায়।

তাই তনু রায়ের মা যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি একবার সাগর যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তনু রায় কিছুতেই পাঠান নাই। মাকে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "মা, সাগর যাইতে নাই। সমুদ্রযাত্রা একেবারে নিষিদ্ধ। শাস্ত্রের সঙ্গে আর সমুদ্রের সঙ্গে ঘোরতর আড়ি। সমুদ্র দেখিলে পাপ, সমুদ্র ছুঁইলে পাপ। কেন মা পয়সা খরচ করিয়া পাপের ভার কিনিয়া আনিবে? কেন মা জাতি-কুল বিসর্জন দিয়া আসিবে?"

এক্ষণে তনু রায় বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পূর্বকালে যাহা করিতে ছিল, এখন তাহা করিতে নাই। সুতরাং পূর্বকালে যাহা করিতে মানা ছিল, এখন তাহা লোকে স্বচ্ছন্দে করিতে পারে। স্ত্রালোকদিগের লেখাপড়া শিক্ষা করা পূর্বে মানা ছিল, তাই এখন তাহাতে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। শাস্ত্রকে তনু রায় এইরূপ ভাঙিয়া-চুরিয়া গড়িলেন। শাস্ত্রটি যখন মনের মত গড়া হইল, তখন তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, "আচ্ছা, খেতু যদি কঙ্কাবতীকে একটু আধটু পড়িতে শিখায়, তাহাতে আমার বিশেষ কোনও আপত্তি নাই।"

তনু রায়ের স্ত্রী সেই কথা খেতুর মাকে বলিলেন। খেতুর মা সেই কথা খেতুকে বলিলেন। এবার যখন খেতু বাড়ি আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর জন্য একখানি প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় আনিলেন। লেখা পড়া শিখিব, এই কথা মনে করিয়া প্রথম প্রথম কঙ্কাবতীর খুব আহ্লাদ হইল। কিন্তু দুই চারি দিন পরেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, লেখাপড়া শিক্ষা করা নিতান্ত আমোদের কথা নহে। কঙ্কাবতীর চক্ষে অক্ষরগুলি সব একপ্রকার দেখায়। কঙ্কাবতী এটি বলিতে সেটি বলিয়া ফেলেন।

খেতুর রাগ হইল। খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তোমার লেখাপড়া হইবে না। চিরকাল তুমি মূর্খ হইয়া থাকিবে।"

কঙ্কাবতী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কি করিব, আমার যে মনে থাকে না।"

খেতুর মা বলিলেন, "ছেলেমানুষকে কি বকিতে আছে? মিষ্ট কথা বলিয়া শিখাইতে হয়। এস মা, তুমি আমার কাছে এস, তোমার আর লেখা-পড়া শিখিতে হইবে না।"

খেতু বলিলেন, "মা, কঙ্কাবতী রাত্রি দিন মেনীকে লইয়া থাকে। তাতে কি আর লেখাপড়া হয়?" মেনী কঙ্কাবতীর বিড়াল। অতি আদরের ধন মেনী।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "জ্যেঠাইমা! আমি মেনীকে ক খ শিখাই, তা আমিও যেমনি বোকা, মেনীও তেমনি বোকা। কেমন মেনী, না? মেনীও পড়িতে পারে না, আমিও পড়িতে পারি না। আমিও ছেলে মানুষ মেনীও ছেলে মানুষ। আমিও বড় হইলে পড়িতে শিখিব, মেনীও বড় হইলে পড়িতে শিখিবে। না মেনী?"

খেতু হাসিয়া উঠিলেন। খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী। তুমি পাগল না কি?"

যাহা হউক, ক্রমে কঙ্কাবতীর প্রথমভাগ বর্ণ-পরিচয় সায় হইল। খেতু বলিলেন, "আমি শীঘ্র কলিকাতায় যাইব। তাড়াতাড়ি করিয়া প্রথমভাগখানি শেষ করিলাম, কিন্তু ভাল করিয়া হইল না। এই কয় মাসে পুস্তকখানি একেবারে মুখস্থ করিয়া রাখিবে। এবার আমি দ্বিতীয়ভাগ লইয়া আসিব।"

পুনরায় যখন খেতু বাটী আসিলেন, তখন কঙ্কাবতীর দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইল। কঙ্কাবতীকে আর পড়াইতে হইল না। কঙ্কাবতী এখন আপনা-আপনি সব পড়িতে শিখিলেন। খেতু কঙ্কাবতীকে একখানি পাটীগণিত দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কঙ্কাবতী অঙ্ক শিখিলেন। মাঝে মাঝে খেতু কেবল একটু আধটু বসিয়া বলিতে দিতেন।

কঙ্কাবতী পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। কলিকাতা হইতে খেতু তাঁহাকে নানারূপ পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠাইয়া দিতেন। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনগুলি পর্যন্ত কঙ্কাবতী পড়িতেন।

দশম পরিচ্ছেদ

বউদিদি

তের বৎসর বয়সে খেতু ইংরেজীতে প্রথম পাসটি দিলেন। পাস দিয়া তিনি জলপানি পাইলেন। জলপানি পাইয়া মার নিকট তিনি একটি ঝি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। মা বৃদ্ধ হইতেছেন, মার যেন কোনও কষ্ট না হয়। এটি সেটি আনিয়া কাপড়খানি চোপড়খানি কিনিয়া রামহরির সংসারেও তিনি সহায়তা করিতে লাগিলেন।

পনর বৎসর বয়সে খেতু আর একটি পাস দিলেন। জলপানি বাড়িল। সতর বৎসর বয়সে আর একটি পাস দিলেন। জলপানি আরও বাড়িল। খেতু টাকা পাইতে লাগিলেন, সেই টাকা দিয়া মার দুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচাইলেন। মা যখন যাহা চান, তৎক্ষণাৎ তাহা পান। তাহার আর কিছুমাত্র অভাব রহিল না।

শিবপূজা করিবেন বলিয়া খেতুর মা একদিন ফুল পান নাই। তাহা শুনিয়া খেতু বাড়ির নিকট চমৎকার একটি ফুলের বাগান করিলেন। কলিকাতা হইতে গাছ লইয়া সেই বাগানে পুঁতিলেন। নানা রঙের ফুলে বাগানটি বার মাস আলো করিয়া থাকিত।

রামহরির কন্যা সীতার এখন সাত বৎসর বয়স। মা একেলা থাকেন, সেইজন্য দাদাকে বলিয়া, খেতু সীতাকে মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সীতাকে পাইয়া খেতুর মার আর আনন্দের অবধি নাই।

কঙ্কাবতীও সীতাকে খুব ভালবাসিতেন। বৈকাল বেলা দুইজনে গিয়া বাগানে বসিতেন। কঙ্কাবতী এখন খেতুর সম্মুখে বড় বাহির হন না। খেতুকে দেখিলে কঙ্কাবতীর এখন লজ্জা করে।

তবে খেতুর গল্প করিতে, খেতুর গল্প শুনিতে তিনি ভালবাসিতেন। অন্য লোকের সহিত খেতুর গল্প করিতে, কিংবা অন্য লোকের মুখে খেতুর কথা শুনিতে, তাঁর লজ্জা করিত। এ সব কথা সীতার সহিত হইত। বৈকাল বেলা দুইজনে ফুলের বাগানে যাইতেন। নানা ফুলে মালা গাঁথিয়া কঙ্কাবতী সীতাকে সাজাইতেন। ফুল দিয়া নানারূপ গহনা গড়িতেন। গলায়, হাতে, মাথায়, যেখানে যাহা ধরিত, কঙ্কাবতী সীতাকে ফুলের গহনা

পরাইতেন। তাহার পর সীতার মুখ হইতে বসিয়া বসিয়া খেতুর কথা শুনিতেন।

নিরঞ্জন কাকাকে খেতু ভুলিয়া যান নাই। যখন খেতু বাটী আসেন, তখন নিরঞ্জন কাকার জন্য কিছু না কিছু লইয়া আসেন। নিরঞ্জন ও নিরঞ্জনের স্ত্রী তাঁহাকে বিধিমতে আশীর্বাদ করেন।

কঙ্কাবতী বড় হইতে, খেতু তাঁহাকে পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যতীত আরও নানা দ্রব্য দিতেন। আজকাল বালিকাদিগের নিমিত্ত যেরূপ শেমিজ প্রভৃতি পরিচ্ছদ প্রচলিত হইয়াছে, কঙ্কাবতীর নিমিত্ত কলিকাতা হইতে খেতু তাহা লইয়া যাইতেন।

রামহরির সংসারের খেতু সহায়তা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু রামহরি এ কথায় সহজে স্বীকার হন নাই। একবার খেতু নরহরির জন্য একজোড়া কাপড় কিনিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া রামহরি খেতুকে বকিয়াছিলেন। খেতুর তাহাতে অতিশয় অভিমান হইয়াছিল। দাদাকে কিছু না বলিয়া তিনি রামহরির স্ত্রীর নিকট গিয়া নানারূপ দুঃখ করিতে লাগিলেন। রামহরির স্ত্রীকে খেতু বউদিদি বলিয়া ডাকিতেন।

খেতুর অভিমান দেখিয়া বউদিদি বলিলেন, "তোমার দাদাকে কিছু বলিতে না পারিয়া, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে আসিয়াছ?"

খেতু উত্তর করিলেন, "বউদিদি! তোমরা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছ। তোমাদের পুত্র যেরূপ, আমাকেও সেইরূপ দেখা উচিত। পুত্রের মত আমাকে যখন না দেখিলে, তখন আমি পর। আমি যখন পর, তখন আবার তোমাদের সঙ্গে আমার ঝগড়া কি? দাদা মহাশয় আমাকে পর মনে করিয়াছেন, এখন তুমিও তাহাই কর, তাহা হইলে সকল কথাই ফুরাইয়া যায়।"

বউদিদি বলিলেন, "তাহা হইলে কি হয়, খেতু?"

খেতু উত্তর করিলেন, "কি হয়? হয় আর কি? তাহা হইলে আর অর্থোপার্জন করিতে যত্ন করি না। তোমাদের সহিত আর কথা কই না। তোমাদের বাড়িতে আর থাকি না। মনে করি, আমার মাকে ভিখারিণী দেখিয়া ইহারা ভিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার এই শরীর, আমার এই অস্থি মাংস সমুদায় ভিক্ষায় গঠিত। ভদ্রসমাজে আর যাই না, ভদ্র-সমাজে আর মুখ তুলিয়া কথা কহি না। দুঃখিনী ভিখারিণীর ছেলে, ভিক্ষায় যাহার দেহ গঠিত, কোন্ মুখে সে আবার ভদ্র-সমাজে দাঁড়াইবে?"

বউদিদি বলিলেন, "ছি খেতু। অমন বলিতে নাই। সম্পর্কে তুমি দেবর বটে, কিন্তু পুত্রের চেয়ে তোমাকে অধিক স্নেহ করি। তুমি উপযুক্ত সন্তান, তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে; তাহার আবার অভিমান কি?"

খেতু বলিলেন, "বউদিদি! মাকে সুখে রাখিব, তোমাদিগকে সুখে রাখিব, চিরকাল আমার এই কামনা। এক্ষণে আমার ক্ষমতা হইয়াছে, এখন যদি তোমরা আমাকে সে কামনা পূর্ণ করিতে না দাও, তাহা হইলে আমার মনে বড় দুঃখ হইবে।"

বউদিদি উত্তর করিলেন, "সার্থক তোমার মা তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছেন। এখন আশীর্বাদ করি, খেতু। শীঘ্রই তোমার একটি রাঙা বউ হউক।"

সেই দিন রামহরির স্ত্রী, রামহরিকে অনেক বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ! আমার সংসারের কষ্ট দেখিয়া খেতু বড় কাতর হইয়াছে। খেতু এখন দু পয়সা আনিতেছে। সে বলে, যখন ইঁহারা আমাকে পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়াছেন, তখন আমিও পুত্রের মত কার্য করিব। সংসার-খরচে খেতু যদি কোনও রূপ সহায়তা করে, তাহা হইলে খেতুকে কিছু বলিও না। এ বিষয়ে খেতুকে কিছু বলিলে, তাহার মনে বড় দুঃখ হয়।"

স্ত্রীর কাছে সকল কথা শুনিয়া, রামহরি খেতুকে ডাকিলেন। খেতু আসিলে রামহরি তাঁহাকে বলিলেন, "রাগ করিয়াছ, দাদা? পৃথিবী অতি ভয়ানক স্থান! আমার মত যখন বয়স হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, টাকা টাকা করিয়া পৃথিবীর লোক কিরূপ পাগল। সেইজন্য, খেতু তোমাকে আমার সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমাদের দুঃখ চিরকাল। আমাদের কখনও 'নাই নাই' ঘুচিবে না। সে দুঃখের ভাগী তোমাকে আমি কেন করিব? অনেকদিন হইতে আমি জলখাবার খাই না। জ্বর হইলে উপবাস দিয়া ভাল করি। তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে কেন এ দুঃখে পড়িতে দিব? এই মনে করিয়া তোমাকে এ সংসারে টাকা খরচ করিতে মানা করিয়াছিলাম। আমি তখন ভাবি নাই, তুমি কিরূপ পিতার পুত্র। খেতু, অধিক আর তোমাকে কি বলিব, এই পৃথিবীতে তিনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তোমাকে আশীর্বাদ করি ভাই, যেন তুমি সেই দেবতুল্য হও।"

রামহরির চক্ষু দিয়া ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়িতে লাগিল। রামহরির চক্ষু পুছিতে লাগিলেন। খেতুরও চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

খেতু তিনটা পাস দিলেন, আর কন্যাভারগ্রস্ত লোকেরা রামহরির নিকট আনা-গোনা করিতে লাগিলেন। সকলের ইচ্ছা খেতুর সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইনি বলেন, "আমি এত সোনা দিব, এত টাকা দিব।" তিনি বলেন, "আমি এত দিব, তত দিব।" এইরূপে সকলে নিলাম ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

রামহরি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, যতদিন না খেতুর লেখাপড়া সমাপ্ত হয়, যতদিন না খেতু দু-পয়সা উপার্জন করিতে পারে ততদিন খেতুর বিবাহ দিবেন না। কিন্তু কন্যাভারগ্রস্ত লোকেরা সে কথা শুনিবেন কেন? রামহরির নিকট তাঁহারা নানারূপ মিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামহরি মনে করিলেন, দূর হউক! একস্থানে কথা দিয়া রাখি। তাহা হইলে সকলে আর আমাকে এরূপ ব্যস্ত করিবে না। এই মনে করিয়া তিনি অনেকগুলি কন্যা দেখিলেন। শেষে জন্মেজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে তিনি মনোনীত করিলেন। জন্মেজয় বাবু সংগতিপন্ন লোক ও সদ্বংশজাত। রামহরি কিন্তু তাঁহাকে সঠিক কথা দিতে পারিলেন না। খেতুর মার মত না লইয়া কি করিয়া তিনি কথা স্থির করেন?

একাদশ পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ

কঙ্কাবতীর যতই বয়স হইতে লাগিল, ততই তাঁহার রূপ বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর রূপে দশদিক্ আলো। কঙ্কাবতীর পানে চাওয়া যায় না। রংটি উজ্জ্বল ধবধবে, ভিতর হইতে যেন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে; জল খাইলে যেন জল দেখা যায়। শরীরটি স্থূলও নয়, কৃশও নয়, যেন পুতুলটি, কি ছবিখানি। মুখখানি যেন বিধাতা কুঁদে কাটিয়াছেন। নাকটি টিকালো-টিকালো, চক্ষু দুটি টানা, চক্ষুর পাতা দীর্ঘ, ঘন ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু কিঞ্চিৎ নীচে করিলে পাতার উপর পাতা পড়িয়া এক অদ্ভুত শোভার আবির্ভাব হয়। এইরূপ চক্ষু দুইটির উপর যেরূপ সরু সরু, কাল কাল, ঘন ভুরুতে মানায়, কঙ্কাবতীর তাহাই ছিল। গাল দুটি নিতান্ত পূর্ণ নহে, কিন্তু হাসিলে টোল পড়ে। তখন সেই হাসিমাখা টোল খাওয়া মুখখানি দেখিলে শত্রুর মনও মুগ্ধ হয়। ঠোঁটদুটি পাতলা। পান খাইতে হয় না, আপনা-আপনি সদাই টুকটুক্ করে। কথা কহিবার সময় ঠোঁটের ভিতর দিয়া, সাদা দুধের মত দুই চারিটি দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন দাঁতগুলি যেন ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীর খুব চুল, ঘোর কাল। ছাড়িয়া দিলে, কোঁকড়া কোঁকড়া হইয়া পিঠের উপর গিয়া পড়ে। সম্মুখের সিঁথিটি কে যেন তুলি দিয়া ঈষৎ সাদা রেখা টানিয়া দিয়াছে। স্থূল কথা, কঙ্কাবতী একটি প্রকৃত সুন্দরী, পথের লোককে চাহিয়া দেখিতে হয়, বার বার দেখিয়াও আশা মিটে না। সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত কঙ্কাবতী যখন দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করেন, তখন যথার্থই যেন বিজলি খেলিয়া বেড়ায়।

এখন কঙ্কাবতীর বয়স হইয়াছে। এখন কঙ্কাবতী সেরূপ আর দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিয়া বেড়ান না। তবে কি জন্য একদিন একটু ছুটিয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন। শ্রমে মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে, গাল দিয়া সেই রক্তিমা আভা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, সমস্ত মুখ টল্ টল্ করিতেছে, জগতে কঙ্কাবতীর রূপ তখন আর ধরে না।

মা তাহা দেখিয়া তনু রায়কে বলিলেন, "তোমার মেয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ, এ সোনার প্রতিমাকে তুমি জলাঞ্জলি দিও না। কঙ্কাবতী স্বয়ং লক্ষ্মী। এমন সুলক্ষণা মেয়ে জনমে কি কখনও দেখিয়াছ? মা যদি এই

অভাগা কুটিরে আসিয়াছেন তো মাকে অনাস্থা করিও না। মা যেরূপ লক্ষ্মী, সেইরূপ নারায়ণ দেখিয়া মার বিবাহ দিও। এবার আমার কথা শুনিও।"

তনু রায় কঙ্কাবতীর পানে একটু চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া চকিত হইলেন। তনু রায়ের মন কখনও এরূপ চকিত হয় নাই। তনু রায় ভাবিলেন, "এ কি? একেই বুঝি লোকে অপত্যস্নেহ বলে?"

স্ত্রীর কথায় তনু রায় কোনও উত্তর করিলেন না।

আর একদিন তনু রায়ের স্ত্রী স্বামীকে বলিলে, "দেখ, কঙ্কাবতীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। আমার একটি কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। ভাল, মনুষ্য-জীবনে তো আমার একটি সাধও পূর্ণ কর।"

তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি তোমার সাধ?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমার সাধ এই যে, ঝি-জামাই লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করি। দুই মেয়ের তুমি বিবাহ দিলে, আমার সাধ পূর্ণ হইল না, দিবারাত্রি ঘোর দুঃখের কারণ হইল। যা হউক, সে যা হইবার তা হইয়াছে; এখন কঙ্কাবতীকে ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দাও। মেয়ে দুইটি বলে যে, "আমাদের কপালে যা ছিল তা হইয়াছে এখন ছোট বোনটিকে সুখী দেখিলে আমরা সুখী হই।"

স্ত্রী বল, পুত্র বল, কন্যা বল, টাকার চেয়ে তনু রায়ের কেহই প্রিয় নয়। তথাপি, কঙ্কাবতীর কথা মনে পড়িলে, তাঁহার মন কিরূপ করে। সে কি মমতা, না আতঙ্ক? দেবীরূপী কঙ্কাবতীকে সহসা বিসর্জন দিতে তাঁহার সাহস হয় না। এদিকে দুরন্ত অর্থলোভও অজেয়। ত্রিভুবন-মোহিনী কন্যাকে বেচিয়া তিনি বিপুল অর্থ লাভ করিবেন, চিরকাল এই আশা করিয়া আছেন। আজ সে আশা কি করিয়া সমূলে কাটিয়া ফেলেন? তনু রায়ের মনে আজ দুই ভাব। এরূপ সংকটে তিনি আর কখনও পড়েন নাই।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তনু রায় বলিলেন, "আচ্ছা, আমি না হয় কঙ্কাবতীর বিবাহ দিয়া টাকা না লইলাম, কিন্তু ঘর হইতে টাকা তো আর দিতে পারিব না? আজ কাল যেরূপ বাজার পড়িয়াছে, টাকা না দিলে সুপাত্র মিলে না। তার কি করিব?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, আমি যদি বিনা টাকায় সুপাত্রের সন্ধান করিয়া দিতে পারি, তুমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে কি না, তা আমাকে বল?"

তনু রায় জিজ্ঞাসা কারলেন, "কোথায়? কে?"

স্ত্রী বলিলেন, "বৃদ্ধ হইলে চক্ষুর দোষ হয়, বুদ্ধিশুদ্ধ লোপ হয়। চক্ষুর উপর দেখিয়াও দেখিতে পাও না?"

তনু রায় বলিলেন, "কে বল না শুনি?

স্ত্রী উত্তর করিলেন, "কেন খেতু?"

তনু রায় বলিলেন, "তা কি কখনও হয়? বিষয় নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই। এরূপ পাত্রে আমি কঙ্কাবতীকে কি করিয়া দিই। ভাল, আমি না হয় কিছু না লইলাম, মেয়েটি যাহাতে সুখে থাকে, দুখানা গহনা-গাঁটি পরিতে পায়, তা তো আমাকে করিতে হইবে?"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "খেতুর কি কখনও ভাল হইবে না? তুমি নিজেই না বল যে, খেতু ছেলেটি ভাল, খেতু দু-পয়সা আনিতে পারিবে? যদি কপালে থাকে তো খেতু হইতেই কঙ্কাবতী কত গহনা পরিবে। কিন্তু গহনা হউক আর না হউক, ছেলেটি ভাল হয়, এই আমার মনের বাসনা। খেতুর মত ছেলে পৃথিবী খুঁজিয়া কোথায় পাইবে বল দেখি? মা কঙ্কাবতী আমার যেমন লক্ষ্মী, খেতু তেমনি দুর্লভ সুপাত্র। এক বোঁটায় দুইটি ফুল সাধ করিয়া বিধাতা যেন গড়িয়াছেন।"

তনু রায় বলিলেন, "ভাল, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে। এখন তাড়াতাড়ি কিছু নাই।"

আরও কিছুদিন গত হইল। কলিকাতা হইতে খেতুর মার নিকট একখানি চিঠি আসিল। সেই চিঠিখানি তিনি তনু রায়কে দিয়া পড়াইলেন। পত্রখানি রামহরি লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই ঃ

"খেতুর বিবাহের জন্য অনেক লোক আমার নিকট আসিতেছেন। আমাকে তাঁহারা বড়ই ব্যস্ত করিয়াছেন। আমার ইচ্ছা যে লেখাপড়া সমাপ্ত হইলে, তাহার পর খেতুর বিবাহ দিই। কিন্তু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ সে কথা শুনিবেন কেন? তাঁহারা বলেন, কথা স্থির হইয়া থাকুক, বিবাহ না হয় পরে হইবে। আমি অনেকগুলি কন্যা দেখিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে জন্মেজয় বাবুর কন্যা আমার মনোনীত হইয়াছে। কন্যাটি সুন্দরী, ধীর ও শান্ত। বংশ সৎ, কোনও দোষ নাই। মাতাপিতা, ভাই-ভগিনী বর্তমান। কন্যার পিতা সংগতিপন্ন লোক। কন্যাকে নানা অলংকার ও জামাতাকে নানা ধন দিয়া বিবাহকার্য সমাধা করিবেন।

এক্ষণে আপনার কি মত জানিতে পারিলে, কন্যার পিতাকে সঠিক কথা দিব।"

পত্রখানি পড়িয়া তনু রায় অবাক্। দুঃখী বলিয়া যে খেতুকে তিনি কন্যা দিতে অস্বীকার, আজ নানা ধন দিয়া সেই খেতুকে জামাতা করিবার নিমিত্ত লোকে আরাধনা করিতেছে।

খেতুর মা রামহরিকে উত্তর লিখিলেন, "আমি স্ত্রীলোক, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন? তুমি যাহা করিবে, তাহাই হইবে। তবে আমার মনে একটি বাসনা ছিল, যখন দেখিতেছি, সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে, তখন সে কথায় আর আবশ্যক নাই।"

এই পত্র পাইয়া, রামহরি খেতুকে সকল কথা বলিলেন, আর এ বিষয়ে খেতুর কি মত, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

খেতু বলিলেন, "দাদা মহাশয়! মার মনের বাসনা কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি। যতদিন মার সাধ পূর্ণ হইবার কিছুমাত্রও আশা থাকিবে, ততদিন কোনও স্থানে আপনি কথা দিবেন না।"

রামহরি বলিলেন, "হাঁ, তাহাই উচিত। তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি এক্ষণে কোনও স্থানে কথা দিব না।"

খেতুর অন্য স্থানে বিবাহ হইবে, এই কথা শুনিয়া কঙ্কাবতীর মা একেবারে শরীর ঢালিয়া দিলেন। স্বামীর নিকট রাত্রি-দিন কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন।

এদিকে তনু রায়ও কিছু চিন্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। দুইটি বিধবা গলায়, পুত্রটি মূর্খ। এখন একটি অভিভাবকের প্রয়োজন। খেতু যেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, খেতু যেরূপ সুবোধ, তাহাতে পরে তাহার নিশ্চয় ভাল হইবে। আমাকে সে একেবারে এখন কিছু না দিতে পারে, না পারুক; পরে, মাসে মাসে আমি তাহার নিকট হইতে কিছু কিছু লইব।"

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন, "তুমি যদি খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ স্থির করিতে পার, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি খরচ-পত্র কিছু করিতে পারিব না।"

এইরূপ অনুমতি পাইয়া তনু রায়ের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ খেতুর মার নিকট দৌড়িয়া যাইলেন, আর খেতুর মার পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

খেতুর মা বলিলেন, "কঙ্কাবতী আমার বউ হইবে, চিরকাল আমার এই সাধ। কিন্তু বোন, দুইদিন আগে যদি বলিতে? অন্য স্থানে কথা স্থির করিতে আমি রামহরিকে চিঠি লিখিয়াছি। রামহরি যাদ কোনও স্থানে কথা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কথা আর নড়িবার নয়। তাই আমার মনে বড় ভয় হইতেছে।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "দিদি! যখন তোমার মত আছে, তখন নিশ্চয় কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হইবে। তুমি একখানি চিঠি লিখিয়া রাখ। চিঠিখানি লোক দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

তাহার পরদিন খেতুর মা ও কঙ্কাবতীর মা দুই জনে মিলিয়া কলিকাতায় লোক পাঠাইলেন। খেতুর মা রামহরিকে একখানি পত্র লিখিলেন।

খেতুর মা লিখিলেন যে, "কঙ্কাবতীর সহিত খেতুর বিবাহ হয়, এই আমার মনের বাসনা। এক্ষণে তনু রায় ও তাঁহার স্ত্রী, সেই জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন। অন্য কোনও স্থানে যদি খেতুর বিবাহের কথা স্থির না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা কঙ্কাবতীর সহিত স্থির করিয়া তনু রায়কে পত্র লিখিবে।

এই চিঠি পাইয়া রামহরি, তাঁহার স্ত্রী ও খেতু, সকলেই আনন্দিত হইলেন।

খেতুর হাতে পত্রখানি দিয়া রামহরি বলিলেন "তোমার মার আজ্ঞা, ইহার উপর আর কথা নাই।

খেতু বলিলেন, "মার যেরূপ অনুমতি, সেইরূপ হইবে। তবে তাড়াতাড়ি কিছুই নাই। তনু কাকা তো মেয়েগুলিকে বড় করিয়া বিবাহ দেন। আর দুই তিন বৎসর তিনি অনায়াসেই রাখিতে পারিবেন। তত দিনে আমার সব পাসগুলিও হইয়া যাইবে। তত দিনে আমিও দু-পয়সা আনিতে শিখিব। আপনি এই মর্মে তনু কাকাকে পত্র লিখুন।"

রামহরি তনু রায়কে সেইরূপ পত্র লিখিলেন। তনু রায় সে কথা স্বীকার করিলেন। বিলম্ব হইল বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র দুঃখ হইল না বরং তিনি আহ্লাদিত হইলেন।

তিনি মনে করিলেন, স্ত্রীর কান্নাকাটিতে আপাততঃ এ কথা স্বীকার করিলাম, দেখি না, খেতুর চেয়ে ভাল পাত্র পাই কি না? যদি পাই।—আচ্ছা, সে কথা তখন পরে বুঝা যাইবে।

খেতুর মা নিরঞ্জনকে সকল কথা বলিয়াছিলেন। নিরঞ্জন মনে করিলেন, বৃদ্ধ হইয়া তনু রায়ের ধর্ম্মে মতি হইতেছে।

কঙ্কাবতী আজ কয়দিন বিরস-বদনে ছিলেন। সকলে আজ কঙ্কাবতীর হাসি-হাসি মুখ দেখিল। সেই দিন তিনি মেনীকে কোলে লইয়া বিরলে বসিয়া কত যে তাহাকে মনের কথা বলিলেন, তাহা আর কি বলিব! মেনী এখন আর শিশু নহে, বড় একটি বিড়াল। সুতরাং কঙ্কাবতী যে তাহাকে মনের কথা বলিবেন, তাহার আর আশ্চর্য কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ষাঁড়েশ্বর

একবার পূজার ছুটির কিছু পূর্বে, কলিকাতার পথে, খেতুর সহিত ষাঁড়েশ্বরের সাক্ষাৎ হইল।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "খেতু, বাড়ি যাইবে কবে? আমি গাড়ি ঠিক করিয়াছি, যদি ইচ্ছা কর তো আমার গাড়িতে তুমি যাইতে পার!"

খেতু উত্তর করিলেন, "আমার এখন কলেজের ছুটি হয় নাই। কবে যাইব, তাহার এখনও ঠিক নাই।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেতু! তোমার হাতে ও কি?"

খেতু উত্তর করিলেন, "এ একটি সিংহাসন। মা প্রতিদিন মাটির শিব গড়িয়া পূজা করেন, তাই মার জন্য একটি পাথরের শিব কিনিয়াছি। সেই শিবের জন্য এই সিংহাসন।"

ষাঁড়েশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবটি তোমার কাছে আছে? কই দেখি?"

খেতু শিবটি পকেট হইতে বাহির করিয়া ষাঁড়েশ্বরের হাতে দিলেন।

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "শিবটি পকেটে রাখিয়াছিলে? খুব ভক্তি তো তোমার?"

খেতু উত্তর করিলেন, "শিবের তো এখনও পূজা হয় নাই। তাতে আর দোষ কি?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "তাই বলিতেছি!"

এই কথা বলিয়া ষাঁড়েশ্বর শিবটি পুনরায় খেতুর হাতে দিলেন।

এ-কথায় সে-কথায় যাইতে যাইতে, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "এই যে, পাদ্রি সাহেবের বাড়ি! পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে তোমার তো আলাপ আছে! এস না? একবার দেখা করিয়া যাই!"

ষাঁড়েশ্বর ও খেতু, দুই জনে পাদ্রি সাহেবের নিকট যাইলেন।

পাদ্রি সাহেবের সহিত নানারূপ কথাবার্তার পর, ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "আর শুনিয়াছেন, মহাশয়? মা পূজা করিবেন বলিয়া খেতু একটি পাথরের শিব কিনিয়াছেন। সেই শিবটি খেতুর পকেটে রহিয়াছে।"

পাদ্রি সাহেব বলিলেন, "অ্যাঁ! সে কি কথা! ছি ছি, খেতু! তুমি এমন কাজ করিবে, তা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমাদের জন্য যে আমরা এত স্কুল করিলাম, সে সব বৃথা হইল। বড় এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, এই বাঙ্গালীজাতি মিথ্যাবাদী, ফেরেবী, জালিয়াত, ভীরু, দাসের জাতি।"

খেতু বলিল, "আহা! কি মধুর ধর্মের কথা আজ শুনিলাম। সর্বশরীর শীতল হইয়া গেল। ইচ্ছা করে, এখনই খ্রীস্টান হই। যদি ঘরে জল থাকে তো নিয়ে আসুন, আর বিলম্ব করেন কেন? আমার মাথায় দিন, দিয়া খ্রীস্টান করুন। বাঙ্গালীদের উপর চারি দিক্ হইতে যেরূপ আপনারা সকলে মিলিয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন, তাতে বাঙ্গালীর মন খ্রীস্টীয় ধর্মামৃতরসে একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। দেখেন কি আর? এই সব পট পট করিয়া খ্রীস্টান হয় আর কি? আবার আমেরিকার কালা-খ্রীস্টানদিগের উপর আপনাদের যেরূপ ভ্রাতৃভাব, তা যখন লোকে শুনিবে, আফ্রিকার নিরস্ত্র কালা-আদমিদিগের প্রতি আপনাদের যেরূপ দয়া-মায়া, তা যখন লোকে জানিবে, তখন এ দেশের জনপ্রাণীও আর বাকী থাকিবে না, সব খ্রীস্টান হইয়া যাইবে। এখন সেলাম।"

এই কথা বলিয়া খেতু সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ষাঁড়েশ্বরও হাসিতে হাসিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন।

পথে খেতু ষাঁড়েশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনতে পাই আপনি প্রতিদিন হরি-সংকীর্তন করেন। তবে পাদ্রি সাহেবের নিকট আমাকে ওরূপ উপহাস করিলেন কেন?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "উপহাস আর তোমাকে কি করিলাম? সে যাহা হউক, সন্ধ্যা হইয়াছে, আমার হরি-সংকীর্তনের সময় হইল। এস না, একটু দেখিবে। দেখিলেও পুণ্য আছে।"

ষাঁড়েশ্বরের বাসা নিকট ছিল। খেতু ও ষাঁড়েশ্বর দুই জনে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। খেতু দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের দালানে হরি-সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ষাঁড়েশ্বর সেখানে না যাইয়া, বরাবর উপরে বৈঠক-খানায় যাইলেন। খেতুকে সেইখানে বসিতে বলিয়া ষাঁড়েশ্বর বাটীর ভিতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর ফিরিয়া আসিলেন ও খেতুকে বলিলেন, "খেতু, চল অন্য ঘরে যাই।"

খেতু অন্য ঘরে গিয়া দেখিলেন যে, ষাঁড়েশ্বরের আর দুইটি বন্ধু সেখানে বসিয়া আছেন। সেখানে খানা খাইবার সব আয়োজন হইতেছে।

নীচে হরি-সংকীর্তন চলিতেছে। ষাঁড়েশ্বর হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের একজন চাঁই।

অল্পক্ষণ পরে খানা খাওয়া আরম্ভ হইল। দুইজন মুসলমান পরিবেশন করিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন, "আপনারা তবে আহারাদি করুন, আমি এখন যাই।"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "না না, একটু থাক না, দেখ না, দেখিলেও পুণ্য আছে। এখন যা আমরা খাইতেছি, ইহা মাংসের ঝোল, ইহার নাম স্যুপ্; একটু স্যুপ্ খাইবে ?"

খেতু বলিলেন, "এ সব দ্রব্য আমি কখনও খাই নাই, আমার প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা আহার করুন।"

আবার কিছুক্ষণ পরে ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "খেতু, এখন যা খাইতেছি, ইহা ভেটকি মাছ। মাছ খাইতে দোষ কি ? একটু খাও না!"

খেতু বলিলেন, "মহাশয়, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। আপনারা আহার করুন। আমি বসিয়া থাকি।"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "তবে না হয়, এই একটু খাও। ইহা অতি উত্তম ব্র্যাণ্ডি। পাদ্রি সাহেবের কথায় মনে তোমার ক্লেশ হইয়া থাকিবে, একটু খাইলেই এখনই সব ভাল হইয়া যাইবে।"

খেতু বলিলেন, "মহাশয়, জোড়হাত করিয়া বলি, আমাকে অনুরোধ করিবেন না। অনুমতি করুন আমি বাড়ি যাই।"

ষাঁড়েশ্বরের একটি বন্ধু বলিলেন, "তবে না হয় একটু হ্যাম আর মুরগী খাও। এ হ্যাম বিলাতী শূকরের মাংস। ইহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। অভক্ষ্য, গ্রাম্য শূকর। বিলাতী শূকর খাইতে কোনও দোষ নাই। আর এ মুরগীও মহা-কুক্কুট ; রামপাখিবিশেষ। হগ্সাহেবের বাজার হইতে কেনা, যে সে মুরগী নয়।"

ষাঁড়েশ্বরের অপর বন্ধু বলিলেন, "এইবার ভি—র কটলেট আসিয়াছে। খেতু বাবু নিশ্চই এইবার একটু খাইবেন।"

খানসামা এবার কি দ্রব্য আনিয়াছিল, সে কথা আর শুনিয়া কাজ নাই। নীচে হরি-সংকীর্তনের ধূম। তাহাই শ্রবণ করিয়া সকলে প্রাণ পরিতৃপ্ত করুন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই বন্ধুতে চুপি চুপি কি পরামর্শ করিলেন। তখন এক বন্ধু উঠিয়া গিয়া খেতুকে ধরিলেন, অপর জন খেতুর মুখে ব্র্যাণ্ডি ঢালিয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। ষাঁড়েশ্বর বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খেতুর শরীরে বিলক্ষণ বল ছিল। এক এক ধাক্কায় দুই জনকেই ভূতলশায়ী করিলেন। তাহার পর মেজটি উল্টাইয়া ফেলিলেন। কাচের বাসন, কাচের গেলাস, সম্মুখে যাহা কিছু পাইলেন, আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ দক্ষযজ্ঞ করিয়া সেখান হইতে খেতু প্রস্থান করিলেন।

ত্র য়ো দ শ প রি চ্ছে দ

বি ড় ম্ব না

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর এক্ষণে কুড়ি বৎসর বয়স। যা কিছু পাস ছিল, খেতু সব পাসগুলি দিলেন। বাহিরেরও দুই একটি পাস দিলেন। শীঘ্র একটি উচ্চপদ পাইবেন, খেতু এরূপ আশা পাইলেন।

রামহরি ও রামহরির স্ত্রী ভাবিলেন যে, এক্ষণে খেতুর বিবাহ দিতে হইবে। দিন স্থির করিবার নিমিত্ত তাঁহারা খেতুর মাকে পত্র লিখিলেন।

পত্রের প্রত্যুত্তরে খেতুর মা অন্যান্য কথা বলিয়া অবশেষে লিখিলেন, "তনু রায়কে বিবাহের কথা কিছু বলিতে পারি নাই। আজকাল সে বড়ই ব্যস্ত, তাহার দেখা পাওয়া ভার। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে। মহাসমারোহে শ্রাদ্ধ হইবে, এই কার্যে তনু রায় একজন কর্তা হইয়াছেন। জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রীর ধন্য কপাল! পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র চারিদিকে জাজ্বল্যমান রাখিয়া, অশীতপর স্বামীর কোলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার চেয়ে স্ত্রীলোকের পুণ্যবল আর কি হইতে পারে? যখন তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যায়, তখন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলে এক মাথা সিন্দুর দিয়া দিয়াছে, আর ভাল একখানি কস্তাপেড়ে কাপড় পরাইয়া দিয়াছে। আহা! তখন কি শোভা হইয়াছিল। যাহা হউক, তনু রায়ের একটু অবসর হইলে, আমি তাহাকে বিবাহের কথা বলিব।"

কিছুদিন পরে খেতুর মা, রামহরিকে আর একখানি পত্র লিখিলেন। তাহার মর্ম্ম এই:

বড় ভয়ানক কথা শুনিতেছি। তনু রায়ের কথার ঠিক নাই। তাহার দয়ামায়া নাই, তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই। শুনিতেছি, সে নাকি জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবে। কি ভয়ানক কথা! আর জনার্দন চৌধুরীও পাগল হইয়াছে না কি? পুত্র পৌত্র দৌহিত্র চারিদিকে বর্তমান। বয়সের গাছ পাথর নাই। চলিতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপে। ঘাটের মড়া, তার আবার এ কুবুদ্ধি কেন? বিষয় থাকিলে, টাকা থাকিলে, এরূপ করিতে হয় নাকি? তিনি বড় মানুষ, জমিদার, না হয় রাজা, তা বলিয়া কি একেবারে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়? বৃদ্ধ মনে ভাবে না যে, মৃত্যু সন্নিকট? যেরূপ

তাহার অবস্থা, তাহাতে আর কয় দিন? লাঠি না ধরিয়া একটি পা চলিতে পারে না। কি ভয়ানক কথা, আর তনু রায় কি নিকষা, দুধের বাছা কঙ্কাবতীকে কি করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিবে? কঙ্কাবতীর কপালে কি শেষে এই ছিল? কঙ্কাবতীর সেই মধুমাখা মুখখানি মনে করিলে, বুক ফাটিয়া যায়। শুনিতে পাই কঙ্কাবতীর মা নাকি রাত্রি-দিন কাঁদিতেছেন, আমি ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু আসেন নাই। বলিয়া পাঠাইলেন যে, দিদির কাছে আর মুখ দেখাইব না, এ কালো মুখ লোকের কাছে আর বাহির করিব না। এই বিবাহের কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আহা! তাঁহার মার প্রাণ, কতই না তিনি কাতর হইয়া থাকিবেন?

এই চিঠিখানি পাইয়া রামহরি খেতুকে দেখাইলেন।

খেতু বলিলেন, "দাদা মহাশয়, আমি এক্ষণে দেশে যাইব।"

রামহরি বলিলেন, "জনার্দন চৌধুরী বড়লোক, তুমি সহায়হীন বালক, তুমি দেশে গিয়া কি করিবে?"

খেতু বলিলেন, "আমি কিছু করিতে পারিব না সত্য, তথাপি নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কঙ্কাবতীকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করাও কর্তব্য। কৃতকার্য না হই, কি করিব?"

খেতু দেশে আসিলেন। মার নিকট ও পাড়াপ্রতিবেশীর নিকট সকল কথা শুনিলেন। শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী প্রথমে কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। কেবল তাঁহার সভাপণ্ডিত গোবর্ধন শিরোমণি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সম্মত করিয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলে কি হয়? জনার্দন চৌধুরীর শ্রী-ছাঁদ আছে, প্রাণে শখও আছে। দুর্লভ পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মাল্য দ্বারা গলদেশ তাঁহার সর্বদাই সুশোভিত থাকে। কফের ধাতু বলিয়া শৈত্য নিবারণের জন্য চূড়াদার টুপি মস্তকে তাঁহার দিন-রাত্রি বিরাজ করে। এইরূপ বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিভৃতে বসিয়া যখন তিনি গোবর্ধন শিরোমণির সহিত বিবাহ-বিষয়ে পরামর্শ করেন, তখন তাঁহার রূপ দেখিয়া ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণকেও লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়।

খেতু শুনিলেন যে, জনার্দন চৌধুরী বিবাহ করিবার জন্য এখন একেবারে পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। আর বিলম্ব সহে না। এই বৈশাখ মাসের ২৪শে তারিখে বিবাহ হইবে। জনার্দন চৌধুরী এক্ষণে দিন গণিতেছেন। তাঁহার

পুত্র-কন্যা সকলের ইচ্ছা, যাহাতে এ বিবাহ না হয়। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে সাহস করেন না। তাঁহার বড় কন্যা একদিন মুখ ফুটিয়া মানা করিয়াছিলেন। সেই অবধি বড় কন্যার সহিত তাঁহার আর কথা-বার্তা নাই।

জনার্দন চৌধুরীকে কন্যা দিতে তনু রায়ও প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন জনার্দন চৌধুরী বলিলেন যে, "আমার নববিবাহিতা স্ত্রীকে আমি দশ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ দিব, একখানি তালুক দিব, স্ত্রীর গা সোনা দিয়া মুড়িব, আর কন্যার পিতাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিব," তখন তনু রায় আর লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া তবুও তনু রায় ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র টাকার কথা শুনিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। বকিয়া ঝকিয়া পিতাকে তিনি সম্মত করাইলেন। টাকার লোভে এক্ষণে পিতাপুত্র দুইজনেই উন্মত্ত হইয়াছেন।

তবুও তনু রায় স্ত্রীর নিকট নিজে এ কথা বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার পুত্র বলিলেন, "তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি গিয়া মাকে বলিতেছি।"

এই কথা বলিয়া পুত্র মার নিকট যাইলেন। মাকে বলিলেন, "মা, জনার্দন চৌধুরীর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। বাবা সব স্থির করিয়া আসিয়াছেন।"

মার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। মা বলিলেন, "সে কি রে? ওরে, সে কি কথা! ওরে, জনার্দন চৌধুরী যে তেকেলে বুড়ো। তার যে বয়সের গাছপাথর নাই, তার সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিবাহ হবে কি রে?"

পুত্র উত্তর করিলেন, "বুড়ো নয় তো কি যুবো? না সে খোকা? জনার্দন চৌধুরী তুলো করিয়া দুধ খায় না কি? না ঝুমঝুমি নিয়ে খেলা করে? মা যেন ঠিক পাগল, মার বুদ্ধি-শুদ্ধি একেবারে নাই। কঙ্কাবতীকে দশ হাজার টাকা দিবে, গায়ে যেখানে যা ধরে গহনা দিবে, তালুক-মুলুক দিবে, বাবাকে দুই হাজার টাকা নগদ দিবে, আবার চাই কি? বুড়ো মরিয়া যাইলে কঙ্কাবতীর টাকা গহনা সব আমাদের হইবে। থুড়থুড়ে বুড়ো বলিয়াই তো আহ্লাদের কথা। শক্তি-সামর্থ্য থাকিলে এখন কতদিন বাঁচিত, তার ঠিক কি? মা, তোমার কিছুমাত্র বিবেচনা নাই।"

এ কথার উপর আর কথা নাই। মা একেবারে বসিয়া পড়িলেন।

অবিরল ধারায় তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মনে করিলেন যে, হে পৃথিবী তুমি দুইফাঁক হও, তোমার ভিতর আমি প্রবেশ করি। মেয়ে দুইটি অনেক কাঁদিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কঙ্কাবতী নীরব। প্রাণ যাহার ধু ধু করিয়া পুড়িতেছে, চক্ষে তাহার জল কোথা হইতে আসিবে?

মা ও প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে খেতু এই সকল কথা শুনিলেন।

খেতু প্রথম তনু রায়ের নিকট যাইলেন। তনু রায়কে অনেক বুঝাইলেন। খেতু বলিলেন, "মহাশয়, এরূপ অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন না। আমার সহিত বিবাহ না হয় না দিবেন, কিন্তু একটি সুপাত্রের হাতে দিন। মহাশয়, যদি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারেন, আমি করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়া তনু রায় ও তনু রায়ের পুত্র খেতুর উপর অতিশয় রাগান্বিত হইলেন। নানারূপ ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া খেতু তাহার পর জনার্দন চৌধুরীর নিকট গমন করিলেন। হাত জোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে জনার্দন চৌধুরীকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন। প্রথমতঃ জনার্দন সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর খেতু যখন তাঁহাকে দুই একবার বৃদ্ধ বলিলেন, তখন রাগে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার শ্লেষ্মার ধাত, রাগে এমনি তাঁহার ভয়ানক কাসি আসিয়া উপস্থিত হইল যে, সকলে বোধ করিল, দম আট্‌কাইয়া তিনি বা মরিয়া যান!

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন, "গলাধাক্কা দিয়া এ ছোঁড়াকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দাও।"

অনুমতি পাইয়া পারিষদগণ খেতুকে গলাধাক্কা দিতে আসিল।

খেতু জনার্দন চৌধুরীর লাঠিগাছি তুলিয়া লইলেন। পারিষদবর্গকে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "তোমরা কেহ আমার গায়ে হাত দিও না। যদি আমার গায়ে হাত দাও, তাহা হইলে এই দণ্ডে তোমাদের মুণ্ডপাত করিব।"

খেতুর তখন সেই রুদ্রমূর্তি দেখিয়া, ভয়ে সকলেই আকুল হইল। গলাধাক্কা দিতে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

নিরঞ্জন উঠিয়া, উভয় পক্ষকে সান্ত্বনা করিয়া খেতুকে সেখান হইতে বিদায় করিলেন।

খেতু চলিয়া গেলেন। তবুও জনার্দন চৌধুরীর রাগও থামে না, কাসিও থামে না। রাগে থর থর করিয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল, খক্ খক্ করিয়া ঘন ঘন কাসি আসিতে লাগিল।

কাসিতে কাসিতে তিনি বলিলেন, "ছোঁড়ার কি আস্পর্দ্ধা! আমাকে কি না বুড়ো বলে!"

গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন, "না না! আপনি বৃদ্ধ কেন হইবেন? আপনাকে যে বুড়ো বলে, সে নিজে বুড়ো।"

ষাঁড়েশ্বর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "হয় তো ছোকরা মদ খাইয়া আসিয়াছিল! চক্ষু দুইটা যেন জবা-ফুলের মত, দেখিতে পান নাই?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ও কথা বলিও না। যারা মদ খায়, তারা খায়। কে মদ-মুরগী খায়, তা সকলেই জানে। পরের নামে মিথ্যা অপবাদ দিও না।"

ষাঁড়েশ্বর উত্তর করিলেন, "সকলে শুনিয়া থাকুন, ইনি বলিলেন, যে, আমি মদ-মুরগী খাই। আমি ইঁহার নামে মানহানির মকদ্দমা করিব। এঁর হাড় কয়খানা জেলে পচাইব।"

গোবর্দ্ধন শিরোমণি বলিলেন, "ক্ষেত্রচন্দ্র মদ খান, কি না খান, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি যে যবনের জল খান, তাহা আমি জানি। সেই যারে বলে 'বরখ', সাহেবেরা কলে যাহা প্রস্তুত করেন, ক্ষেত্রচন্দ্র সেই বরখ খান। গদাধর ঘোষ ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "কি কি? কি বলিলে?"

ষাঁড়েশ্বর বলিলেন, "সর্বনাশ, বরফ খায়? গোরক্ত দিয়া সাহেবেরা যাহা প্রস্তুত করেন? এবার দেখিতেছি, সকলের ধর্মটি একেবারে লোপ হইল। হায় হায়! পৃথিবীতে হিন্দুধর্ম একেবারে লোপ হইল।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ষাঁড়েশ্বর বাবু, একবার মনে করিয়া দেখ, খেতুর বাপ তোমার কত উপকার করিয়াছেন। খেতুর অপকার করিতে চেষ্টা করিও না।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "ও সব বাজে কথা এখন রাখ। গদাধর ঘোষকে ডাকিতে পাঠাও।"

গদাধর ঘোষকে ডাকিতে লোক দৌড়িল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

গদাধর-সংবাদ

গদাধর ঘোষ আসিয়া উপস্থিত হইল। চৌধুরী মহাশয়কে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া অতি দূরে সে মাটিতে বসিল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন, "কেমন হে গদাধর! এ কি কথা শুনিতে পাই? শিবচন্দ্রের ছেলেটা, ওই খেতা, কি খাইয়াছিল? তুমি কি দেখিয়াছিলে? কি শুনিয়াছিলে? তাহার সহিত তোমার কি কথাবার্তা হইয়াছিল? সমুদয় বল; কোনও বিষয় গোপন করিও না।"

গদাধর বলিল, "মহাশয়! আমি মূর্খ মানুষ। অত শত জানি না। যাহা হইয়াছিল, তাহা আমি বলিতেছি।"

গদাধর বলিল, "আর বৎসর আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কোথায় থাকি? তাই রামহরির বাসায় গিয়াছিলাম। সন্ধ্যাবেলা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময়ে এক মিনষে হাঁড়ি মাথায় করিয়া পথ দিয়া কি শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল। সেই শব্দ শুনিয়া রামহরি বাবুর ছেলেটি বাড়ির ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, আর খেতুকে বলিল, কাকা কাকা! কুলকি যাইতেছে, আমাকে কিনিয়া দাও। খেতু তাহাকে দুই পয়সার কিনিয়া দিলেন। তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গদাধর, তুমি একটা কুলকি খাইবে? আমি বলিলাম, না দাদাঠাকুর, আমি কুলকি খাই না। রামহরি বাবুর ছেলে খেতুকে বলিল, কাকা, তুমি খাইবে না? খেতু বলিলেন, না, আমার পিপাসা পাইয়াছে, ইহাতে পিপাসা ভাঙে না, আমি কাঁচা বরখ খাইব। এই কথা বলিয়া খেতু বাহিরে যাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সাদা ধব্‌ধবে কাঁচের মত ঢিল গামছায় বাঁধিয়া বাটী আনিলেন। সেই ঢিলটি ভাঙিয়া জলে দিলেন, সেই জল খাইতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম দাদাঠাকুর, ও কি? খেতু বলিলেন, ইহার নাম বরখ। এই গ্রীষ্মকালের দিনে যখন বড় পিপাসা হয়, তখন ইহা জলে দিলে জল শীতল হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দাদাঠাকুর, সকল কাচ কি জলে দিলে জল শীতল হয়? খেতু উত্তর করিলেন, এ কাচ নয়, এ বরখ। জল জমিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা জল। নদীতে যে জল দেখিতে পাও, ইহাও তাই, জমিয়া গিয়াছে এইমাত্র। আকাশ হইতে যে শিলা পড়ে, বরখ তাহাই। সাহেবেরা বরখ

কলে প্রস্তুত করেন। একটু হাতে করিয়া দেখ দেখি? এই বলিয়া আমার হাতে একটুখানি দিলেন। হাতে রাখিতে না রাখিতে আমার হাত যেন করাতে দিয়া কাটিতে লাগিল। আমি হাতে রাখিতে পরিলাম না, আমি ফেলিয়া দিলাম। তাহার পর খেতু বলিলেন, গদাধর, একটু খাইয়া দেখ না? ইহাতে কোনও দোষ নাই। আমি বলিলাম, না দাদাঠাকুর, তোমরা ইংরাজী পড়িয়াছ, তোমাদের সব খাইতে আছে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। আমি ইংরাজী পড়ি নাই। সাহেবেরা যে দ্রব্য কলে প্রস্তুত করেন, সে দ্রব্য খাইলে আমাদের অধর্ম হয়, আমাদের জাতি যায়।

চৌধুরী মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল, "ধর্মাবতার, আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা আপনাকে বলিলাম। তারপর খেতু আমাকে অনেক সেকালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক সেকালের কথা-বার্তা হইল, সে বিষয়ে এখানে আর বলিবার আবশ্যক নাই।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "না না, কি কথা হইয়াছিল, তুমি সমুদয় বল। কোনও কথা গোপন করিবে না।"

গোবর্ধন শিরোমণিকে সম্বোধন করিয়া গদাধর বলিল, "শিরোমণি মহাশয়, সেই গরদওআলা ব্রাহ্মণের কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন, "সে বাজে কথা। সে কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "না না, খেতার সহিত তোমার কি কথা হইয়াছিল, আমি সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা করি। গরদওআলা ব্রাহ্মণের কথা আমি অল্প অল্প শুনিয়াছিলাম, গ্রামের সকলেই সে কথা জানে। তবে খেতা তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল, আর তুমি কি বলিলে, সে কথা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

গদাধর বলিতেছে, "তাহার পর খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গদাধর, আমাদের মাঠে সেকালে না কি মানুষ মারা হইত? আর তুমি না কি সেই কাজের একজন সর্দার ছিলে? আমি উত্তর করিলাম, দাদাঠাকুর, উচক্কা বয়সে কোথায় কি করিয়াছি, কি না করিয়াছি, সে কথায় এখন আর কাজ কি? এখন তো আর সে সব নাই? এখন কোম্পানির কড়া হুকুম। খেতু বলিলেন, তা বটে; তবে সে কালের ঠেঙাড়েদের কথা আমার শুনিতে ইচ্ছা হয়। তুমি নিজে হাতে এ সব করিয়াছ, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা

করিতেছি। তোমরা দুই চারি জন যা বৃদ্ধ আছ, মরিয়া গেলে, আর এ সব কথা শুনিতে পাইব না। আর দেখ গ্রামের সকলেই তো জানে যে, তুমি এ কাজের এক জন সর্দার ছিলে! আমি বলিলাম, না দাদাঠাকুর, আপনারা থাকিতে আমরা কি কোনও কাজের সর্দার হইতে পারি? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমাদের দেবতা! সকল কাজের সর্দার আপনারা। তাহার পর খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তোমাদের দলের সর্দার কে ছিলেন? আমি বলিলাম, আজ্ঞা! আমাদের দলের সর্দার ছিলেন কমল ভট্টাচার্য মহাশয়। একসঙ্গে কাজ করিতাম বলিয়া তাঁহাকে আমরা কমল কমল বলিয়া ডাকিতাম। তিনি এক্ষণে মরিয়া গিয়াছেন। খেতু তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, গদাধর, তোমরা কখনও ব্রাহ্মণ মারিয়াছ? আমি বলিলাম, আজ্ঞা, মাঠের মাঝখানে যারে পাইতাম, তাহাকেই মারিতাম। তাহাতে কোনও দোষ নাই। পরিচয় লইয়া মাথায় লাঠি মারিতে গেলে আর কাজ চলে না। পথিকের কাছে কি আছে না আছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও মারিতে গেলে চলে না। প্রথমে মারিয়া ফেলিতে হইত। তাহার পর গলায় পইতা থাকিলে জানিতে পারিতাম যে, সে লোকটি ব্রাহ্মণ, না থাকিলে বুঝিতাম যে সে শূদ্র। আর প্রাপ্তির বিষয় যে দিন যেরূপ অদৃষ্টে থাকিত, সে দিন সেইরূপ হইত। কত হতভাগা পথিককে মারিয়া শেষে একটি পয়সাও পাই নাই। ট্যাকে, কাচায়, কোঁচায় খুঁজিয়া একটি পয়সাও বাহির হয় নাই। সে বেটারা জুয়াচোর, দুষ্ট, বজ্জাত! পথ চলিবে বাপু, টাকা-কড়ি সঙ্গে নিয়ে চল। তা না শুধু হাতে! বেটাদের কি অন্যায় বলুন দেখি, দাদাঠাকুর? একটি মানুষ মারিতে কি কম পরিশ্রম হয়? খালি হাতে রাস্তা চলিয়া আমাদের সব পরিশ্রম বেটারা নষ্ট করিত। খেতু আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গদাধর, মানুষের প্রাণ কি সহজে বাহির হয় না? আমি বলিলাম, সকলের প্রাণ সমান নয়। কেহ বা লাঠি খাইতে না খাইতে উদ্দেশে মরিয়া যায়। কেহ বা ঠুশ করিয়া এক ঘা খাইয়াই মরিয়া যায়। আর কাহাকেও তিন চারিজনে পড়িয়া পঞ্চাশ লাঠিতেও মারিতে পারা যায় না। একবার একজন ব্রাহ্মণকে মারিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছিল?

গোবর্দ্ধন শিরোমণির পানে চাহিয়া গদাধর বলিল, "শিরোমণি মহাশয়! সেই কথা গো!"

শিরোমণি বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়! আপনার আর ও সব পাপ কথা শুনিয়া কাজ নাই। এক্ষণে ক্ষেত্রচন্দ্রকে লইয়া কি করা যায়, আসুন, তাহার বিচার করি। সাহেবের জল পান করিয়া অবশ্যই তিনি সাহেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "না না! খেতার সহিত গদাধরের কি কি কথা হইয়াছিল, আমি সমস্ত শুনিতে চাই। ছোঁড়া যে গদাধরকে এত কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অবশ্যই কোনও না কোনও দুরভিসন্ধি থাকিবে। গদাধর, তাহার পর কি হইল বল।"

গদাধর পুনরায় বলিতেছে, "খেতু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ব্রাহ্মণ মারিতে কষ্ট হইয়াছিল কেন? আমি বলিলাম, দাদাঠাকুর, কোথা হইতে একবার তিনজন ব্রাহ্মণ আমাদের গ্রামে গরদের কাপড় বেচিতে আসেন। গ্রামে তাঁহারা থাকিবার স্থান পাইতেছিলেন না। বাসার অন্বেষণে পথে পথে ফিরিতেছিলেন। আমার সঙ্গে পথে দেখা হইল। একটি পাতা হাতে করিয়া আমি তখন ব্রাহ্মণের পদধূলি আনিতে যাইতেছিলাম। প্রত্যহ ব্রাহ্মণের পদধূলি না খাইয়া আমি কখনও জলগ্রহণ করি না। ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমি সেই পাতায় তাঁহাদের পদধূলি লইলাম, আর বলিলাম, আসুন আমার বাড়িতে, আপনাদিগকে বাসা দিব। তাঁহারা আমার বাড়িতে বাসা লইলেন। আমাদের গ্রামে তিনদিন রহিলেন, আনকগুলি কাপড় বেচিলেন, অনেক টাকা পাইলেন। আমি সেই সন্ধান কমলকে দিলাম। কমলেতে আমাতে পরামর্শ করিলাম যে, তিনটিকে সাবাড় করিতে হইবে। দলস্থ অন্য কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কারণ, তাহা হইলে ভাগ দিতে হইবে। কমলকে বলিলাম, তুমি আগে গিয়া মাঠের মাঝখানে লুকাইয়া থাক। অতি প্রত্যুষে ইঁহাদিগকে আমি সঙ্গে লইয়া যাইব। দুই জনেই সেইখানে কার্য সমাধা করিব। তাহার পরদিন প্রত্যুষে আমি সেই তিনজন ব্রাহ্মণকে পথ দেখাইবার জন্য লইয়া চলিলাম। ভগবানের এমনি কৃপা যে, সে দিন ঘোর কোয়াশা হইয়াছিল, কোলের মানুষ দেখা যায় না। নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র কমল বাহির হইয়া একজনের মাথায় লাঠি মারিলেন। আমিও সেই সময় আর এক জনের মাথায় লাঠি মারিলাম। তাঁরা দুইজনেই পড়িয়া গেলেন। আমরা সেই দুই জনকে শেষ করিতেছি, এমন সময় তৃতীয় ব্রাহ্মণটি পালাইলেন। কমল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন, আমিও আমার কাজটি সমাধা করিয়া

তাঁহাদিগের পশ্চাৎ দৌড়িলাম। ব্রাহ্মণ গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শিরোমণি মহাশয়ের বাটীতে গিয়া, ব্রহ্মহত্যা হয়, ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষা করুন, এই বলিয়া আশ্রয় লইলেন। অতি স্নেহের সহিত শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে কোলে করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে মধুর বচনে বলিলেন, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, পদ্মপত্রের উপর জলের ন্যায়। সে জীবনের জন্য এত কাতর কেন বাপু? এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে পাঁজা করিয়া বাটীর বাহিরে দিয়া শিরোমণি মহাশয় ঝনাৎ করিয়া বাটীর দ্বারটি বন্ধ করিয়া দিলেন। কমল পুনরায় ব্রাহ্মণকে মাঠের দিকে তাড়াইয়া চলিলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, আর রক্ষা নাই, কমল তাঁহাকে ধরধর হইয়াছেন, তখন তিনি হঠাৎ ফিরিয়া কমলকে ধরিলেন। কিছুক্ষণের নিমিত্ত দুইজনে হুটাহুটি হইল। হাতীর মত কমলের শরীরে বল, কমলকে তিনি পারিবেন কেন? কমল তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন, তাঁহার বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার নাভিকুণ্ডলে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি বসাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ-দেবতার এমনি কঠিন প্রাণ যে, তিনি অজ্ঞান হন না, মরেনও না। ক্রমাগত কেবল এই চিৎকার করিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর! হে মধুসূদন, আমাকে রক্ষা কর! বাপ সকল, ব্রহ্মহত্যা হয়। কে কোথা আছ, আসিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর! আমি পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। কোন্ দিকে ব্রাহ্মণ পলাইয়াছেন, আর কমল বা কোন্ দিকে গিয়াছেন, কোয়াশার জন্য তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। এখন ব্রাহ্মণের চিৎকার শুনিয়া আমি সেই দিকে দৌড়িলাম। গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছেন, কমল তাঁহার বুকের উপরে। কমল আপনার দুই হাত দিয়া ব্রাহ্মণের দুই হাত ধরিয়া মাটিতে চাপিয়া রাখিয়াছেন, কমলের বাম পা মাটিতে রহিয়াছে, দক্ষিণ পা ব্রাহ্মণের উদরে, এই পায়ের বুড়ো আঙ্গুল ঘোরতর বলের সহিত ব্রাহ্মণের নাভির ভিতর প্রবেশ করাইতেছেন। পড়িয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণ চিৎকার করিতেছেন। কমল আমাকে বলিলেন, এ বামুন বেটা কি বজ্জাত! বেটা যে মরে না হে! গদাধর, শীঘ্র একটা যা হয় কর। তা না হইলে বেটার চিৎকারে লোক আসিয়া পড়িবে। আমার হাতে তখন লাঠি ছিল না নিকটে একখানা পাথর পড়িয়াছিল। সেই পাথরখানি লইয়া আমি ব্রাহ্মণের মাথাটি ছেঁচিয়া দিলাম। তবে ব্রাহ্মণের প্রাণ বাহির হইল, যাহা হউক, এই ব্রাহ্মণকে মারিতে

পরিশ্রম হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেবার লাভও বিলক্ষণ হইয়াছিল। অনেকগুলি টাকা আর অনেক গরদের কাপড় আমরা পাইয়াছিলাম। কি করিয়া নশিরাম সর্দার এই কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। নশিরাম ভাগ চাহিলেন। আমরা বলিলাম, এ কাজে তোমাকে কিছু করিতে হয় নাই, তোমাকে আমরা ভাগ দিব কেন? কথায় কথায় কমলের সহিত নশিরামের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল; ক্রমে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। কমল পইতা ছিঁড়িয়া নশিরামকে শাপ দিলেন। কমল ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। সাক্ষাৎ অগ্নিস্বরূপ! শিষ্য যজমান আছে। সেরূপ ব্রাহ্মণের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাঁচ-সাত বৎসরের মধ্যেই মুখে রক্ত উঠিয়া নশিরাম মরিয়া গেল। যাহা হউক, সেই সব কাপড় হইতে একজোড়া ভাল গরদের কাপড় আমরা শিরোমণি মহাশয়কে দিয়াছিলাম। যখন সেই গরদের কাপড়খানি পরিয়া, দোবজাটি কাঁধে ফেলিয়া, ফোঁটাটি কাটিয়া শিরোমণি মহাশয় পথে যাইতেন, তখন সকলে বলিত, আহা! যেন কন্দর্প পুরুষ বাহির হইয়াছেন। বয়সকালে শিরোমণি মহাশয়ের রূপ দেখে কে? না, শিরোমণি মহাশয়?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন, "গদাধর, গদাধর, তোমার এরূপ বাক্য বলা উচিত নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, তাহার আমি কিছুই জানি না। পীড়া-শীড়ায় তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে, আমি তোমার জন্য নারায়ণকে তুলসী দিব। তাহা হইলে তোমার পাপক্ষয় হইবে।"

নিরঞ্জন এই সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন, মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, "হা মধুসূদন! হা দীনবন্ধু!"

জনার্দন চৌধুরী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর কি হইল গদাধর?"

গদাধর উত্তর করিল, "তাহার পর আর কিছু হয় নাই! খেতু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কভাবে আমাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, একটু বরফ খাবে গদাধর?" আমি বলিলাম, "না দাদাঠাকুর, আমি বরফ খাইব না, বরফ খাইলে আমার অধর্ম হইবে, আমার জাতি যাইবে।"

জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "তবে তুমি নিশ্চয় বলিতেছ যে খেতু বরফ খাইয়াছে?"

গদাধর উত্তর করিল, "আজ্ঞা হাঁ, ধর্মাবতার! আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আপনি ব্রাহ্মণ। আপনার পায়ে হাত দিয়া আমি দিব্য করিতে পারি।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিকার

গদাধরের মুখে সকল কথা শুনিয়া, জনার্দন চৌধুরী তখন তনু রায় প্রভৃতি গ্রামের ভদ্রলোকদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলে জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, "আজ আমি ঘোর সর্বনাশের কথা শুনিলাম। জাতি-কুল, ধর্ম-কর্ম সব লোপ হইতে বসিল। পিতা পিতামহ-দিগকে যে এক গণ্ডুষ জল দিব, তাহারও উপায় রহিল না। ঘোর কলি উপস্থিত।"

সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মহাশয়?"

জনার্দন চৌধুরী উত্তর করিলেন, "শিবচন্দ্রের পুত্র ওই যে খেতা, কলিকাতায় রামহরির বাসায় থাকিয়া ইংরাজী পড়ে, সে বরফ খায়। বরফ সাহেবেরা প্রস্তুত করেন, সাহেবের জল। শিরোমণি মহাশয় বিধান দিয়াছেন যে, বরফ খাইলে সাহেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সাহেবত্ব-প্রাপ্ত লোকের সহিত সংস্রব থাকিলে সেও সাহেব হইয়া যায়। তাই, এই খেতার সহিত সংস্রব রাখিয়া সকলেই আমরা সাহেব হইতে বসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া দেশ সুদ্ধ লোক একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সর্বনাশ! বরফ খায়? যাঃ! এইবার ধর্ম-কর্ম সব গেল।

সব্বের চেয়ে ভাবনা হইল ষাঁড়েশ্বরের। ডাক ছাড়িয়া তিনি কাঁদেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ধর্মগত প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। কত যে তিনি হায় হায় করিলেন, তাহার কথা আর কি বলিব?

যাহা হউক, সর্ববাদিসম্মত হইয়া খেতুকে একঘরে করা স্থির হইল।

নিরঞ্জন কেবল ওই কথায় সায় দিলেন না। নিরঞ্জন বলিলেন, "আমি থাকিতে খেতুকে কেহ একঘরে করিতে পারিবে না। আমরা না হয় দু-ঘরে হইয়া থাকিব।"

নিরঞ্জন আরও বলিলেন, "চৌধুরী মহাশয়! আজ প্রাতঃকাল হইতে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে, ঘোর কলি উপস্থিত। নিদারুণ নরহত্যা ব্রহ্মহত্যার কথা শুনিলাম। চৌধুরী মহাশয়, আপনি প্রাচীন, বিজ্ঞ, লক্ষ্মীর বরপুত্র; বিধাতা আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন। এ কুচক্র

আপনাকে শোভা পায় না; লোককে জাতিচ্যুত করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, পতিতকে উদ্ধার করাই মানুষের কার্য। বিষ্ণু ভগবান্ পতিতকে উদ্ধার করেন বলিয়াই তাঁহার নাম পতিত-পাবন হইয়াছে। পৃথিবীতে সজ্জনকুল সেই পতিত-পাবনের প্রতিরূপ। এই ষাঁড়েশ্বরের মত সুরাপানে আর অভক্ষ্য-ভক্ষণে যাহারা উন্মত্ত, এই তনু রায়ের মত যাহাদিগের অপত্য-বিক্রয়-জনিত শুল্ক গ্রহণে মানস কলুষিত, এই গোবর্ধনের মত যাহারা ব্রহ্মহত্যা-মহাপাতকে পতিত, সেই গলিত নরককীটেরা ধর্মের মর্ম কি জানিবে?"

এই বলিয়া নিরঞ্জন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

নিরঞ্জন চলিয়া যাইলে, গোবর্ধন শিরোমণি বলিলেন, "ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে ইনি গালি দিলেন। ষাঁড়েশ্বর বাবাজী বীরপুরুষ। ষাঁড়েশ্বর বাবাজীকে অপমান করিয়া এ গ্রামে আবার কে বাস করিতে পারে?"

খেতু যে একঘরে হইয়াছেন, নিয়মিতরূপে লোককে সেইটি দেখাইবার নিমিত্ত, স্ত্রীর মাসিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জনার্দন চৌধুরী সপ্তগ্রাম সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। চারিদিকে হৈ হৈ পড়িয়া গেল যে, কুসুমঘাটী নিবাসী শিবচন্দ্রের পুত্র ক্ষেত্র বরফ খাইয়া ক্রিস্তান হইয়াছে।

সেইদিন রাত্রিতে ষাঁড়েশ্বর চারি বোতল মহুয়ার মদ আনিলেন। তারিফ শেখের বাড়ি হইতে চুপি চুপি মুরগী রাঁধাইয়া আনিলেন। পাঁচ ইয়ার জুটিয়া পরম সুখে পান-ভোজন হইল। একবার কেবল এই সুখে ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। খাইতে খাইতে ষাঁড়েশ্বরের মনে উদয় হইল যে, তারিফ শেখ হয় তো মুরগীর সহিত বরফ মিশ্রিত করিয়াছে! তাই তিনি হাত তুলিয়া লইলেন, আর বলিলেন, "আমার খাওয়া হইল না। বরফ-মিশ্রিত মুরগী খাইয়া শেষে কি জাতিটি হারাইব?" সকলে অনেক বুঝাইলেন যে, মুরগী বরফ দিয়া রান্না হয় নাই। তবে তিনি পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পান-ভোজনের পর নিরঞ্জনের বাটীতে সকলে গিয়া ঢিল ও গোহাড় ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রমাগত প্রতি রাত্রিতে নিরঞ্জনের বাটীতে ঢিল ও গোহাড় পড়িতে লাগিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া, নিরঞ্জন ও তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে পৈতৃক বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্য গ্রামে চলিয়া গেলেন।

খেতু বলিলেন, "কাকা মহাশয়, আপনি চলুন। আমিও এ গ্রাম হইতে শীঘ্র উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মার নিকট যে ঝি ছিল, সে ঝিটি ছাড়িয়া গেল। সে বলিল, "মা ঠাকুরাণী, আমি আর তোমার কাছে কি করিয়া থাকি? পাঁচজনে তাহা হইলে আমার হাতে জল খাইবে না।"

আরও নানা বিষয়ে খেতুর মা উৎপীড়িত হইলেন। খেতুর মা ঘাটে স্নান করিতে যাইলে, পাড়ার স্ত্রীলোকেরা দূরে দূরে থাকেন; পাছে খেতুর মা তাঁহাদিগকে ছুঁইয়া ফেলেন।

যে কমল ভট্টাচার্যের কথা গদাধর ঘোষ বলিয়াছিল, একদিন সেই কমলের বিধবা স্ত্রী মুখ ফুটিয়া খেতুর মাকে বলিলেন, "বাছা, নিজে সাবধান হইতে জানিলে, কেহ আর কিছু বলে না। বসিতে জানিলে উঠিতে হয় না। তোমার ছেলে বরফ খাইয়াছে, তোমাদের এখন জাতিটি গিয়াছে। তা বলিয়া আমাদের সকলের জাতিটি মার কেন? আমাদের ধর্ম-কর্ম নাশ কর কেন? তা তোমার বাছা দেখিতেছি এ ঘাটটি না হইলে আর চলে না। সেদিন, মেটে কলসটি যেই কাঁখে করিয়া উঠিয়াছি, আর তোমার গায়ের জলের ছিটা আমার গায়ে লাগিল, তিন পয়সার কলসীটি আমাকে ফেলিয়া দিতে হইল। আমাকে পুনরায় স্নান করিতে হইল। আমরা তোমার বাছা কি করিয়াছি যে তুমি আমাদের সঙ্গে এত লাগিয়াছ?"

খেতুর মা কোন উত্তর দিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি আসিলেন। খেতু বলিলেন, "মা, কাঁদিও না। এখানে আর আমরা অধিক দিন থাকিব না। এ গ্রাম হইতে আমরা উঠিয়া যাইব।"

খেতুর মা বলিলেন, "বাছা, অভাগীরা যাহা কিছু বলে, তাহাতে আমি দুঃখ করি না। কিন্তু তোমার মুখপানে চাহিয়া রাত্রিদিন আমার ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। তোমার আহার নাই, নিদ্রা নাই; একদণ্ড তুমি সুস্থির নও, শরীর তোমার শীর্ণ, মুখ তোমার মলিন। খেতু, আমার মুখপানে চাহিয়া একটু সুস্থির হও, বাছা!"

খেতু বলিলেন, "মা, আর সাতদিন। আজ মাসের হইল ১৭ তারিখ। ২৪শে তারিখে কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে। সেইদিন আশাটি আমার সমূলে নির্মূল হইবে। সেইদিন আমরা জন্মের মত এদেশ হইতে চলিয়া যাইব।"

খেতুর মা বলিলেন, "দাসেদের মেয়ের কাছে শুনিলাম যে কঙ্কাবতীকে আর চেনা যায় না। সে রূপ নাই, সে রং নাই, সে হাসি নাই। আহা, তবুও বাছা মার দুঃখে কাতর। আপনার সকল দুঃখ ভুলিয়া

বাছা আমার মার দুঃখে দুঃখী। কঙ্কাবতীর মা রাত্রি-দিন কাঁদিতেছেন, আর কঙ্কাবতী মাকে বুঝাইতেছেন।"

"শুনিলাম, সেদিন কঙ্কাবতী মাকে বলিয়াছেন যে, মা তুমি কাঁদও না, আমার এই কয়খানা হাড় বেচিয়া বাবা যদি টাকা পান, তাতে দুঃখ কি মা? এরূপ কত হাড় শ্মশানঘাটে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য কেহ একটি পয়সাও দেয় না। আমার এই হাড় ক-খানার যদি এত মূল্য হয়, বাপ-ভাই সেই টাকা পাইয়া যদি সুখী হন, তার জন্য আর আমরা দুঃখ কেন করি মা? তবে মা, আমি বড়ই দুর্বল হইয়াছি, শরীরে আমার সুখ নাই। পাছে এই কদিনের মধ্যে আমি মরিয়া যাই, সেই ভয় হয়। টাকা না পাইতে পাইতে মরিয়া গেলে, বাবা আমার উপর বড় রাগ করিবেন। আমি তো ছাই হইয়া যাইব, কিন্তু আমাকে তিনি যখনই মনে করিবেন, আর তখনই কত গালি দিবেন।"

খেতুর মা পুনরায় বলিলেন, "খেতু, কঙ্কাবতীর কথা যেরূপ আমি শুনি, তা তোমাকে বলি না, পাছে তুমি অধৈর্য হইয়া পড়। কঙ্কাবতীর যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, কঙ্কাবতী আর অধিকদিন বাঁচিবে না।"

খেতু বলিলেন, "মা, আমি তনু রায়কে বলিলাম যে, রায় মহাশয়, আপনাকে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিতে হইবে না, একটি সুপাত্রের সহিত দিন। রামহরি দাদা ও আমি ধনাঢ্য সুপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিব। কিন্তু মা, তনু রায় আমার কথা শুনিলেন না, অনেক গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলেন। আমাদের কি মা? আমরা অন্য গ্রামে গিয়া বাস করিব। কিন্তু কঙ্কাবতী যে এখানে চিরদুঃখিনী হইয়া রহিল সেই মা দুঃখ। আমি কাপুরুষ যে তাহার কোনও উপায় করিতে পারিলাম না, সেই মা দুঃখ। আর মা, যদি কঙ্কাবতীর বিষয়ে কোনও কথা শুনিতে পাও তো আমাকে বলিও। আমার নিকটে কোনও কথা গোপন করিও না। আহা, সীতাকে এ সময়ে কলিকাতায় কেন পাঠাইয়া দিলাম। সীতা যদি এখানে থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিনের সঠিক সংবাদ পাইতাম।"

খেতুর মা তার পরদিন খেতুকে বলিলেন, "আজ শুনিলাম, কঙ্কাবতীর বড় জর হইয়াছে। আহা! ভাবিয়া ভাবিয়া বাছার যে জর হইবে, সে আর বিচিত্র কথা কি? বাছার এখন প্রাণরক্ষা হইলে হয়। জনার্দন

চৌধুরী কবিরাজ পাঠাইয়াছেন, আর বলিয়া দিয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, চারিদিনের মধ্যে কঙ্কাবতীকে ভাল করিতে হইবে।"

খেতু বলিলেন, "তাই তো মা, এখন কঙ্কাবতীর প্রাণটা রক্ষা হইলে হয়। মা, কঙ্কাবতীর বিড়াল আসিলে এ কয়দিন তাহাকে ভাল করিয়া দুধ-মাছ খাইতে দিবে। হাঁ মা, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইলে, কঙ্কাবতীর বিড়াল কি আমাদের বাড়িতে আর আসিবে? না, বড়-মানুষের বাড়িতে গিয়া আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবে?"

খেতুর মা কোনও উত্তর দিলেন না, আঁচলে চক্ষু মুছিতে লাগিলেন।

এইরূপে দিন দিন কঙ্কাবতীর পীড়া বাড়িতে লাগিল, কিছুই কমিল না। সাতদিন হইল। বিবাহের দিন উপস্থিত হইল।

সেদিন কঙ্কাবতীর গায়ের বড় জ্বালা, কঙ্কাবতীর বড়ই পিপাসা, কঙ্কাবতী একেবারে শয্যাধরা। কঙ্কাবতীর সমূহ রোগ। কঙ্কাবতীর ঘোর বিকার। কঙ্কাবতীর জ্ঞান নাই, সংজ্ঞা নাই। লোক চিনিতে পারেন না, কঙ্কাবতী এখন যান তখন যান।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নৌকা

বড় পিপাসা, বড় গায়ের জ্বালা!

কঙ্কাবতী মনে মনে করিলেন, "যাই, নদীর ঘাটে যাই, সেই খানে বসিয়া এক পেট জল খাই, আর গায়ে জল মাখি, তাহা হইলে শান্তি পাইব।"

নদীর ঘাটে বসিয়া কঙ্কাবতী জল মাখিতেছেন, এমন সময়ে কে বলিল, "কেও, কঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। কেহ কোথাও নাই। কে এ কথা বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। নদীর জলে দূরে কেবল একটি কাতলা মাছ ভাসিতেছে আর ডুবিতেছে, তাহাই দেখিতে পাইলেন।

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "কেও কঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী এইবার উত্তর করিলেন, "হাঁ গো আমি কঙ্কাবতী।"

পুনরায় কে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি বড় গায়ের জ্বালা, তোমার কি বড় পিপাসা?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "হাঁ গো আমার বড় গায়ের জ্বালা, আমার বড় পিপাসা!"

কে আবার বলিল, "তবে তুমি এক কাজ কর না কেন? নদীর মাঝখানে চল না কেন? নদীর ভিতর অতি সুশীতল ঘর আছে, সেখানে যাইলে তোমার পিপাসার শান্তি হইবে, তোমার শরীর জুড়াইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "নদীর মাঝখান যে অনেক দূর! সেখানে আমি কি করিয়া যাইব?"

সে বলিল, "কেন? ওই যে জেলেদের নৌকা রহিয়াছে? ওই নৌকার উপর বসিয়া কেন এস না?"

জেলেদের একখানি নৌকার উপর গিয়া কঙ্কাবতী বসিলেন। এমন সময় বাটীতে কঙ্কাবতীর অনুসন্ধান হইল। "কঙ্কাবতী কোথায় গেল,

কঙ্কাবতী কোথায় গেল?"—এই বলিয়া একটা গোল পড়িল। কে বলিল, "ও গো! তোমাদের কঙ্কাবতী ওই ঘাটের দিকে গিয়াছে।"

কঙ্কাবতীর বাড়ির সকলে মনে করিলেন যে, জনার্দন চৌধুরীর সহিত বিবাহ হইবার ভয়ে কঙ্কাবতী পলায়ন করিতেছেন। তাই কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়লেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন।

কঙ্কাবতীর ভাগনী বলিলেন:

"কঙ্কাবতী বোন্ আমার, ঘরে ফিরে এস না?
বড় দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাস না?
তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার।
কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মার।"

নৌকায় বসিয়া বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন:

"শুনিয়াছি আছে নাকি জলের ভিতর।
শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।
সেই খানে যাই দিদি পূজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল। তখন, ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন:

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।
রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার-কথা?
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন:

"কি বলিছ দাদা তুমি বুঝিতে না পারি।
জলিছে আগুন দেহে নিবাইতে নারি।
যাও দাদা ঘরে যাও হও তুমি রাজা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি হুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।

তখন কঙ্কাবতীর মা আসিয়া বলিলেন :

"কঙ্কাবতী লক্ষ্মী আমার ঘরে ফিরে এস না?
কাঁদিতেছে মায়ের প্রাণ, বিলম্ব আর ক'রো না।
ভাত হ'ল কড় কড়, ব্যঞ্জন হইল বাসি।
কঙ্কাবতী মা আমার সাত দিন উপবাসী।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন :

"বড়ই পিপাসা মাতা না পারি সহিতে।
তুষের আগুন সদা জ্বলিছে দেহেতে।
এই আগুন নিবাইতে যাইতেছি মা।
কঙ্কাবতীর নৌকাখানি এই হুথু যা।"

এই বলিতে কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও দূর জলে ভাসিয়া গেল।
তখন বাবা আসিয়া বলিলেন :

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, হইবে তোমার বিয়া।
কত যে হতেছে ঘটা দেখ তুমি ঘরে গিয়া।
গহনা পরিবে কত আর সাটিনের জামা।
কত যে পাইবে টাকা নাহিক তাহার সীমা।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন :

"টাকাকড়ি কাজ নাই বসন-ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
দারুণ যাতনা পিতা আর ত সহে না!
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপ্ করিয়া ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জলে

নৌকার সহিত কঙ্কাবতীও ডুবিয়া গেলেন। কঙ্কাবতী জলের ভিতর ক্রমেই ডুবিতে লাগিলেন। ক্রমেই নীচে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। তখন নদীর যত মাছ সব একত্র হইল। নদীর ভিতর মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল যে, কঙ্কাবতী আসিয়াছেন। রুই বলে, "কঙ্কাবতী আসিয়াছেন।" পুঁটি বলে, "কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" সবাই বলে, "কঙ্কাবতী আসিতেছেন।" পথ পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া জলচর জীব-জন্তু সব যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ক্রমে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সকলেই কঙ্কাবতীর আদর করিল। সকলেই বলিল, "এস এস, কঙ্কাবতী এস।"

মাছেদের ছেলে-মেয়েরা বলিল, "আমরা কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেলা করিব।"

বৃদ্ধা কাতলা মাছ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলেন, "কঙ্কাবতীর এ খেলা করিবার সময় নয়। বাছার বড় গায়ের জ্বালা দেখিয়া আমি কঙ্কাবতীকে ঘাট হইতে ডাকিয়া আনিলাম। আহা কত পথ আসিতে হইয়াছে। বাছার আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! এস মা তুমি আমার কাছে এস। একটু বিশ্রাম কর, তারপর তোমার একটা বিলি করা যাইবে।"

কঙ্কাবতী আস্তে আস্তে কাতলা মাছের নিকট গিয়া বসিলেন।

এদিকে কঙ্কাবতী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, ওদিকে জলচর জীব-জন্তুগণ মহাসমারোহে একটি সভা করিলেন। তপস্বী মাছের দাড়ি আছে দেখিয়া সকলে তাঁহাকে সভাপতিরূপে বরণ করিলেন। কঙ্কাবতীকে লইয়া কি করা যায় সভায় এই কথা লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

অনেক বক্তৃতার পর, চতুর বাটা মাছ প্রস্তাব করিলেন, "এস ভাই, কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করি।"

এই কথাটি সকলের মনোনীত হইল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল।

মাছেদের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, ভাই! কঙ্কাবতী আমাদের রাণী হইলে, আর আমাদের

কোনও ভাবনা থাকিবে না। বঁড়শি দিয়া আমাদিগকে কেহ গাঁথিলে হাত দিয়া কঙ্কাবতী সুতাটি ছিঁড়িয়া দিবেন। জেলেরা জাল ফেলিলে ছুরি দিয়া কঙ্কাবতী জালটি কাটিয়া দিবেন। কঙ্কাবতী রাণী হইলে আর আমাদের কোনও ভয় থাকিবে না। এস, এখন সকলে কঙ্কাবতীর কাছে যাই, আর কঙ্কাবতীকে গিয়া বলি যে, কঙ্কাবতী তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।

তাহার পর মাছেরা কঙ্কাবতীর কাছে যাইল, আর সকলে বলিল, "কঙ্কাবতী! তোমাকে আমাদের রাণী হইতে হইবে।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না। আমার শরীরে সুখ নাই, আমার মনেও বড় অসুখ। তাই এখন আমি তোমাদের রাণী হইতে পারিব না।"

তখন কাতলানী বলিলেন, "তোমরা রাজপোশাক প্রস্তুত করিয়াছ? রাজপোশাক না পাইলে কঙ্কাবতী তোমাদের রাণী হইবে কেন?"

এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল, "ও হো বুঝেছি বুঝেছি! রাজ-পোশাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেমের মত পোশাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "না গো না! রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।"

মাছেরা সে কথা শুনিল না। বিষম কোলাহল উপস্থিত করিল। তাহাদের কোলাহলে অস্থির হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল। না হয় আমি তোমাদের রাণী হইলাম। এখন আমাকে করিতে হইবে কি?"

মাছেরা উত্তর করিল, "করিতে হইবে কি? কেন? দরজির বাড়ি যাইতে হইবে, গায়ের মাপ দিতে হইবে, পোশাক পরিতে হইবে।"

সকলে তখন কাঁকড়াকে বলিলেন, "কাঁকড়া মহাশয়! আপনি জলেও চলিতে পারেন, স্থলেও চলিতে পারেন আপনি বুদ্ধিমান লোক। চক্ষু দুইটি যখন আপনি পিট্‌ পিট্‌ করেন, বুদ্ধির আভা তখন তাহার ভিতর চিক্‌ চিক্‌ করিতে থাকে। কঙ্কাবতীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দরজির বাড়ি গমন করুন। ঠিক করিয়া কঙ্কাবতীর গায়ের মাপটি দিবেন, দামী কাপড়ের জামা করিতে বলিবেন। কচ্ছপের পিঠে বোঝাই দিয়া টাকা মোহর লইয়া

যান। যত টাকা লাগে, তত টাকা দিয়া, কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় করিয়া দেবেন।”

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, “অবশ্যই আমি যাইব। কঙ্কাবতীর ভাল কাপড় হয়, ইহাতে কার না আহ্লাদ? আমাদের রাণীকে ভাল করিয়া না সাজাইলে গুজাইলে, আমাদের অখ্যাতি। তোমরা কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দাও, আমি ততক্ষণ ঘর হইতে পোশাকী কাপড় পরিয়া আসি, আর মাথার মাঝে সিঁথি কাটিয়া আমার চুলগুলি বেশ ভাল করিয়া ফিরাইয়া আসি।”

কচ্ছপের পিঠে টাকা মোহর বোঝাই দেওয়া হইল। ততক্ষণ কাঁকড়া মহাশয় ভাল কাপড় পরিয়া, মাথা আঁচড়াইয়া, ফিট্-ফাট হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজ-বেশ

কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন।

প্রথম অনেক দূর জলপথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দূর স্থলপথে যাইলেন। পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজির বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

বুড়ো দরজি চশমা নাকে দিয়া কাঁচি হাতে করিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। দূরে পাহাড় পানে চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনজন কাহারা আসিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, ও কারা আসে? নিকটে আসিলে চিনিতে পারিলেন।

তখন বুড়ো দরজি বলিলেন, "কে ও কাঁকড়া ভায়া?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, "হাঁ দাদা, কেমন, ভাল আছ তো?"

দরজি বলিলেন, "আর ভাই, আমাদের আর ভাল থাকা না থাকা। এখন গেলেই হয়। তোমরা শৌখিন পুরুষ, তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। এখন কি মনে করিয়া আসিয়াছ বল দেখি?"

কাঁকড়া উত্তর করিলেন, "এই কঙ্কাবতীকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। কঙ্কাবতীর জন্য ভাল জামা চাই, তাই তোমার নিকট আসিয়াছি।"

দরজী বলিলেন, "বটে, তা আমার নিকট উত্তম উত্তম জামা আছে। ভাল পাটনাই খেরোর জামা আছে। টক্-টকে লাল খেরো, রং উঠিতে জানে না। ছিঁড়িতে জানে না, আগা-গোড়া আমি বখেই দিয়া সেলাই করিয়াছি। তোমাদের রাণী কঙ্কাবতী যদি শিমুল তুলা হয় তো পরাও অতি উত্তম দেখাইবে। দামের জন্য আটক থাইবে না। এখন টিপিয়া দেখ দেখি, কঙ্কাবতী শিমুল তুলা কি না?"

দাড়া দিয়া কাঁকড়া মহাশয় কঙ্কাবতীর গা টিপিয়া দেখিলেন। তাহার পর দরজির পানে চাহিয়া বলিলেন, "কই না, সেরূপ নরম তো নয়?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "খেরোর খোল পরাইয়া তোমরা আমাকে বালিশ

করিবে না কি? এই সকলে মিলিয়া আমাকে রাণী করিলে, তবে আবার বালিশ করিবার পরামর্শ করিতেছ কেন?"

দরজি উত্তর করিলেন, "ইশ, মেয়ের যে আস্থা ভারী, বালিশ হবে না তো কি তাকিয়া হইতে চাও নাকি?"

দরজির এই নিষ্ঠুর বচনে কঙ্কাবতীর মনে বড় দুঃখ হইল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বলিলেন, "তুমি ছেলে মানুষ, আমাদের কথায় কথা কও কেন বল দেখি? যা তোমার পক্ষে ভাল তাই আমরা করিতেছি, চুপ করিয়া দেখ। চুপ কর, কাঁদিতে নাই।"

এইরূপ সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া কাঁকড়া মহাশয় আপনার বড় দাঁড়া দিয়া কঙ্কাবতীর মুখ মুছাইয়া দিলেন। তাহাতে কঙ্কাবতীর মুখ ছড়িয়া গেল।

বুড়ো দরজি বলিলেন, "তাই তো, তবে এর গায়ের জামা আমার কাছে নাই। এর জামা আমি কাটিতেও জানি না সেলাই করিতেও জানি না।"

কাঁকড়া মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন উপায়? ভাল জামা কোথায় পাই?"

বুড়ো দরজি বলিলেন, "তুমি এক কাজ কর; তুমি খলিফা সাহেবের কাছে যাও। খলিফা সাহেব ভাল কারিকর, খলিফা সাহেবের মত কারিকর এ পৃথিবীতে নাই, তাহার কাছে নানাবিধ কাপড় আছে, সে কাপড় পরিলে খাঁদারও নাক হয়।"

এই কথায় কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ না কি? তোমার না হয় নাকটি একটু বড় আমার না হয় নাকটি ছোট, তাতে আবার ঠাট্টা কিসের?"

বুড়ো দরজি উত্তর করিলেন, "না না, তা কি কখনও হয়! তোমাকে আমি ঠাট্টা করিতে পারি? কেন, তোমার নাকটি মন্দ কি? কেবল দেখিতে পাওয়া যায় না, এই দুঃখের বিষয়।"

বুড়ো দরজির এইরূপ প্রিয় বচনে কাঁকড়া মহাশয়ের রাগ পড়িল। সন্তোষ লাভ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, "তা বটে, আমার নাকটি ভাল, তবে দোষের মধ্যে এই যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় আছে আমি নিজেই খুঁজিয়া পাই না। যদি দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমার নাক দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিত, সকলেই বলিত আহা, কাঁকড়ার কি

নাক, যেন বাঁশির মত। আর যারা ছড়া বাঁধে তারা লিখিত, 'তিলফুল জিনি নাসা' কিংবা 'শুকচঞ্চু মত নাসা'। যা বল, যা কও, আমার অতি সুন্দর নাক।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, ব্যাপারখানা কি? আমি দেখিতেছি সব পাগলের হাতে পড়িয়াছি। এ কাঁকড়াটা তো বদ্ধ পাগল। এরে পাগলা গারদে রাখা উচিত। মুখ ফুটিয়া কিন্তু কঙ্কাবতী কিছু বলিলেন না।

সকলে পুনরায় সেখান হইতে চলিলেন। আগে কাঁকড়া মহাশয়, তারপর কঙ্কাবতী, শেষে কচ্ছপ। এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগলেন। যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া অবশেষে খলিফা সাহেবের ঘরে উপস্থিত হইলেন। খলিফা তখন অন্দরমহলে ছিলেন।

কাঁকড়া মহাশয় বাহির হইতে ডাকিলেন, "খলিফা সাহেব, খলিফা সাহেব।"

ভিতর হইতে খলিফা উত্তর দিলেন, "কে হে, কে ডাকাডাকি করে?"

কাঁকড়া মহাশয় উত্তর করিলেন, "আমি কাঁকড়াচন্দ্র। একবার বাহিরে আসুন, বিশেষ কাজ আছে।"

খলিফা বাহিরে আসিলেন। কাঁকড়াচন্দ্রকে দেখিয়া অতি সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

খলিফা বলিলেন, "আসুন আসুন কাঁকড়া বাবু আসুন। আর এই যে কচ্ছপ বাবুকেও দেখিতেছি। কচ্ছপ বাবু আপনি ওই টুলটিতে বসুন আর কাঁকড়া বাবু আপনি ওই চেয়ারখানি নিন্। এ মেয়েটিকে বসিতে দিই কোথায়? দিব্য মেয়েটি! কাঁকড়া, এ কন্যাটি কি আপনার?"

কাঁকড়াচন্দ্র উত্তর করিলেন, "না, এ কন্যাটি আমার নয়, আমি বিবাহ করি নাই। ওঁর জন্যই এখানে আসিয়াছি। ওঁকে আমরা আমাদের রাণী করিয়াছি। এক্ষণে রাজপরিচ্ছদের প্রয়োজন। তাই আপনার নিকট আসিয়াছি। এঁর জন্য অতি উত্তম রাজপরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে।"

খলিফা উত্তর করিলেন, রাজ-পরিচ্ছেদ প্রস্তুত করিতে পারি। আমার কাছে রেশম আছে, পশম আছে, সাটিন আছে, মায় বারাণসী কিংখাপ পর্যন্ত আছে। কিন্তু রাজ-পোশাক তো আর অমনি হয় না? তাতে হীরা বসাইতে হইবে, মতি বসাইতে হইবে, জরি-লেস প্রভৃতি ভাল ভাল দ্রব্য লাগাইতে হইবে। অনেক টাকা খরচ হইবে। টাকা দিতে পারিবেন তো?"

কাঁকড়াচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের টাকার অভাব কি? যত নৌকা-জাহাজ ডুবি হয়, তাহাতে যে টাকা থাকে, সে সব কোথায় যায়? সে সকল আমাদের প্রাপ্য। এক্ষণে আপনার কত টাকা চাই, তা বলুন?"

খলিফা উত্তর করিলেন, "যদি দুই তোড়া টাকা দিতে পারেন, তাহা হইলে উত্তম রাজপোশাক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি।"

কাঁকড়া তৎক্ষণাৎ কচ্ছপের পিঠ হইতে লইয়া দুই তোড়া মোহর খলিফার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। খলিফা অনেক রাজার পোশাক, অনেক বাবুর পোশাক, অনেক বরের পোশাক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু একেবারে দুই তোড়া মোহর কেহ কখনও তাঁহাকে দেয় নাই।

মোহর দেখিয়া কঙ্কাবতী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, "ও গো, তোমরা এ টাকাগুলি আমাকে দাও। আমি বাড়ি লইয়া যাই। আমার বাবা বড় টাকা ভালবাসেন, এত টাকা পাইলে বাবা কত আহ্লাদ করিবেন। এই ময়লা কাপড় পরিয়াই আমি না হয় তোমাদের রাণী হইব, ভাল কাপড়ে আমার কাজ নাই। তোমাদের পায়ে পড়ি, এই টাকাগুলি আমাকে দাও, আমি বাবাকে গিয়া দিই।"

কাঁকড়া কঙ্কাবতীকে বকিয়া উঠিলেন। কাঁকড়া বলিলেন, "তুমি বড় অবাধ্য মেয়ে দেখিতেছি। একবার তোমাকে মানা করিয়াছি যে, তুমি ছেলেমানুষ, আমাদের কথায় কথা কহিও না। চুপ করিয়া দেখ, আমরা কি করি।"

কি করিবেন? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিলেন। মোহর পাইয়া খলিফার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "টাকাগুলি বাড়ির ভিতর রাখিয়া আসি, আর ভাল ভাল কাপড় বাহির করিয়া আনি। এক্ষণে তোমাদের রাণীর রাজবস্ত্র করিয়া দিব।"

বাটীর ভিতর খলিফা দুইতোড়া মোহর লইয়া যাইলেন। আহ্লাদে পুলকিত হইয়া দন্তপাতি বাহির করিয়া একগাল হাসির সহিত সেই মোহর স্ত্রীকে দেখাইতে লাগিলেন।

স্ত্রী অবাক্, কি আশ্চর্য! আজ সকাল বেলা আমরা কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিয়াছিলাম? খলিফানী এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রকাশ্যে খলিফানী বলিলেন, "এবার কিন্তু আমাকে ডায়মণ্ডকাটা তাবিজ গড়াইয়া দিতে হইবে।"

তাহার পর খলিফা কঙ্কাবতীকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। স্ত্রীকে

বলিলেন, "ইনি রাণী। এঁর নাম কঙ্কাবতী। এঁর জন্য রাজ-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইবে। অতি সাবধানে তুমি ইঁহার গায়ের মাপ লও।"

খলিফানী কঙ্কাবতীর গায়ের মাপ লইলেন। অনেক লোক নিযুক্ত করিয়া অতি সত্বর খলিফা রাজবস্ত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। খলিফা-রমণী যত্নে সেই পোশাক কঙ্কাবতীকে পরাইয়া দিলেন। রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কঙ্কাবতীর রূপ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল।

খলিফা-রমণী বলিলেন, "আহা! মরি কি রূপ!"

খলিফা বলিলেন, "মরি কি রূপ"

সকলেই বলিলেন, "মরি কি রূপ!"

রাজ-পরিচ্ছদ পরা হইলে কাঁকড়া ও কচ্ছপ, কঙ্কাবতীকে লইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে চলিলেন। অনেক স্থল অনেক জল অতিক্রম করিয়া তিনজনে পুনরায় নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে কঙ্কাবতীর মনোহর রূপ মনোহর পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইল। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, "আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা কঙ্কাবতী হেন রাণী পাইলাম।"

এক্ষণে একটি মহা ভাবনার বিষয় উপস্থিত হইল। জলচর জীবগণের এখন এই ভাবনা হইল যে, রাণী থাকেন কোথায়? যে সে রাণী নয়, কঙ্কাবতী রাণী। যেরূপ জগৎসুশোভিনী মনোমোহিনী কঙ্কাবতী রাণী, সেইরূপ সুসজ্জিত অলংকৃত মনোমোহিত অট্টালিকা চাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সকলে স্থির করিলেন যে, রাণী কঙ্কাবতীর নিমিত্ত মোতিমহলই উপযুক্ত স্থান। যাহাকে মোতি বলে তাহাকেই মুক্তা বলে। মুক্তার যথায় উৎপত্তি, মুক্তার যথায় স্থিতি, সেই স্থানকে মোতিমহল বলে।

রুই প্রভৃতি মৎস্যগণ জোড়হাত করিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন, "রাণী-ধিরাণী-মহারাণী, মোতিমহল আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান, আপনি ওই মোতিমহলে গিয়া বাস করুন।'

এইরূপে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করিয়া মাছেরা কঙ্কাবতীকে একটি ঝিনুক দেখাইয়া দিল। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় বলিয়া ঝিনুকের নাম মোতি-মহল। কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ঝিনুকের ভিতর বাস করিয়া কঙ্কাবতী মাছেদের রাণীগিরি করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোয়ালিনী

এইরূপে কিছুদিন যায়। এখন একদিন এক গোয়ালিনী নদীতে স্নান করিতে আসিয়াছিল। স্নান করিতে করিতে তাহার পায়ে সেই ঝিনুকটি ঠেকিল। ডুব দিয়া সে সেই ঝিনুকটি তুলিল। দেখিল যে চমৎকার ঝিনুক। ঝিনুকটি সে বাড়ি লইয়া গেল; আর আপনার চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাহিরের দ্বারে কুলুপ দিয়া গোয়ালিনী প্রতিদিন লোকের বাড়ি দুধ দিতে যায়; কঙ্কাবতী সেই সময় ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হন। প্রথম দিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া যেমন মাটিতে পা দিলেন, আর তাঁহার রাজবেশ গিয়া একেবারে পূর্ববৎ বেশ হইল। কঙ্কাবতী তাহা দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইলেন। প্রতিদিন ঝিনুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কঙ্কাবতী গোয়ালিনীর সমুদয় কাজ-কর্ম সারিয়া রাখেন। ঘর-দ্বার পরিষ্কার করেন, বাসর-কোষন মাজেন, ভাত ব্যঞ্জন রাঁধেন, আপনি খান আর গোয়ালিনীর জন্য ভাত বাড়িয়া রাখেন।

বাড়ি আসিয়া, সেইসব দেখিয়া, গোয়ালিনী বড়ই আশ্চর্য হয়। গোয়ালিনী মনে করে, "এমন করিয়া সমুদয় কাজকর্ম কে করে? দ্বারে যেরূপ চাবি দিয়া যাই, সেইরূপ চাবি দেওয়াই থাকে। বাহির হইতে বাড়ির ভিতর কেহ আসে নাই। তবে এসব কাজকর্ম করে কে?'

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোয়ালিনী কিছুই স্থির করিতে পারে না। এইরূপ প্রতিদিন হইতে লাগিল।

অবশেষে গোয়ালিনী ভাবিল, আমাকে ধরিতে হইবে। প্রতিদিন যে আমার কাজকর্ম সারিয়া রাখে তারে ধরিতে হইবে।

এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, গোয়ালিনী তার পরদিন সকাল সকাল বাটী ফিরিয়া আসিল। নিঃশব্দে, অতি ধীরে ধীরে দ্বারটি খুলিয়া দেখে যে, বাটীর ভিতর এক পরমাসুন্দরী বালিকা বসিয়া বাসন মাজিতেছে।

গোয়ালিনীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কঙ্কাবতী সেই ঝিনুকের ভিতর লুকাইতে গেলেন, আর সে গিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরিয়া দেখে না কঙ্কাবতী।

আশ্চর্য হইয়া গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কঙ্কাবতী, তুমি এখানে? তুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? তুমি না নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "হাঁ মাসী, আমি কঙ্কাবতী। আমি নদীর জলে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। নদীতে আমি ওই ঝিনুকটির ভিতর ছিলাম। ঝিনুকটি আনিয়া তুমি চালের বাতায় রাখিয়াছ। তাই মাসী, আমি তোমার বাড়ি আসিয়াছি।"

গোয়ালিনী এখন সকল কথা বুঝিল। আশ্চর্য হইবার আর কোনও কারণ রহিল না।

কঙ্কাবতী পুনরায় বলিলেন, "মাসী, আমি যে এখানে আছি, সে কথা এখন তুমি আমার বাড়িতে বলিও না। শুধু হাতে বাড়ি যাইলে বাবা হয় তো বকিবেন। জলের ভিতর আমি অনেক টাকা দেখিয়াছি। তাহারা দরজিকে দিল, কিন্তু আমাকে দিল না। আমি কত কাঁদিলাম কাটিলাম, তবুও তাহারা আমাকে দিল না। দেখি, যদি তাহারা আমাকে কিছু দেয়, তাহা হইলে বাবাকে দিব, বাবা তাহা হইলে বকিবেন না, দাদা গালি দিবেন না।"

গোয়ালিনী বলিল, "বাছা রে আমার, জনার্দন চৌধুরীকে এই সোনার বাছা বেচিতে চায়। পোড়ারমুখো বাপ। রও, এইবার দেখা হইলে হয়, গালি দিয়া ভূত ছাড়াইব।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "না মাসী, বাবাকে গালি দিও না, জান তো মাসী? বাবা দুঃখী মানুষ, ঘরে অনেকগুলি খাইতে। আমাকে না বেচিলে, বাবা সংসার প্রতিপালন কি করিয়া করিবেন?"

এইরূপ কথাবার্তার পর স্থির হইল যে, কঙ্কাবতী এখন কিছুদিন গোয়ালিনীর ঘরে থাকিবেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মাসী, প্রতিদিন তুমি পাড়ায় যাও। গ্রামে যে দিন যে ঘটনা হয়, আমাকে আসিয়া বলিও।"

গোয়ালিনীর ঘরে কঙ্কাবতী বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামে যে দিন যেখানে যাহা হয়, গোয়ালিনী আসিয়া তাঁহাকে বলে।

একদিন গোয়ালিনী আসিয়া বলিল, "আহা! খেতুর মার বড় অসুখ! খেতুর মা এবার বাঁচেন কি না!"

অতি কাতরভাবে, কাঁদ-কাঁদ হইয়া, কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে, মাসী? তাঁর কি হইয়াছে?"

গোয়ালিনী উত্তর করিল, "শুনিলাম, তাঁহার জ্বর-বিকার হইয়াছে। খেতু বৈদ্য ডাকিতে গিয়াছেন, কিন্তু বৈদ্য আসেন নাই। বৈদ্য বলিয়াছেন, তোমার বাটীতে চিকিৎসা করিতে গিয়া শেষে জাতিটি হারাইব না কি?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মাসী, তিনি আমাকে বড় ভালবাসেন। আমার আপনার মা যেরূপ, তিনিও আমার সেইরূপ। তাঁর অসময়ে আমি কিছু করিতে পারিলাম না, সেজন্য বড় দুঃখ মনে রহিল।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

তাহার পরদিন অতি প্রত্যূষে কঙ্কাবতী বলিলেন, "মাসী, আজ একটু সকাল সকাল পাড়ায় যাও। শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বল, তিনি কেমন আছেন।"

গোয়ালিনী সকাল সকাল পাড়ায় যাইল, সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিল, "আহা! বড় দুঃখের কথা। খেতুর মা নাই। খেতুর মা মারা গিয়াছেন। মাকে ঘাটে লইয়া যাইবার নিমিত্ত খেতু দ্বার দ্বার ঘুরিতেছে, কিন্তু কেহই আসিতেছে না। সকলেই বলিতেছে, তুমি বরখ খাইয়াছ। তোমার জাতি গিয়াছে। তোমার মাকে ঘাটে লইয়া যাইলে আমাদের জাতি যাইবে। ষাঁড়েশ্বর চক্রবর্তী, গোবর্ধন শিরোমণি, আর কঙ্কাবতী! তোমার বাপ—এই তিনজনে সকলকে মানা করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কেহ না যায়।"

এই সংবাদ শুনিয়া কঙ্কাবতী একেবারে শুইয়া পড়িলেন। অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন। গোয়ালিনী তাঁহাকে কত বুঝাইল। গোয়ালিনী কত বলিল, "কঙ্কাবতী, চুপ কর। কঙ্কাবতী উঠ, খাও।" কঙ্কাবতী উঠিলেন না, সেদিন রাঁধিলেন না, খাইলেন না। মাটীতে পড়িয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যাবেলা কঙ্কাবতী বলিলেন, "মাসী, তুমি আর একবার পাড়ায় যাও। দেখ গিয়া সেখানে কি হইতেছে। শীঘ্র আসিয়া আমাকে বল।"

গোয়ালিনী পুনরায় পাড়ায় যাইল। একটু রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী

ফিরল না। একপ্রহর রাত্রি হইল, তবুও গোয়ালিনী ফিরিল না। মাটীতে শুইয়া পথপানে চাহিয়া কঙ্কাবতী কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

এক প্রহর রাত্রির পর গোয়ালিনী ফিরিয়া আসিল।

গোয়ালিনী বলিল, "কঙ্কাবতী, বড়ই দুঃখের কথা শুনিয়া আসিলাম। খেতুর মাকে লইবার নিমিত্ত কেহই আসেন নাই। খেতু করেন কি? সন্ধ্যা হইলে কাঠ আপনি মাথায় করিয়া প্রথম ঘাটে রাখিয়া আসিলেন। আহা! একেবারে অতগুলি কাঠ লইয়া যাইতে পারিবেন কেন? তিনবার কাঠ লইয়া তাঁকে ঘাটে যাইতে হইয়াছে। তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। একেলা আপনি কোলে করিয়া মাকে লইয়া যাইতেছেন। মরিলে লোকে ভারী হয়। তাতে শ্মশান ঘাট তো আর কম দূর নয়! খানিক দূর লইয়া যান, তারপর আর পারেন না। মাকে মাটীতে শয়ন করান, একটু বিশ্রাম করিয়া পুনরায় লইয়া যান। এইরূপ করিয়া তিনি এখন মাকে ঘাটে লইয়া যাইতেছেন। অন্ধকার রাত্রি। একটু দূরে দূরে থাকিয়া আমি এই সব দেখিয়া আসিলাম।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কঙ্কাবতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিলেন, ধীরে ধীরে গিয়া বাটীর দ্বারটী খুলিলেন, বাটীর বাহিরে যাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন।

গোয়ালিনী বলিল, "কঙ্কাবতী কোথায় যাও? কঙ্কাবতী কোথায় যাও?'

আর, কোথায় যাও! আজ কঙ্কাবতী রাণী-ধিরাণী-মহারাণী নন আজ কঙ্কাবতী পাগলিনী। মনোহর রাজবেশে আজ কঙ্কাবতী সুসজ্জিতা নন, আজ কঙ্কাবতী গোয়ালিনীর একখানি সামান্য মলিন বসন পরিধৃতা। কঙ্কাবতীর মুখ আজ উজ্জ্বল প্রভাসম্পন্ন নয় আজ কঙ্কাবতীর মুখ ঘন-ঘটায় আচ্ছাদিত।

বাটীর বাহির হইয়া, মলিন বেশে আলুলায়িত কেশে, পাগলিনী সেই শ্মশানের দিকে ছুটিলেন।

"কঙ্কাবতী শুন, কঙ্কাবতী শুন!" এই কথা বলিতে বলিতে কিয়দ্দূর গোয়ালিনী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমানা হইল। কিন্তু কঙ্কাবতী তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

রাহুগ্রস্ত পূর্ণশশী অবিলম্বেই নিশার তমোরাশিতে মিশিয়া যাইল। গোয়ালিনী আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে গোয়ালিনী বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শ্মশান

দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, পাগলিনী এখন শ্মশানের দিকে দৌড়িলেন। কিছুদূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন, পথে খেতু মাতাকে রাখিয়াছেন, মার মস্তকটি আপনার কোলে লইয়াছেন, মার কাছে বসিয়া মার মুখ দেখিতেছেন আর কাঁদিতেছেন। অবিরলধারায় অশ্রুবারি তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বিগলিত হইতেছে।

কঙ্কাবতী নিঃশব্দে তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অন্ধকার রাত্রি, সেইজন্য খেতু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

মার মুখপানে চাহিয়া খেতু বলিলেন, "মা! তুমিও চলিলে? যখন কঙ্কাবতী গেল, তখন মনে করিয়াছিলাম এ ছার জীবন আর রাখিব না। কেবল মা তোমার মুখপানে চাহিয়া বাঁচিয়া ছিলাম। এখন মা তুমিও গেলে? তবে আর আমাব এ প্রাণে কাজ কি? কিসের জন্য, কার জন্য আর বাঁচিয়া থাকিব? এ সংসারে থাকা কিছু নয়। এখানে বড় পাপ, বড় দুঃখ। বেশ করিয়াছ, কঙ্কাবতী এখান হইতে গিয়াছ! বেশ করিলে মা যে, এ পাপ সংসার হইতে তুমিও চলিলে! চল মা, যেখানে কঙ্কাবতী, যেখানে তুমি, সেইখানে আমিও শীঘ্র যাইব। এই সসাগরা পৃথিবী আজ আমার পক্ষে শ্মশান-ভূমি হইল। এ সংসারে আর আমার কেহ নাই। চল মা, শীঘ্রই তোমাদিগের নিকট গিয়া প্রাণের এ দারুণ জ্বালা জুড়াইব। মা, কঙ্কাবতীকে বলিও, শীঘ্রই গিয়া আমি তাহার সহিত মিলিব।"

কঙ্কাবতী আসিয়া অধোমুখে খেতুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু চমকিত হইলেন, অন্ধকারে চিনিতে পারিলেন না।

কঙ্কাবতী মার পায়ের নিকট গিয়া বসিলেন। মাব পা দুখানি আপনার কোলের উপর তুলিয়া লইলেন। সেই পায়ের উপর আপনার মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

ঘোরতর বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া খেতু তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

অবশেষে খেতু বলিলেন. "কঙ্কাবতী, জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত এ পৃথিবীতে

কখনও কাহারও অনিষ্টচিন্তা করি নাই, সর্বদা সকলের ইষ্টচিন্তাই করিয়াছি। জানিয়া শুনিয়া কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, প্রবঞ্চনা কখনও করি নাই, কোনও রূপ দুষ্কর্ম কখনও করি নাই। তবে কি মহাপাপের জন্য আজ আমার এ ভীষণ দণ্ড, আজ এ ঘোর নরক! বিনা দোষে কত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা সহিয়াছি। গ্রামের লোকে বিধিমত উৎপীড়ন করিল, তাহাও সহিলাম। প্রাণের পুতলী তুমি কঙ্কাবতী জলে ডুবিয়া মরিলে, তাহাও সহিলাম। প্রাণের অধিক মা আমার আজ মরিলেন, তাহাও সহিলাম। কিন্তু এই সংকট সময়ে তুমি যে আমার শত্রুতা সাধিবে, স্বপ্নেও তাহা কখনও ভাবি নাই! মাতার মৃতদেহ একেলা আমি আর বহিতে পারিতেছি না। মাতার পীড়ার জন্য আজ তিন দিন আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আজ তিন দিন এক বিন্দু জল পর্যন্ত আমি খাই নাই। শরীরে আমার শক্তি নাই, শরীর আমার অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর একটি পা-ও আমি মাকে লইয়া যাইতে পারিতেছি না। কি করি, ভাবিয়া আকুল হইয়াছি। এমন সময়ে কি না, তুমি কঙ্কাবতী, ভূত হইয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসিলে! দুঃখের এইবার আমার চারি পো হইল! এ দুঃখ আমি আর সহিতে পারি না।"

কাঁদ কাঁদ স্বরে অধোমুখে কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আমি ভূত হই নাই, আমি মরি নাই, আমি জীবিত আছি।"

আশ্চর্য হইয়া খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি জীবিত আছ? জলে ডুবিয়া গেলে, তোমায় আমরা কত অনুসন্ধান করিলাম। তোমাকে খুঁজিয়া পাইলাম না। মনে করিলাম, আমিও মরি। মরিবার নিমিত্ত জলে ঝাঁপ দিলাম। সাঁতার জানিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া জলের ভিতর রহিলাম, কিছুতেই উঠিলাম না। তাহার পর জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম। অজ্ঞান অবস্থায় জেলেরা আমাকে তুলিল, তাহারা আমাকে বাঁচাইল। জ্ঞান হইয়া দেখিলাম, মা আমার কাঁদিতেছেন! মার মুখপানে চাহিয়া প্রাণ ধরিয়া রহিলাম। কঙ্কাবতী! তুমি কি করিয়া বাঁচিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "সে অনেক কথা। সকল কথা পরে বলিব। আমি গোয়ালিনী মাসীর বাটীতে ছিলাম। এই ঘোর বিপদের কথা সেইখানে শুনিলাম। আমি থাকতে পারিলাম না, আমি ছুটিয়া আসিলাম। এক্ষণে চল, মাতাকে ঘাটে লইয়া যাই। তুমি একদিক্ ধর, আমি একদিক্ ধরি।"

এইপ্রকারে কঙ্কাবতী ও খেতু মাকে ঘাটে লইয়া যাইলেন। সেখানে গিয়া দুইজনে চিতা সাজাইলেন। মাকে উত্তমরূপে স্নান করাইলেন, নূতন কাপড় পরাইলেন। তাহার পর চিতার উপর তুলিলেন। চিতার উপর তুলিয়া দুইজনে মায়ের পা ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিলেন।

খেতু বলিলেন, "মা তুমি স্বর্গে চলিলে। দীনহীন তোমার এই পুত্রকে আশীর্বাদ কর, ধর্মপথ হইতে যেন কখনও বিচলিত না হই। সত্য যেন আমার ধ্যান, সত্য যেন আমার জ্ঞান, সত্য যেন আমার ক্রিয়া হয়। ধনলালসায় কি সুখ-লালসায় কি যশোলালসায় যেন সত্যপথ, ধর্মপথ কখনও পরিত্যাগ না করি। অজ্ঞান কপটাচারী জন-সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিমায় ভীরু নরাধমদিগের মত কম্পিত হইয়া যেন কর্তব্যে কখনও পরাঙ্মুখ না হই। হে মা, প্রাণ যায় যাউক! পুরুষ হইয়া যেন কখনও কাপুরুষ না হই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মা! তুমি স্বর্গে চলিলে, তোমার এই অনাথিনী কঙ্কাবতীর প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর। জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, মা যেন ধর্মে আমার মতি হয়, যেন ধর্ম আমার গতি হয়। অধিক আর মা, তোমাকে কি বলিব! কঙ্কাবতীর মনের কথা তুমি সকলই জান। কঙ্কাবতীর প্রাণ রক্ষা হউক না হউক, কঙ্কাবতীর ধর্ম রক্ষা হইবে। যদি এ-দিকের সূর্য ও-দিকে উদয় হন, যদি মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়, তবুও কঙ্কাবতী যদি সতী হয়, কঙ্কাবতীকে কেহ ধর্মচ্যুত করিতে পারিবে না। মনে মনে চিরকাল এই প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে, আজ আবার মা তোমার পা ছুঁইয়া মুখ ফুটিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলাম। হে মা, তোমার কঙ্কাবতী এখন পাগলিনী, তোমার কঙ্কাবতীর অপরাধ ক্ষমা কর।"

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, কি করিয়া চিতায় আগুন দিই? জনমের মত কি করিয়া মাকে বিদায় করি! আর মাকে দেখিতে পাইব না। এস কঙ্কাবতী, ভাল করিয়া আর একবার মার মুখখানি দেখিয়া লই।"

মুখের নিকট দাঁড়াইয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া খেতু মার চুলগুলি নাড়িতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন, "দেখ কঙ্কাবতী! কি স্থির শান্তিময়ী মুখশ্রী! মা যেন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। তোমার কি মনে পড়ে কঙ্কাবতী! ছেলে-বেলা যখন তুমি বিড়াল লইয়া খেলা করিতে? প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় যখন

তুমি পড়িতে পারিতে না? আমি তোমাকে কত বকিতাম, আর মা আমার উপর রাগ করিতেন, মা আমাকে যেরূপ ভালবাসিতেন সেরূপ তোমাকেও ভালবাসিতেন। আহা! কঙ্কাবতী, কি মা আমরা হারাইলাম।”

এই প্রকারে নানা খেদ করিয়া অবশেষে চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া খেতু অগ্নিকার্য করিলেন। চিতা ধুধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী ও খেতু নিকটে বসিয়া মাঝে মাঝে কাঁদেন, মাঝে মাঝে খেদ করেন, আর মাঝে মাঝে অন্যান্য কথাবার্তা কন। কি করিয়া জল হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, কঙ্কাবতী সেই সমুদয় কথা খেতুকে বলিলেন। খেতু মনে করিলেন, নানা দুঃখে কঙ্কাবতীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছে। দুঃখের উপর দুঃখ, এ আবার এক নূতন দুঃখ তাঁহার মনে উপস্থিত হইল। মনের কথা খেতু কিন্তু কিছু প্রকাশ করিলেন না।

মার সৎকার হইয়া যাইলে, দুইজনে নদীতে স্নান করিলেন।

তাহার পর খেতু বলিলেন, “কঙ্কাবতী, চল তোমাকে বাড়িতে রাখিয়া আসি।”

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, “পুনরায় আমি কি করিয়া বাড়ি যাই? বাবা আমাকে তিরস্কার করিবেন, দাদা আমাকে গালি দিবেন। আমি জলের ভিতর গিয়া মাছেদের কাছে থাকি। না হয়, গোয়ালিনী মাসীর ঘরে যাই।”

খেতু বলিলেন, “কঙ্কাবতী, সে কাজ করিতে নাই। তোমাকে বাড়ি যাইতে হইবে। যতই কেন দুঃখ পাও না, ঘরে থাকিয়া সহ্য করিতে হইবে। মনোযোগ করিয়া আমার কথা শুন। আর এখন বালিকার মত কথা কহিলে চলিবে না। ভীষণ মহাসাগরবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-তাড়িত জীর্ণ-দেহ সামান্য দুইখানি তরণীর ন্যায়, আমরা দুইজনে এই সংসার কর্তৃক তাড়িত হইতেছি। তাই কঙ্কাবতী, বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কথা বলিতে হইবে, বুদ্ধি বিবেচনার সহিত আমাদের কাজ করিতে হইবে। মাতার পদ-যুগল ধরিয়া আজ রাত্রিতে যেরূপ ধীর জ্ঞান-গম্ভীর বাক্য তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল, এখন হইতে সেইরূপ কথা আমি তোমার মুখে শুনিতে চাই। ভাবী ঘটনার উপর মনুষ্যদিগের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকুক, অনেক পরিমাণে আছে। তা না হইলে, ভাবী ফলের প্রতীক্ষায় কৃষক কেন ক্ষেত্রে কর্ম-বীজ বপন করিবে? উদ্যম উৎসাহের সহিত মনুষ্য এই সংসার-

ক্ষেত্রে কর্ম-বীজ কেন রোপণ করিবে? মনুষ্যের অজ্ঞানতাবশতঃ ভাবী ঘটনার উপর কর্তৃত্বের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। এই ভাবী ফলপ্রতীক্ষাই মনুষ্যের আশা ভরসা। সেই আশা ভরসাকে সহায় করিয়া আজ আমি তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। তুমি বাড়ি চল, তোমাকে বাড়িতে রাখিয়া আসি। বাটীর বাহিরে তুমি পা রাখিয়াছ বলিয়া, জনার্দন চৌধুরী আর তোমাকে বিবাহ করিবেন না। সত্বর অন্য পাত্র সংঘটন হওয়াও সম্ভব নয়। তোমার পিতা ভ্রাতা যাহা কিছু তোমার লাঞ্ছনা করেন, এক বৎসর কাল পর্যন্ত সহ্য করিয়া থাক। শুনিয়াছি, পশ্চিম অঞ্চলে অধিক বেতনে কর্ম পাওয়া যায়। আমি এক্ষণে পশ্চিমে চলিলাম। কাশীতে মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া কর্মের অনুসন্ধান করিব। এক বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি, তাহা আনিয়া তোমার পিতাকে দিব। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তখন তোমার পিতা আহ্লাদের সহিত আমার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিবেন। কেবল এক বৎসর, কঙ্কাবতী, দেখিতে দেখিতে যাইবে। দুঃখে হউক, সুখে হউক, ঘরে থাকিয়া, কোনও রূপে এই এক বৎসর কাল অতিবাহিত কর।”

তখন কঙ্কাবতী বলিলেন, “তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, আমি সেইরূপ করিব।”

দুইজনে ধীরে ধীরে গ্রামাভিমুখে চলিলেন। রাত্রি সম্পূর্ণ প্রভাত হয় নাই, এমন সময় দুইজনে তনু রায়ের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খেতু বলিলেন, “কঙ্কাবতী, তবে এখন আমি যাই। সাবধানে থাকিবে।”

যাই যাই করিয়াও খেতু যাইতে পারেন না। যাইতে খেতুর পা সরে না। দুইজনের চক্ষুর জলে তনু রায়ের দ্বার ভিজিয়া গেল।

একবার সাহসে ভর করিয়া খেতু কিছুদূর যাইলেন, কিন্তু পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, আর বলিলেন, “কঙ্কাবতী, একটি কথা তোমাকে ভাল করিয়া বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কথাটি এই যে অতি সাবধানে থাকিও।”

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইজনে কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল, চারিদিকে লোকের সাড়া-শব্দ হইতে লাগিল।

তখন খেতু বলিলেন, “কঙ্কাবতী, এইবার আমি নিশ্চয় যাই। অতি সাবধানে থাকিবে। কাঁদিও কাটিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি তো এক

বৎসর পরে নিশ্চয় আমি আসিব। তখন আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিবে। তোমার মাকে সকল কথা বলিও, অন্য কাহাকেও কিছু বলিবার আবশ্যক নাই।"

খেতু এইবার চলিয়া গেলেন। যতদূর দেখা যাইল, ততদূর কঙ্কাবতী সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর চক্ষুর জলে তিনি পৃথিবী অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ার ভয়ে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে তিনি ঠেশ দিয়া দাঁড়াইলেন। খেতু ফিরিয়া দেখিলেন যে, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কঙ্কাবতী দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার পর আর দেখিলেন না।

খেতু ভাবিলেন, হা জগদীশ্বর, মনুষ্য-হৃদয় তুমি কি পাষাণ দিয়াই নির্ম্মাণ করিয়াছ যে, ওই প্রভাহীনা মলিনা কাঞ্চন-প্রতিমাকে ওখানে ছাড়িয়া এখানে আমার হৃদয় এখনও চূর্ণবিচূর্ণ হয় নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঘ

খেতু চলিয়া যাইলে, দ্বারের পাশে প্রাচীরে ঠেশ দিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দ্বার ঠেলিতে তাঁহার সাহস হইল না। অবশেষে সাহসে বুক বাঁধিয়া, আস্তে আস্তে তিনি দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন।

শয্যা হইতে উঠিয়া, বাটীর ভিতর বসিয়া, তনু রায় তামাক খাইতেছিলেন। কে দ্বার ঠেলিতেছে দেখিবার নিমিত্ত তিনি দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতী।

কঙ্কাবতীকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এ কি? কঙ্কাবতী যে, তুমি মর নাই? তাই বলি, তোমার কি আর মৃত্যু আছে? এতদিন কোথায় ছিলে? আজ কোথা হইতে আসিলে? এতদিন যেখানে ছিলে পুনরায় সেইখানে যাও। আমার ঘরে তোমার আর স্থান হইবে না।"

কঙ্কাবতী বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। সেই মলিন আর্দ্রবস্ত্র-পরিহিতা থাকিয়া দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার কথায় কোনও উত্তর করিলেন না।

পিতার তর্জন-গর্জনের শব্দ পাইয়া, পুত্রও সত্বর সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভাই বলিলেন, "এই যে, পাপীয়সী কালামুখ নিয়ে ফের এখানে এসেছেন, যাবেন আর কোন্ চুলো। কিন্তু তা হবে না, এ বাড়ি হইতে তোমার অন্ন উঠিয়াছে। এখন আর মনে করিও না যে, জনার্দন চৌধুরী তোমাকে বিবাহ করিবে। বাবা, পাড়ার লোক জানিতে না জানিতে কুলাঙ্গারী পাপীয়সীকে দূর করিয়া দাও।"

বচসা শুনিয়া কঙ্কাবতীর দুই ভগিনী বাহিরে আসিলেন। অবশেষে মাও আসিলেন। মা দেখিলেন, দুঃখিনী কঙ্কাবতী দীন দরিদ্র মলিন বেশে দ্বারে পাশে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী ও পুত্র বিধিমতে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন।

কঙ্কাবতীর মা কাহাকেও কিছু বলিলেন না। স্বামী কি পুত্র কাহারও

পানে একবার চাহিলেন না। কঙ্কাবতীর বক্ষঃস্থল একবার আপনার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া গদগদ মৃদুভাষে বলিলেন, "এস, আমার মা এস, দুঃখিনী মাকে ভুলিয়া এতদিন কোথা ছিলে মা?"

মার বুকে মাথা রাখিয়া কঙ্কাবতীর প্রাণ জুড়াইল। অন্তরে অন্তরে যে খরতর অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতেছিল, সে অগ্নি এখন অনেকটা নির্বাণ হইল।

তাহার পর মা কঙ্কাবতীর হাত ধরিলেন। অপর হাত দিয়া আর একটি মেয়ের হাত ধরিলেন। স্বামী ও পুত্রকে তখন সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কঙ্কাবতীকে দূর করিয়া দিবে? কঙ্কাবতীকে ঘরে স্থান দিবে না? বটে, এ দুধের বাছা কি হেন দুষ্কর্ম করিয়াছে যে, মা বাপের কাছে ইহার স্থান হইবে না? মান-সম্ভ্রম, পুণ্য ধর্ম লইয়া তোমরা এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। আমরা চারিজন হতভাগিনী এখান হইতে বিদায় হই। এস মা, আমরা সকলে এখান হইতে যাই। দ্বারে দ্বারে আমরা মুষ্টিভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু এই মুনি-ঋষিদের অন্ন আর খাইব না।"

তিন কন্যা ও মাতা, সত্য সত্যই বাটী হইতে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন তনু রায়ের মনে ভয় হইল।

তনু রায় বলিলেন, "গৃহিণী, কর কি? তুমিও যে পাগল হইলে দেখিতেছি। এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? এ মেয়ের কি আর বিবাহ হইবে? সেইজন্য বলি ওর যেখানে দুইচক্ষু যায় সেইখানে ও যাক, ওর কথায় আর আমাদের থাকিয়া কাজ নাই।"

তনু রায়ের স্ত্রী বলিলেন, "কঙ্কাবতীর বিবাহ হইবে না? আচ্ছা, সে ভাবনা তোমার ভাবিয়া কাজ নাই। সে ভাবনা আমি ভাবিব। কিন্তু তোমার তো প্রকৃত সে চিন্তা নয়! তোমার চিন্তা যে, জনার্দন চৌধুরীব টাকাগুলি হাত-ছাড়া হইল। যাহা হউক, তোমার গলগ্রহ হইয়া আর আমরা থাকিব না। যেখানে আমাদের দু-চক্ষু যায়, আমরা চারিজনে সেইখানে যাইব। মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া দ্বারে দ্বারে আমি ভিক্ষা করিব।"

স্ত্রীর এইরূপ উগ্র মূর্তি দেখিয়া তনু রায় ভাবিলেন, ঘোর বিপদ! নানারূপ মিষ্ট বচন বলিয়া স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। স্ত্রীর অনেকটা

রাগ পড়িয়া আসিলে শেষে তনু রায় বলিলেন, "দেখ! পাগলের মত কথা বলিও না। যাও বাড়ির ভিতর যাও। যাও মা কঙ্কাবতী, বাড়ির ভিতর যাও।"

মা, কঙ্কাবতী ও ভগিনী দুইটি বাড়ির ভিতর যাইলেন। কঙ্কাবতী পুনরায় বাপ মার নিকট রহিলেন। বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সমুদয় কথা কঙ্কাবতী মাকে বলিলেন, কঙ্কাবতী নিজে, কি কঙ্কাবতীর মা, এ সমুদয় কথা অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

কঙ্কাবতীকে তনু রায় সর্বদাই ভর্ৎসনা করেন, সর্বদাই গঞ্জনা দেন। কঙ্কাবতী সে কথায় কোনও উত্তর করেন না, অধোবদনে চুপ করিয়া শুনেন।

তনু রায় বলেন, "এমন রাজা হেন পাত্রের সহিত তোমার বিবাহ স্থির করিলাম। তোমার কপাল সুখ নাই, তা আমি কি করিব? জনার্দন চৌধুরীকে কত বুঝাইয়া বলিলাম, কিন্তু তিনি আর বিবাহ করিবেন না। এখন এ কন্যা লইয়া আমি কি করি? পঞ্চাশ টাকা দিয়াও কেহ এখন ইহাকে বিবাহ করিতে চায় না।"

স্ত্রী-পুরুষে মাঝে মাঝে এই কথা লইয়া বিবাদ হয়। স্ত্রী বলেন, "কঙ্কাবতীর বিবাহের জন্য তোমাকে চিন্তা করিতে হইবে না। এক বৎসর কাল চুপ করিয়া থাক। কঙ্কাবতীর বিবাহ আমি নিজে দিব। যদি আমার কথা না শুন, যদি অধিক বাড়াবাড়ি কর, তাহা হইলে মেয়ে তিনটির হাত ধরিয়া তোমার বাটী হইতে চলিয়া যাইব।"

তনু রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন। স্ত্রীকে এখন তিনি ভয় করেন, এখন স্ত্রীকে যা-ইচ্ছা তাই বলিতে বড় সাহস করেন না।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। খেতুর দেখা নাই, খেতুর কোনও সংবাদ নাই। কঙ্কাবতীর মুখ মলিন হইতে মলিনতর হইতে লাগিল, কঙ্কাবতীর মার মনে ঘোর চিন্তার উদয় হইল। কঙ্কাবতীর বিবাহ বিষয়ে স্বামী কোনও কথা বলিলে এখন আর তিনি পূর্বের ন্যায় দম্ভের সহিত উত্তর করিতে সাহস করেন না। বৎসর শেষ হইয়া যতই দিন গত হইতে লাগিল, তনু রায়ের তিরস্কার ততই বাড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতীর মা অপ্রতিভ হইয়া থাকেন, বিশেষ কোনও উত্তর দিতে পারেন না।

এক দিন সন্ধ্যার পর তনু রায় বলিলেন, "এত বড় মেয়ে হইল, এখন এ মেয়ে লইয়া আমি করি কি? সুপাত্র ছাড়িয়া কুপাত্র মিলাও দুর্ঘট হইল।"

কঙ্কাবতীর মা উত্তর করিলেন, "আজ এক বৎসর অপেক্ষা করিলে, আর অল্পদিন অপেক্ষা কর। সুপাত্র শীঘ্রই মিলিবে।"

তনু রায় বলিলেন, "এক বৎসর ধরিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ। কোথা হইতে তোমার সুপাত্র আসিবে, তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম। সে দিন যদি কুলাঙ্গারীকে দূর করিয়া দিতাম, তাহা হইলে আজ আমাকে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন দেখিতেছি, সে কালের রাজারা যা করিতেন আমাকেও তাই করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ না হয়, চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। মনুষ্য না হয়, জীব জন্তুর সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে। আমি সত্য বলিতেছি, যদি এই মুহূর্তে বনের বাঘ আসিয়া কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তো আমি তাহার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিই। যদি এই মুহূর্তে, বাঘ আসিয়া বলে, রায় মহাশয়, দ্বার খুলিয়া দিন, তো আমি তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিই।"

এই কথা বলিতে না বলিতে, বাহিরে ভীষণ গর্জনের শব্দ হইল। গর্জন করিয়া কে বলিল, "রায় মহাশয়, তবে কি দ্বার খুলিয়া দেবেন?"

সেই শব্দ শুনিয়া তনু রায় ভয় পাইলেন, কিসে এরূপ গর্জন করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিবার নিমিত্ত আস্তে আস্তে দ্বার খুলিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখেন না, সর্বনাশ! এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাহিরে দণ্ডায়মান!

ব্যাঘ্র বলিলেন, "রায় মহাশয়! এই মাত্র আপনি সত্য করিলেন যে, ব্যাঘ্র আসিয়া যদি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে ব্যাঘ্রের সহিত আপনি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবেন। তাই আমি আসিয়াছি, এক্ষণে আমার সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিন, না দিলে এই মুহূর্তে আপনাকে খাইয়া ফেলিব।"

তনু রায় অতি ভীত হইয়াছিলেন সত্য, ভয়ে এক প্রকার হতজ্ঞান হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তবুও আপনার ব্যবসায়টি বিস্মরণ হইতে পারেন নাই।

তনু রায় বলিলেন, "যখন কথা দিয়াছি, তখন অবশ্যই আপনার সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। আমার কথার নড়-চড় নাই। মুখ হইতে একবার কথা বাহির করিলে, সে কথা আর আমি কখনও অন্যথা করি না। তবে আমার নিয়ম তো জানেন? আমার কুল-ধর্ম রক্ষা করিয়া যদি আপনি বিবাহ করিতে পারেন তো করুন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত হইলে আপনার কুল-ধর্ম রক্ষা হয়?"

তনু রায় বলিলেন, "আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জল খাই না। এরূপ ব্রাহ্মণের জামাতা হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। আমার জামাতা হইতে যদি মহাশয়ের অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আপনাকে আমার সম্মান রক্ষা করিতে হইবে। মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন, "তা বিলক্ষণ জানি। এখন কত টাকা পাইলে মেয়ে বেচিবেন তা বলুন।"

তনু রায় বলিলেন, "এ গ্রামের জমিদার মান্যবর শ্রীযুক্ত জনার্দন চৌধুরী মহাশয়ের সাহত আমার কন্যার সম্বন্ধ হইয়াছিল; দৈব ঘটনা-বশতঃ কার্য সমাধা হয় নাই। চৌধুরী মহাশয় নগদ দুই সহস্র টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তিান মনুষ্য, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি। আপনি তাহার কিছুই নন; সুতরাং আপনাকে কিছু অধিক দিতে হইবে।"

ব্যাঘ্র বলিলেন, "বাটীর ভিতর চলুন। আপনাকে আমি এত টাকা দিব যে, আপনি কখনও চক্ষে দেখেন নাই, জীবনে স্বপনে কখনও ভাবেন নাই।"

এই কথা বলিয়া তর্জন গর্জন করিতে করিতে, ব্যাঘ্র বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তনু রায়ের মনে তখন বড় ভয় হইল। তনু রায় ভাবিলেন, এইবার বুঝি সপরিবারে খাইয়া ফেলে। নিরুপায় হইয়া তিনিও ব্যাঘ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর ভিতরে যাইলেন।

বাহিরে ব্যাঘ্রের গর্জন শুনিয়া, এতক্ষণ কঙ্কাবতী, কঙ্কাবতীর মাতা ও ভগিনীগণ ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়াছিল। তনু রায়ের পুত্র তখন ঘরে ছিলেন না, বেড়াইতে গিয়াছিলেন। গুণবিশিষ্ট পুত্র, তাই অনেক রাত্রি না হইলে তিনি বাটী ফিরিয়া আসেন না।

যেখানে কঙ্কাবতী প্রভৃতি বসিয়াছিলেন, ব্যাঘ্র গিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে সকলের সম্মুখে তিনি একটি বৃহৎ টাকার তোড়া ফেলিয়া দিলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন, "খুলিয়া দেখুন, ইহার ভিতরে কি আছে।"

তনু রায় তোড়াটি খুলিলেন ; দেখিলেন, তাহার ভিতর কেবল মোহর ! হাতে করিয়া, চশমা নাকে দিয়া, আলোর কাছে লইয়া, উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মেকি মোহর নয়, প্রকৃত স্বর্ণমুদ্রা। সকলেই আশ্চর্য হইলেন যে, এত টাকা বাঘ কোথা হইতে আনিল? তনু রায়ের মনে আনন্দ আর ধরে না।

তনু রায় ভাবিলেন, "এত দিন পরে এইবার আমি মনের মত জামাই পাইলাম।"

প্রদীপের কাছে লইয়া তনু রায় মোহরগুলি গণিতে লাগিলেন।

এই অবসরে, ব্যাঘ্র ধীরে ধীরে কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতার নিকট গিয়া বলিলেন, "কোনও ভয় নাই!"

কঙ্কাবতী ও কঙ্কাবতীর মাতা চমকিত হইলেন। কার সে কণ্ঠস্বর, তাহা তাঁহারা সেই মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। সেই কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাদের প্রাণে সাহস হইল। কেবল সাহস কেন ? তাঁহাদের মনে অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। কঙ্কাবতীর মাতা মৃদুভাবে বলিলেন, "হে ঠাকুর ! যেন তাহাই হয়!"

ব্যাঘ্র এই কথা বলিয়া, পুনরায় তনু রায়ের নিকটে গিয়া থাবা পাতিয়া বসিলেন। তোড়ার ভিতর হইতে তনু রায় তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা গণিয়া পাইলেন।

ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে এখন ?"

তনু রায় উত্তর করিলেন, "এখন আর কি? যখন কথা দিয়াছি, তখন এই রাত্রিতেই আপনার সাহত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব। সে জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। আর মনে করিবেন না যে, ব্যাঘ্র বলিয়া আপনার প্রতি আমার কিছুমাত্র অভক্তি হইয়াছে। না না, আমি সে প্রকৃতির লোক নই। কাহারে কিরূপ মান-সম্ভ্রম করিতে হয়, তাহা আমি ভালরূপ বুঝি। জনার্দন চৌধুরী দূরে থাকুক, যদি জনার্দন চৌধুরীর বাবা আসিয়া আজ আমার পায়ে ধরে, তবুও আপনাকে ফেলিয়া তাহার সহিত আমি কঙ্কাবতীব বিবাহ দিই না।"

তাহার পর তনু রায় স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমার কথায় উপর কথা কইও না; তাহা হইলে অনর্থ ঘটিবে; আমি নিশ্চয় ইহাকে কন্যা সম্প্রদান করিব। ইহার মত সুপাত্র আর পৃথিবীতে পাইব না। এ বিষয়ে আমি কাহারও কথা শুনিব না। যদি তোমরা কান্নাকাটি কর, তাহা হইলে এই ব্যাঘ্র মহাশয়কে বলিয়া দিব, ইনি এখনই তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবেন।"

তনু রায়ের স্ত্রী উত্তর করিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আমি কোনও কথায় থাকিব না।"

যাঁহার টাকা আছে, তাঁহার কিসের ভাবনা? সেই দণ্ডেই তনু রায় পুত্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। সেই দণ্ডেই প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই দণ্ডেই নাপিত পুরোহিত আসিলেন। সেই দণ্ডেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন হইল।

সেই রাত্রিতেই ব্যাঘ্রের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহকার্য সমাধা হইল। প্রকাণ্ড বনের বাঘকে জামাই করিয়া কার না মনে আনন্দ হয়? আজ তনু রায়ের মনে তাই আনন্দ ধরে না।

প্রতিবাসীদিগকে তিনি বলিলেন, "আমার জামাইকে লইয়া তোমরা আমোদ-আহ্লাদ করিবে। আমার জামাই যেন মনে কোনও রূপ দুঃখ না করেন।"

জামাইকে তনু রায় বলিলেন, "বাবাজি! বাসর ঘরে গান গাহিতে হইবে। গান শিখিয়া আসিয়াছ তো? এখানে কেবল হালুম হালুম করিলে চলিবে না। শালী শালাজ তাহা হইলে কান মলিয়া দিবে। বাঘ বলিয়া তাহারা ছাড়িয়া কথা কবে না।

বর না চোর! ব্যাঘ্র ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। বাসর ঘরে গান গাহিয়াছিলেন কি না, সে কথা শালী-শালাজ ঠানদিদিরা বলিতে পারেন। আমরা কি করিয়া জানিব?

প্রভাত হইবার পূর্বে ব্যাঘ্র তনু রায়কে বলিলেন, "মহাশয়, রাত্রি থাকিতে থাকিতে জন-সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বনে আমাকে পুনরাগমন করিতে হইবে। অতএব আপনার কন্যাকে সুসজ্জিতা করিয়া আমার সহিত পাঠাইয়া দিন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

প্রতিবাসিনীগণ কঙ্কাবতীর চুল বাঁধিয়া দিলেন। কঙ্কাবতীর মাতা কঙ্কাবতীর ভাল কাপড়গুলি বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিলেন।

তাহা দেখিয়া তনু রায় আরক্ত-নয়নে স্ত্রীকে বলিলেন, "তোমার মত নির্বোধ আর এ পৃথিবীতে নাই। যাহার ঘরে এরূপ লক্ষ্মী-ছাড়া স্ত্রী, তাহার কি কখনও ভাল হয়? বাঘের কিসের অভাব? কাপড়ের দোকানে গিয়া হালুম করিয়া পড়িবে, দোকানী দোকান ফেলিয়া পলাইবে, আর বাঘ কাপড়ের গাঁঠরি লইয়া চলিয়া যাইবে। স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া বাঘ হালুম করিয়া পড়িবে, প্রাণের দায়ে স্বর্ণকার পলাইবে, আর বাঘ গহনাগুলি লইয়া চলিয়া যাইবে। দেখিয়া শুনিয়া যখন এরূপ সুপাত্রের হাতে কন্যা দিলাম, তখন আবার কঙ্কাবতীর সঙ্গে ভাল কাপড়-চোপড় দেওয়া কেন? তাই বলি তোমার মত বোকা আর এ ভূ-ভারতে নাই।"

তনু রায় লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, বৃথা অপব্যয় একেবারে দেখিতে পারেন না। যখন, তাঁহার মাতার ঈশ্বর-প্রাপ্তি হয়, তখন মাতা বিছানায় শুইয়া ছিলেন। নাভিশ্বাস উপস্থিত হইলে, মাকে তিনি কেবল মাত্র একখানি ছেঁড়া মাদুরে শয়ন করাইলেন। নিতান্ত পুরাতন নয় এরূপ একখানি বস্ত্র তখন তাঁহার মাতা পরিয়া ছিলেন। কণ্ঠ-শ্বাস উপস্থিত হইলে সেই বস্ত্রখানি তনু রায় খুলিয়া লইলেন। আর একখানি জীর্ণ ছিন্ন গলিত নেকড়া পরাইয়া দিলেন। এইরূপ টানা হেঁচড়া করিতে ব্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, মৃত্যুসময়ে তিনি মাতার মুখে এক বিন্দু জল দিতে অবসর পান নাই। কাপড় ছাড়াইয়া ভক্তিভাবে যখন পুনরায় মাকে শয়ন করাইলেন, তখন দেখিলেন যে মার অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে।

স্বামীর তিরস্কারে তনু রায়ের স্ত্রী দুই একখানি ছেঁড়া-খোঁড়া নেকড়া-চোকড়া লইয়া একটি পুঁটুলি বাঁধিলেন। সেইটি কঙ্কাবতার হাতে দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, ঠাকুরদের ডাকিতে ডাকিতে, কন্যাকে বিদায় দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বনে

পুঁটুলি হাতে করিয়া, কঙ্কাবতী ব্যাঘ্রের নিকট আসিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন। ব্যাঘ্র মধুর ভাষে বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি বালিকা। পথ চলিতে পারিবে না। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর, আমি তোমাকে লইয়া যাই। তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না।"

কঙ্কাবতী গাছ-কোমর বাঁধিয়া বাঘের পিঠের উপর চড়িয়া বসিলেন। ব্যাঘ্র বলিলেন, "কঙ্কাবতী, আমার পিঠের লোম তুমি দৃঢ়রূপে ধর। দেখিও, যেন পড়িয়া যাইও না।"

কঙ্কাবতী তাহাই করিলেন। ব্যাঘ্র বনাভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিলেন।

বিজন অরণ্যের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, তোমার কি ভয় করিতেছে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "তোমার সহিত যাইব, তাতে আবার আমার ভয় কি?"

কঙ্কাবতী এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু একেবারেই যে তাঁহার ভয় হয় নাই, তাহা নহে। বাঘের পিঠে তিনি আর কখনও চড়েন নাই, এই প্রথম। সুতরাং ভয় হইবার কথা।

ব্যাঘ্র বলিলেন, "কঙ্কাবতী, কেন আমি বাঘ হইয়াছি, সে কথা তোমাকে পরে বলিব। এ দশা হইতে শীঘ্রই আমি মুক্ত হইব, সেজন্য তোমার কোনও চিন্তা নাই। এখন কোনও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুইজনে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বৃহৎ এক অত্যুচ্চ পর্বতের নিকট গিয়া দুইজনে উপস্থিত হইলেন।

ব্যাঘ্র বলিলেন, "কঙ্কাবতী! কিছুক্ষণের নিমিত্ত তুমি চক্ষু বুজিয়া থাক। যতক্ষণ না আমি বলি ততক্ষণ চক্ষু চাহিও না।"

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরে খল খল করিয়া বিকট হাসির শব্দ কঙ্কাবতীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিকট, কি ভয়ানক হাসি! ওরূপ করিয়া কে হাসিল?"

বাঘ উত্তর করিলেন, "সে কথা সব তোমাকে পরে বলিব। এখন শুনিয়া কাজ নাই। এখন তুমি চক্ষু উন্মীলন কর, আর কোনও ভয় নাই।"

কঙ্কাবতী চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন যে, এক মনোহর অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত, বহুমূল্য মণি-মুক্তায় অলংকৃত, অতি সুরম্য অট্টালিকা। ঘরগুলি সুন্দর, পরিষ্কৃত, নানা ধনে পরিপূরিত, নানা সাজে সুসজ্জিত। রজত, কাঞ্চন, হীরা, মানিক, মুকুতা, চারিদিকে রাশি রাশি স্তূপাকারে রহিয়াছে দেখিয়া কঙ্কাবতী মনে মনে অদ্ভুত মানিলেন। অট্টালিকা কিন্তু পর্বতের অভ্যন্তরে স্থিত। বাহির হইতে দেখা যায় না। পর্বত-গাত্রে সামান্য একটি নিবিড় অন্ধকারময় সুড়ঙ্গ দ্বারা কেবল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। পর্বতের শিখরদেশ হইতে অট্টালিকার ভিতর আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু আলোক আসিবার পথও এরূপ কৌশলভাবে নিবেশিত ও লুক্কায়িত আছে যে, সে পথ দিয়া ভূচর খেচর কেহ অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না; অট্টালিকার ভিতর হইতে কেহ বাহিরে যাইতেও পারে না। অট্টালিকার ভিতর বসন, ভূষণ, পালঙ্ক প্রভৃতি কোনও দ্রব্যের অভাব নাই। নাই কেবল আহারীয় সামগ্রী।

অট্টালিকার ভিতর উপস্থিত হইয়া ব্যাঘ্র বলিলেন, "কঙ্কাবতী! এখন তুমি আমার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ কর। একটুখানি এখইানে বসিয়া থাক, আমি আসিতেছি। কিন্তু সাবধান! এখানকার কোনও দ্রব্যে হাত দিও না, কোনও দ্রব্য লইও না। যাহা আমি হাতে করিয়া দিব, তাহাই তুমি লইবে, আপনা আপনি কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিবে না।"

এইরূপ সতর্ক করিয়া ব্যাঘ্র সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে খেতু আসিয়া কঙ্কাবতীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, আমাকে চিনিতে পার?"

কঙ্কাবতী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

খেতু পুনরায় বলিলেন, "কঙ্কাবতী এই বনের মাঝখানে আসিয়া তোমার কি ভয় করিতেছে?"

কঙ্কাবতী মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "না আমার ভয় করে নাই। তোমাকে দেখিয়া আমার ঘোমটা দেওয়া উচিত, লজ্জা করা উচিত। তাহা আমি পারিতেছি না। তাই আমি ভাবিতেছি, তুমি কি মনে করিবে!"

খেতু বলিলেন, "না কঙ্কাবতী, আমাকে দেখিয়া তোমার ঘোমটা দিতে

হইবে না, লজ্জা করিতে হইবে না। আমি কিছু মনে করিব না, তাহার জন্য তোমার ভাবনা নাই। আর এখানে কেবল তুমি আর আমি, অন্য কেহ নাই, তাতে লজ্জা করিলে চলিবে কেন? তাও বটে, আবার এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ নই। বিপদের আশঙ্কা বিলক্ষণ আছে।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিপদ?"

খেতু বলিতেন, "এখন সে কথা শুনিয়া তোমার কাজ নাই। তাহা হইলে ভয় পাইবে। এখন সে কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না। তবে, এখন তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি তুমি এখানকার দ্রব্যসামগ্রী স্পর্শ না কর তাহা হইলে কোনও ভয় নাই, কোনও বিপদ হইবার সম্ভাবনা নাই। যেটি আমি হাতে তুলিয়া দিব সেইটি লইবে; নিজ হাতে কোনও দ্রব্য হইবে না। একবৎসর কাল আমাদিগকে এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর এ সমুদয় ধনসম্পত্তি আমাদের হইবে। এই সমুদয় ধন লইয়া তখন আমরা দেশে যাইব। আচ্ছা কঙ্কাবতী, যখন আমি তোমাকে বিবাহ করি, তখন তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "তা আর পারি নি? এক বৎসর কাল তোমার জন্য পথপানে চাহিয়া ছিলাম। যখন একবৎসর গত হইয়া গেল, তখনও তুমি আসিলে না। তখন মা আর আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। মা যে কত কাঁদিতেন, আমি যে কত কাঁদিতাম, তা আর তোমাকে কি বলিব? কাল রাত্রিতে বাবা যখন বলিলেন যে, বাঘের সহিত আমি কঙ্কাবতীর বিবাহ দিব, আর সেই কথায় তুমি যখন বাহির হইতে বলিলে, তবে কি মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিবেন? সেই গর্জনের ভিতর হইতেও একটু যেন বুঝিলাম যে, সে কাহার কণ্ঠস্বর। তারপর আবার ঘরের ভিতর আসিয়া, যখন তুমি চুপি চুপি মার কানে ও আমার কানে বলিলে, কোনও ভয় নাই, তখন তো নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে তুমি বাঘ নও।"

খেতু বলিলেন, "অনেক দুঃখ গিয়াছে। কঙ্কাবতী, তুমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছ, আমিও অনেক দুঃখ পাইয়াছি। আর এক বৎসর কাল দুঃখ সহিয়া এইখানে থাকিতে হইবে। তাহার পর ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তো আমাদের সুখের দিন আসিবে। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাল কাটিয়া যাইবে। তখন এই সমুদয় ঐশ্বর্য আমাদের হইবে। আহা! মা নাই, এত ধন লইয়া যে কি করিব। তাই ভাবি মা যদি

বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে যাহা কিছু পুণ্যকর্ম আছে সমস্ত আমি মাকে করাইতাম। যাহা হউক পৃথিবীতে অনেক দীন-দুঃখী আছে। কঙ্কাবতী, এখন কেবল তুমি আর আমি। যতদূর পারি, দুই জনে জগতের দুঃখমোচন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিব।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতার সংকার কার্য সমাপ্ত করিয়া আমাকে বাটীতে রাখিয়া তাহার পর তুমি কোথায় যাইলে, কি করিলে? ফিরিয়া আসিতে তোমার এক বৎসরের অধিক হইল কেন? তুমি ব্যাঘ্রের আকার ধরিলে কেন? সে সব কথা তুমি আমাকে এখন বলিবে না?"

খেতু বলিলেন, "না কঙ্কাবতী, এখন নয়। এক বৎসর গত হইয়া যাক্, তাহার পর সব কথা তোমাকে বলিব।"

কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

কঙ্কাবতী ও খেতু, পর্বত-অভ্যন্তরে সেই অট্টালিকায় বাস করিতে লাগিলেন। অট্টালিকার কোনও দ্রব্য কঙ্কাবতী স্পর্শ করেন না। কেবল খেতু যাহা হাতে করিয়া দেন, তাহাই গ্রহণ করেন।

অট্টালিকার ভিতর সমুদয় দ্রব্য ছিল, কেবল খাদ্য-সামগ্রী ছিল না। প্রতিদিন বাহিরে যাইয়া খেতু বনের ফল-মূল লইয়া আসেন, তাহাই দুইজনে আহার করিয়া কালযাপন করেন। বাহিরে যাইতে হইলে, খেতু ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করেন। বাঘ না হইয়া খেতু বাহিরে কখনও যান না। আবার অট্টালিকার ভিতর আসিয়া, খেতু পুনরায় মনুষ্য হন। কেন তিনি বাঘের রূপ না ধরিয়া বাহিরে যান না, কঙ্কাবতী তাহা বুঝিতে পারেন না। খেতু মানা করিয়াছেন, সেজন্য জিজ্ঞাসা করিবারও জো নাই। এইরূপে দশমাস কাটিয়া গেল।

একদিন কঙ্কাবতী বলিলেন, "অনেকদিন মাকে দেখি নাই। মাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হয়। মাও আমাদের কোন সংবাদ পান নাই; মাও হয়তো চিন্তিত আছেন। আমরা কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, মা তাহার কিছুই জানেন না।"

খেতু উত্তর করিলেন, "অল্প দিনের মধ্যে পুনরায় দেশে যাইব, সেজন্য আর তাঁহাদিগকে কোনও সংবাদ দিই নাই। আর লোকালয়ে যাইতে হইলেই আমাকে বাঘ হইয়া যাইতে হইবে, সেজন্য আর যাইতে বড় ইচ্ছাও হয় না। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে, বলিতে তো পারা

যায় না। যাহা হউক, মাকে দেখিতে যখন তোমার সাধ হইয়াছে, তখন কাল তোমার এ সাধ পূর্ণ করিব। কাল সন্ধ্যার সময় মার নিকট তোমাকে আমি লইয়া যাইব। কঙ্কাবতী, বৎসর পূর্ণ হইতে আর কেবল দুই মাস আছে। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে এই দুই মাস তুমি না হয় বাপের বাড়ি থাকিও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "না, তা আমি থাকিতে চাই না। তুমি এই বনের ভিতর নানা বিপদের মধ্যে একেলা থাকিবে, আর আমি বাপের বাড়ি থাকিব, তা কি কখনও হয়? মার জন্য মন উতলা হইয়াছে, কেবল একবারখানি মাকে দেখিতে চাই। দেখা-শুনা করিয়া আবার তখন ফিরিয়া আসব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্বশুরালয়

তাহার পরদিন সন্ধ্যাবেলা, খেতু ব্যাঘ্রের রূপ ধরিয়া কঙ্কাবতীকে তাঁহার পিঠে চড়িতে বলিলেন। অট্টালিকা হইতে অনেকগুলি টাকা কড়ি লইয়া কঙ্কাবতীকে দিলেন, আর বলিলেন যে, "এই টাকাগুলি লইয়া তোমার মাতা, পিতা, ভাই ও ভগিনীদিগকে দিবে।"

অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া, দুইজনে অন্ধকারময় সুড়ঙ্গের পথে চলিলেন। সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার সময় খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, চক্ষু মুদ্রিত কর। যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ চাহিও না।"

কঙ্কাবতী চক্ষু বুজিলেন। পুনরায় সেই বিকট হাসি শুনিতে পাইলেন। সেই ভয়াবহ হাসি শুনিয়া আতঙ্কে তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল।

সুড়ঙ্গের বাহিরে আসিয়া বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া খেতু কঙ্কাবতীকে চক্ষু চাহিতে বলিলেন। ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে গ্রামের দিকে ছুটিল। প্রায় এক প্রহর রাত্রির সময়, ঝি-জামাতা, তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতীকে পাইয়া কঙ্কাবতীর মা যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। কঙ্কাবতীর ভগিনীগণও কঙ্কাবতীকে দেখিয়া পরম সুখী হইলেন। অনেক টাকা মোহর দিয়া ব্যাঘ্র তনু রায়কে নমস্কার করিলেন। শ্যালককেও তিনি অনেক টাকা-কড়ি দিলেন। ব্যাঘ্রের আদর রাখিতে আর স্থান হয় না।

মা পঞ্চোপচারে কঙ্কাবতীকে আহারাদি করাইলেন। তনু রায়ের ভাবনা হইল, "জামাতাকে কি আহার করিতে দিই?"

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে মনে বিচার করিয়া তনু রায় বলিলনে, "বাবাজি, এত পথ আসিয়াছ, ক্ষুধা অবশ্যই পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের ঘরে কেবল ভাত-ব্যঞ্জন আছে, আর কিছুই নাই। ভাত-ব্যঞ্জন কিছু তোমার খাদ্য নয়। তাই ভাবিতেছি, তোমাকে খাইতে দিই কি? তা তুমি এক কর্ম কর। আমার গোয়ালে একটি বৃদ্ধা গাভী আছে। সময়ে সে দুগ্ধবতী গাভী ছিল। এখন তাহার বৎস হয় না, এখন আর সে দুধ দেয় না। বৃথা কেবল বসিয়া খাইতেছে। তুমি সেই গাভীটিকে আহার কর। তাহা

হইলে তোমার উদর পূর্ণ হইবে; আমারও জামাতাকে আদর করা হইবে। আর মিছামিছি আমাকে খড় জোগাইতে হইবে না।"

ব্যাঘ্র বলিলেন, "না মহাশয়, আজ দিনের বেলায় আমি উত্তমরূপে আহার করিয়াছি। এখন আমার আর ক্ষুধা নাই, গাভীটি এখন আমি আহার করিতে পারিব না।"

তনু রায় বলিলেন, "আচ্ছা যদি তুমি গাভীটি না খাও, তাহা হইলে না হয় আর একটি কাজ কর। তুমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাও। তাহার সহিত আমার চিরবিবাদ। সে শাস্ত্র জানে না, তবু আমার সহিত তর্ক করে। তাহাকে আমি দুটি চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারি না। সে এ গ্রাম হইতে এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে মামার বাড়িতে গিয়া আছে। আমি তোমায় সব সন্ধান বলিয়া দিতেছি। তুমি স্বচ্ছন্দে গিয়া তাহাকে খাইয়া আইস।"

ব্যাঘ্র উত্তর করিলেন, "না মহাশয়, আজ রাত্রিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষুধা নাই। আজ রাত্রিতে আমি নিরঞ্জন কবিরত্নকে খাইতে পারিব না।"

তনু রায় পুনর্বার বলিলেন, "আচ্ছা। ততদূর যদি না যাইতে পার তবে এই গ্রামেই তোমার আমি খাবার ঠিক করিয়া দিতেছি। এই গ্রামে এক গোয়ালিনী আছে। মাগী বড় দুষ্ট। দু-বেলা আসিয়া আমার সঙ্গে ঝগড়া করে। তোমাকে কন্যা দিয়াছি বলিয়া মাগী আমাকে যা নয় তাই বলে। মাগী আমাকে বলে, অল্পায়ু, বুড়ো, ডেক্‌রা। টাকা নিয়ে কি না বাঘকে মেয়ে বেচে খেলি! তুমি আমার জামাতা, ইহার একটা প্রতিকার তোমাকে করিতে হইবে। তুমি তার ঘাড়টি ভাঙিয়া রক্ত খাও। তার রক্ত ভাল, খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।"

ব্যাঘ্র বলিল, "না মহাশয়, আজ আমি কিছু খাইতে পারিব না, আজ ক্ষুধা নাই।"

তনু রায় ভাবিলেন, জামাতারা কিছু লজ্জাশীল হন। বারবার খাও খাও বলিতে হয়, তবে কিছু খান। খাইতে বসিয়া এটি খাও, ওটি খাও, আর একটু খাও এইরূপে পাঁচজনে বারবার না বলিলে জামাতারা পেট ভরিয়া আহার করেন না। পাতে সব ফেলিয়া উঠিয়া যান। এদিকে জঠরানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ওদিকে মুখে বলেন, আর ক্ষুধা নাই, আর খাইতে পারি না। জামাতাদিগের রীতি এই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তনু রায় আবার বলিলেন, "শ্বশুরবাড়ি আসিয়া কিছু না খাওয়া কি ভাল? লোকে আমার নিন্দা করিবে। পাড়ার লোকগুলির কথা তোমাকে আর কি পরিচয় দিব? পাড়ার মেয়ে-পুরুষগুলি এক একটি সব অবতার। তামাশা দেখিতে খুব প্রস্তুত। পরের ভাল একটু দেখিতে পারেন না। তুমি আমার জামাতা হইয়াছ, যাহা হউক, তোমার দু-পয়সা সংগতি আছে, এই হিংসায় সকলে ফাটিয়া মরিতেছেন। এখনই কাল সকালে বলিবেন যে, তনু রায়ের জামাতা আসিয়াছিল, তনু রায় জামাতার কিছুমাত্র আদর করে নাই, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই। সেইজন্য কিছু খাইতে তোমাকে বারবার অনুরোধ করিতেছি। চল, গোয়ালিনীর ঘর তোমাকে দেখাইয়া দিই। সে দুধ-ঘি খায়। মাংস তাহার কোমল। তাহার মাংস তোমার মুখে ভাল লাগিবে। খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। মন্দ দ্রব্য কি তোমাকে খাইতে বলিতে পারি?"

বাঘ উত্তর করিল, "এবার মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন। এইবার যখন আসিব, তখন দেখা যাইবে।"

তনু রায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। জামাতা আদরের সামগ্রী। প্রাণ ভরিয়া আদর করিতে না পারিলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে ক্লেশ হয়। তিনি তিনটি সুখাদ্যের কথা বলিলেন, জামাতা কিন্তু একটিও খাইলেন না। তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কথা।

তনু রায় বলিলেন, "শ্বশুরবাড়িতে এরূপ খাইয়া দাইয়া আসিতে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ীর মন তাহাতে বুঝিবে কেন? জামাতা কিছু না খাইলে শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে দুঃখ হয়। এই আজ তুমি কিছু খাইলে না, সেজন্য তোমার শাশুড়ীঠাকুরাণী আমাকে কত বকিবেন। তিনি বলিবেন, তুমি জামাতাকে ভাল করিয়া বল নাই, তাই জামাতা আহার করিলেন না। এবার যখন আসিবে, তখন আহারাদি করিয়া এস না। এইখানে আসিয়া আহার করিবে। তোমার জন্য এই তিনটি খাদ্যসামগ্রী আমি ঠিক করিয়া রাখিলাম। এবার আসিয়া একবারেই তিনটিকে খাইতে হইবে। যদি না খাও, তাহা হইলে বনে যাইতে দিব না, তোমার চাদর ও ছাতি লুকাইয়া রাখিব। না না, ও কথা নয়; তোমার যে আবার ছাতি কি চাদর নাই। যদি না খাও, তাহা হইলে তোমার পর আমি রাগ করিব।"

কঙ্কাবতী সমস্ত রাত্রি মা ও ভগিনীদের সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র প্রকৃত কে তাহা মাতাকে বলিলেন। আর দুই মাস পরে তাঁহারা যে বিপুল ঐশ্বর্য লইয়া দেশে আসিবেন, তাহাও মাতাকে বলিলেন।

তনু রায় একবার কঙ্কাবতীকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "কঙ্কাবতী, বোধ হইতেছে যে, জামাতা আমার প্রকৃত ব্যাঘ্র নন্। বনের শিকড় মাথায় দিয়া মানুষে যে সেই বাঘ হয়, ইনি বোধ হয় তাই। আমি ইঁহাকে নানারূপ সুখাদ্য খাইতে বলিলাম, আমার গোয়ালের বুড়ো গরুটিকে খাইতে বলিলাম, নিরঞ্জনকে খাইতে বলিলাম, গোয়ালিনীকে খাইতে বলিলাম, কিন্তু ইনি ইহার একটিকেও খাইলেন না। যথার্থ বাঘ হইলে কি এসব লোভ সামলাইতে পারিতেন? তাই আমার বোধ হইতেছে, ইনি প্রকৃত বাঘ নন্। তুমি দেখিও দেখি? ইঁহার মাথায় কোনও রূপ শিকড় আছে কি না? যদি শিকড় পাও, তাহা হইলে সেই শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যদি লোকে মন্দ করিয়া থাকে তো শিকড়টি পোড়াইলে ভাল হইয়া যাইবে। যে কারণেই কেন বাঘ হইয়া থাকুন না, শিকডটি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সব ভাল হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় মানুষ হইয়া ইনি লোকালয়ে আসিবেন।"

পিতার এই উপদেশ পাইয়া কঙ্কাবতী যখন পুনরায় মার নিকট আসিলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনি তোমাকে চুপি চুপি কি বলিলেন?"

পিতা যেরূপ উপদেশ দিলেন, কঙ্কাবতী সেই সমস্ত কথা মার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

মা সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি এ কাজ কখনও করিবে না। করিলে নিশ্চয় মন্দ হইবে। খেতু অতি ধীর ও সুবুদ্ধি। খেতু যাহা করিতেছেন, তাহা ভালর জন্যই করিতেছেন। খেতুর আজ্ঞা তুমি কোনও মতেই অমান্য করিও না। সাবধান কঙ্কাবতী, আমি যাহা বলিলাম, মনে যেন থাকে!"

রাত্রি অবসান-প্রায় হইলে, খেতু ও কঙ্কাবতী পুনরায় বনে চলিলেন। পর্বতের নিকট আসিয়া, খেতু পূর্বের মত কঙ্কাবতীকে চক্ষু বুজিতে বলিলেন। সুড়ঙ্গ-দ্বারে পূর্বের মত কঙ্কাবতী সেই বিকট হাসি শুনিলেন। অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া পূর্বেব মত ইঁহারা দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

শিকড়

আর একমাস গত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, কেবল আর একমাস রহিল। এই একমাস পরে আমরা স্বাধীন হইব। আর একমাস গত হইয়া যাইলে আমাদিগকে আর বনবাসী হইয়া থাকিতে হইবে না। এই বিপুল বিভব লইয়া আমরা তখন দেশে যাইব।"

এক একটি দিন যায়, আর খেতু বলেন, "কঙ্কাবতী, আর উনত্রিশ দিন রহিল। কঙ্কাবতী, আর আটাইশ দিন রহিল। কঙ্কাবতী, আর সাতাইশ দিন রহিল।"

এইরূপে কুড়িদিন গত হইয়া গেল। কেবল আর দশদিন রহিল। দশদিন পরে কঙ্কাবতীকে লইয়া দেশে যাইবেন, সেজন্য খেতুর মনে অসীম আনন্দের উদয় হইল। খেতুর মুখে সদাই হাসি!

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি এক কর্ম কর। কয়লা দ্বারা এই প্রাচীরের গায়ে দশটি দাগ দিয়া রাখ। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া একটি করিয়া দাগ পুঁছিয়া ফেলিব, তাহা হইলে সম্মুখে সর্বদাই প্রত্যক্ষ দেখিব, ক-দিন আর বাকী রহিল।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর মন বড়ই আকুল হইয়াছে। প্রাচীরে তো দশটি দাগ দিলাম, যেমন এক একটি দিন যাইবে, তেমনি এক একটি দাগ তো মুছিয়া ফেলিলাম; তা তো সব হইবে। কিন্তু একদিনেই কি দশটি দিন মুছিয়া ফেলিতে পারি না? একদিনেই কি স্বামীর উদ্ধার করিতে পারি না? বাবা যা বলিয়া দিয়াছেন, তাই করিয়া দেখিলে তো হয়! আজ কি কাল যদি দেশে যাইতে পান, তাহা হইলে আমার স্বামীর মনে কতই না আনন্দ হইবে!

এই দুইমাসের মধ্যে, পিতার কথা তাঁহার অনেক বার স্মরণ হইয়াছিল। মন্দ লোকে তাঁহার স্বামীকে গুণ করিয়াছে, এই চিন্তা তাহার মনে বারবার উদয় হইয়াছিল। তবে মা বারণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেজন্য এতদিন তিনি কোনও রূপ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই। এক্ষণ দেশে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর ঘোরতর ব্যগ্রতা দেখিয়া কঙ্কাবতীর মন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, বাবা পুরুষ মানুষ। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, বাঘ-ভাল্লুক, শিকড়-মাকড়, তন্ত্র-মন্ত্র, এ সকলের কথা বাবা যত জানেন, মা তত কি করিয়া জানিবেন? মা মেয়ে মানুষ, ঘরের বাহিরে যান না। মা কি করিয়া জানিবেন যে, লোকে শিকড় দিয়া মন্দ করিলে তাহার কি উপায় করিতে হয়? শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিলেই সকল বিপদ্ কাটিয়া যায়, বাবা এই কথা বলিয়াছেন। এখনও দশদিন আছে, স্বামী আমার দিন গণিতেছেন। যদি কাল তিনি বাড়ি যাইতে পান তাহা হইলে তাঁর কত না আনন্দ হইবে!

এইরূপ কঙ্কাবতী সমস্ত দিন ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে ভাবেন,—কি জানি, পাছে ভাল করিতে গিয়া মন্দ হয়? কাজ নাই, এ দশটা দিন চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকি। বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, মা তাহা বারণ করিয়াছেন।

আবার ভাবেন, দুষ্টেরা আমার স্বামীর মন্দ করিয়াছে। দুষ্টদিগের দুরভিসন্ধি হইতে স্বামীকে আমি মুক্ত করিব। আমি যদি স্বামীকে মুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি কত না আমার উপর পরিতুষ্ট হইবেন।

ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। কি করিবেন, কঙ্কাবতী কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। রাত্রিতেও কঙ্কাবতী এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিলকসুন্দরী ও ভুশকুমড়োর গল্প মনে পড়িল।

রাজপুত্র, তিলকসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলকসুন্দরীকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মন হইয়াছিল। তিলকসুন্দরীর সৎ-মা তাঁহার মাথায় একটি শিকড় দিয়া দিলেন। শিকড়ের গুণে তিলকসুন্দরী পক্ষী হইয়া গেল। উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে বসিল। সৎ-মা কৌশল করিয়া আপনার কন্যা ভুশকুমড়োর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন। ভুশকুমড়োকে রাজপুত্র আদর করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া তিলকসুন্দরী গাছের ডাল হইতে বলিল, "ভুশকুমড়ো কোলে। তিলকসুন্দরী ডালে!" রাজপুত্র মনে করিলেন,—পাখীটি কি বলে? রাজপুত্র সেই পাখীটিকে ডাকিলেন। পাখীটি আসিয়া রাজপুত্রের হাতে বসিল। সুন্দর পাখীটি দেখিয়া, রাজপুত্র তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথার শিকড়টি পড়িয়া গেল। পাখী তখন পুনরায় তিলকসুন্দরী হইল। রাজপুত্র তখন সৎ-মার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। সৎ-মার কন্যা ভুশ-

কুমড়োকে হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা দিয়া পুতিয়া ফেলিলেন। তিলকসুন্দরীকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন।

কঙ্কাবতীর সেই তিলকসুন্দরীর কথা এখন মনে হইল। আরব্য উপন্যাসে এই ভাবের যে গল্প আছে, তাহাও তাঁর মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন,—দুষ্টগণ শিকড়ের দ্বারা এইরূপে লোকের মন্দ করে। আচ্ছা যাই দেখি, আমার স্বামীর মাথায় কোনও রূপ শিকড় আছে কি না।

এই মনে করিয়া তিনি অন্য ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিলেন। বাতিটি হাতে করিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া খেতুর মাথায় শিকড়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। খেতু ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। খেতু ইহার কিছুই জানে না।

সর্বনাশ! অনুসন্ধান করিতে করিতে কঙ্কাবতী খেতুর মাথায় একটি শিকড় দেখিতে পাইলেন।—বাবা যা বলিয়াছিলেন, তাই! দুষ্টলোকদিগের একবার দুরভিসন্ধি দেখ। ভাগ্যক্রমে আজ আমি মাথাটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম; তা না হইলে কি হইত?

কঙ্কাবতী শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে খুলিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শিকড়টি মাথার চুলের সহিত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া লইতে পারিলেন না। পাছে খেতু জাগিয়া উঠেন, এই ভয়ে আর অধিক বল প্রয়োগ করিলেন না। পুনরায় অপর ঘরে গিয়া, সেস্থান হইতে কাঁচি লইয়া আসিলেন। চুলের সহিত শিকড়টি খেতুর মাথা হইতে কাটিয়া লইলেন। শিকড়টি তৎক্ষণাৎ বাতির অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

শিকড় পুড়িয়া ঘরের ভিতর অতি ভয়ানক তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হইল। সেই গন্ধে কঙ্কাবতীর শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। ভয়ে কঙ্কাবতী বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতীর সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

চমকিয়া খেতু জাগরিত হইলেন। মাথায় হাত দিয়া দেখিলেন যে, শিকড় নাই। ভয়ে বিহ্বলা, কম্পিত-কলেবরা, জ্ঞানহীনা, কঙ্কাবতীকে সম্মুখে দণ্ডায়-মানা দেখিলেন। অচেতন হইয়া কঙ্কাবতী ভূতলশায়িনী হন আর কি, এমন সময় খেতু উঠিয়া তাঁহাকে ধরিলেন। বাতিটি তাঁহার হাত হইতে লইয়া, কঙ্কাবতীকে আস্তে আস্তে বসাইলেন। কঙ্কাবতীর মুখে জল দিয়া কঙ্কাবতীকে সুস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুস্থ হইয়া কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমি যে ঘোর কু-কর্ম করিয়াছি, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!"

এই কথা বলিয়া, কঙ্কাবতী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই। প্রথম তো অদৃষ্টের দোষ। তা না হইলে এতদিন গিয়া আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন? তাহার পর আমার দোষ। আমি যদি আদ্যোপান্ত সকল কথা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতাম, যদি তোমার নিকট কিছু গোপন না করিতাম, তাহা হইলে এ কাজ তুমি কখনই করিতে না, আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। শিকড়টি কি বাতির আগুনে পোড়াইয়া ফেলিয়াছ?"

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ! শিকড়টি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি।"

খেতু বলিলেন, "তবে এখন তোমাকে বুকে সাহস বাঁধিতে হইবে। স্ত্রীলোক, বালিকার মত এখন আর কাঁদিলে চলিবে না। এই জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে তুমি একাকিনী। তোমার জন্যই প্রাণ আমার নিতান্ত আকুল হইয়াছে। কঙ্কাবতী, প্রকৃত যাহারা পুরুষ হয়, মরিতে তাহারা ভয় করে না। অনাথিনী স্ত্রী প্রভৃতি পোষ্যদিগের জন্যই তাহারা কাতর হয়।"

ব্যস্ত হইয়া কঙ্কবাতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? কি? আমাদের কি বিপদ্ হইবে? কি বিপদের আশঙ্কা তুমি করিতেছ?"

খেতু উত্তর করিলেন, "কঙ্কাবতী, যদি গোপন করিবার সময় থাকিত, তাহা হইলে আমি গোপন করিতাম। কিন্তু গোপন করিবার আর সময় নাই। তোমাকে একাকিনী এস্থান হইতে বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ঠিক উত্তর মুখে যাইবে। প্রাতঃকাল হইলে সূর্য উদয় হইবে, সূর্যকে দক্ষিণদিকে রাখিয়া চলিলেই তুমি গ্রামে গিয়া পৌছিবে।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুমি?"

খেতু বলিলেন, "আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। আমি এ স্থানের দ্রব্য ছুঁইয়াছি, এখান হইতে আমি টাকা-কড়ি লইয়াছি, সুতরাং এখান হইতে আমি আর যাইতে পারিব না। আমাকে এইখানেই থাকিতে হইবে। সেইজন্য এখানকার কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে তোমাকে মানা করিয়াছিলাম। এক্ষণে তুমি আর বিলম্ব করিও না। অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া সুড়ঙ্গপথে গমন করিবে। পর্বতের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কোনও গাছতলায় রাত্রি যাপন করিবে। যখন প্রাতঃকাল হইবে, সূর্য উদয় হইবে, তখন কোন্ দিক উত্তর, অনায়াসেই জানিতে পারিবে। উত্তর-মুখে যাইলেই গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইবে। কঙ্কাবতী, আর বিলম্ব করিও না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "এস্থান হইতে আমি যাইব? তোমাকে এইখানে রাখিয়া আমি এখান হইতে যাইব? এমন কথা তুমি কি করিয়া বলিলে? আমি ঘোরতর কুকর্ম করিয়াছি সত্য। আমি অপরাধিনী সত্য। আমি হতভাগিনী। কিন্তু তা বলিয়া কি আমাকে দূর করিতে হয়? আমি বালিকা, আমি অজ্ঞান, আমি জানি না, না জানিয়া এ কাজ করিয়াছি, ভাল ভাবিয়া মন্দ করিয়াছি। আমার কি আর ক্ষমা নাই?"

খেতু উত্তর করিলেন, "কঙ্কাবতী, তোমার উপর আমি রাগ করি নাই। রাগ করিয়া তোমাকে বলি নাই যে, তুমি এখান হইতে যাও। বড় বিপদের কথা, বড় নিদারুণ কথা, কি করিয়া তোমাকে বলি? এখান হইতে তোমাকে যাইতে হইবে। কঙ্কাবতী, নিশ্চয় তোমাকে এখান হইতে যাইতে হইবে, আর এখনই যাইতে হইবে। বিলম্ব করিলে চলিবে না। এখন তুমি পিতার বাটীতে গিয়া থাক, লোকজন সঙ্গে করিয়া দশদিন পরে পুনর্বার এই বনের ভিতর আসিও। এই অট্টালিকার ভিতর যাহা কিছু ধন-সম্পত্তি আছে, তাহা লইয়া যাইও। দশ দিন পরে লইলে কোনও ভয় নাই, তখন তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। এই ধন-সম্পত্তি চারিভাগ করিবে। একভাগ তোমার পিতাকে দিবে, এক ভাগ রামহরি দাদা মহাশয়কে দিবে, এক ভাগ নিরঞ্জন কাকাকে দিবে, আর এক ভাগ তুমি লইবে। ব্রত-নিয়ম ধর্ম-কর্ম দানধ্যান করিয়া জীবন যাপন করিবে। মনুষ্য-জীবন কয় দিন? কঙ্কাবতী, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। তাহার পর এখন আমি যেখানে যাইতেছি, সেইখানে তুমি যাইবে। দুইজনে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, প্রাণে বড় ভয় হইতেছে। হায়, আমি কি করিলাম। কি বিপদের কথা! কি নিদারুণ কথা! এখন কোথায় তুমি যাইবে? আমাকে ভাল করিয়া সকল কথা বল।"

খেতু বলিলেন, "তবে শুন। এই অট্টালিকার ভিতর যা ধন দেখিতেছ, ইহার প্রহরিণীস্বরূপ নাকেশ্বরী নামধারিণী এক ভয়ংকরী ভূতিনী আছে। সুড়ঙ্গের দ্বারে সর্বদা সে বসিয়া থাকে। সেই যে খল খল বিকট হাসি তুমি শুনিয়াছিলে, সে হাসি এই নাকেশ্বরীর। যে কেহ তাহার এই ধন স্পর্শ করিবে, মুহূর্তের মধ্যে সে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে। আমি এই ধন লইয়াছি। কিন্তু যে শিকড়টি তুমি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছ, সেই শিকড়ের দ্বারা এতদিন আমি রক্ষিত হইতেছিলাম। তা না হইলে এতদিন কোন্ কালে নাকেশ্বরী

আমাকে খাইয়া ফেলিত। শিকড় নাই, এ কথা নাকেশ্বরী এখনও বোধ হয় জানিতে পারে নাই। কিন্তু শীঘ্রই সে জানিতে পারিবে। জানিতে পারিলেই সে এখানে আসিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে। নাকেশ্বরীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার কোনও উপায় নাই। এক তো এখান হইতে বাহিরে যাইবার অন্য উপায় নাই। তা থাকিলেও কোনও লাভ নাই। বনে যাই কি জলে যাই, গ্রামে যাই কি নগরে যাই, যেখানে যাইব, নাকেশ্বরী সেইখানে গিয়া আমাকে মারিয়া ফেলিবে।

এই কথা শুনিয়া, কঙ্কাবতী খেতুর পা-দুটি ধরিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, কাঁদিও না। কাঁদিলে আর কি হইবে? যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহা ঘটিল। সকলই তাঁর ইচ্ছা। উঠ, যাও। আস্তে আস্তে সুড়ঙ্গ দিয়া বাহিরে যাও। এখনই নাকেশ্বরী এখানে আসিয়া পড়িবে। তাহাকে দেখিলে তুমি ভয় পাইবে। যাও, বাড়ি যাও। মার কাছে যাইলে, তবু তোমার প্রাণ অনেকটা সুস্থ হইবে।"

কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। আরক্ত-নয়নে আরক্ত-বদনে কঙ্কাবতী উঠিয়া বসিলেন। কঙ্কাবতীর মৃদু মনোমুগ্ধকারিণী সেই রূপ-মাধুরী উগ্রভাবাপন্ন হইয়া এখন অন্য প্রকার এক সৌন্দর্যের আবির্ভাব হইল।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমি তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া যাইব? তোমাকে এইখানে ছাড়িয়া নাকেশ্বরীর ভয়ে প্রাণ লইয়া আমি পলাইব? তা যদি করি, তো ধিক্ আমার প্রাণে, ধিক্ আমার বাঁচনে। শত ধিক্ আমার প্রাণে, শত ধিক্ আমার বাঁচনে। তোমার কঙ্কাবতী অল্পবুদ্ধি বালিকা বটে, সেইজন্য সে তোমার আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়াছে। তা বলিয়া কঙ্কাবতী নরকের কীট নয়। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি ভাল; না পারি, তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। যদি তোমার মৃত্যু, তো আমারও মৃত্যু। কঙ্কাবতী মরিতে ভয় করে না। তোমাকে ছাড়িয়া কঙ্কাবতী এ পৃথিবীতে থাকিতেও চায় না। কঙ্কাবতীর এই প্রতিজ্ঞা। কঙ্কাবতী নিশ্চয় আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে।"

খেতু কঙ্কাবতীর মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কঙ্কাবতীর মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁর প্রতিজ্ঞা অটল, অচল। কঙ্কাবতীর চক্ষে আর জল নাই, কঙ্কাবতীর মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নাই। খেতু ভাবিলেন, কঙ্কাবতীকে আর যাইতে অনুরোধ করা বৃথা।

দশম পরিচ্ছেদ

চুরি

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, যদি নিতান্ত তুমি এখান হইতে পলাইবে না, তবে তোমাকে সকল কথা বলি, শুন। তুমি বালিকা, তাতে জন-শূন্য এই বিজন অরণ্যের মধ্যে আমাদের বাস। ঘরের দ্বারে ভয়ংকরী নাকেশ্বরী। পাছে তুমি ভয় পাও, তাই এতদিন সকল কথা তোমাকে বলি নাই। এখন বলি, শুন। কিন্তু কথা আমার শেষ হইলে হয়। শিকড় পোড়ার গন্ধ পাইলেই বোধ হয় নাকেশ্বরী জানিতে পারিবে যে, আমার কাছে আর শিকড় নাই। তখনই সে ভিতরে আসিয়া আমার প্রাণবধ করিবে। আমার কথা শেষ হইতে না হইতে পাছে আসিয়া পড়ে, সেই ভয়।

"মাতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া আমি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। কলিকাতা না গিয়া কি জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলাম, সে কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। কাশীতে উপস্থিত হইয়া মাতার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর কাজ-কর্মের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সৌভাগ্যক্রমে অবিলম্বেই একটি উত্তম কাজ পাইলাম। অতিশয় পরিশ্রম করিতে হইত সত্য, কিন্তু বেতন অধিক ছিল। এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিব এরূপ আশা হইল। কেবল মাত্র শরীরে প্রাণ রাখিতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেইরূপ যৎসামান্য ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট টাকা আমি তোমার বাপের জন্য রাখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী, বলিতে হইলে, জল খাইয়া আমি জীবনধারণ করিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া এক-একদিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। কিন্তু রাত্রিতে আর কিছু খাইতাম না। জলখাবার নয় কেবল খালি জল, তাই পান করিয়া উদর পূর্ণ করিতাম। তাহাতে শরীর অনেকটা সুস্থ হইত; কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্ষুধার জ্বালাও নিবৃত্ত হইত। তাহার পর শয়ন করিলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম, ক্ষুধার জ্বালা আর জানিতে পারিতাম না। জল আনিবার জন্য কাহাকেও একটি পয়সা দিতাম না।

একটি বড় লোটা কিনিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর যখন আমাকে কেহ চিনিতে পারিবে না, সেই সময়ে আপনি গিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে জল আনিতাম। কাশীতে গঙ্গার ঘাট বড় উচ্চ। জল আনিতে গিয়া একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম। হাতে ও পায়ে আতশয় আঘাত লাগিয়াছিল। কোনও মতে উঠিয়া সেই ঘাটের একটি সোপানে বসিলাম। কঙ্কাবতী, সেইখানে বসিয়া কত যে কাঁদিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব। মনে মনে কহিলাম যে, হে ঈশ্বর! আমি কি পাপ করিয়াছি যে, তাহার জন্য আমার এ ঘোর শাস্তি! কেন লোকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করে তাহা বুঝিলাম। নিজের সুখ-দুঃখ যিনি কেবল নিজের উপর নির্ভর করেন, এ জগতে শান্তির আশা কেবল তিনিই করিতে পারেন। যাঁহারা পাঁচটা লইয়া থাকেন পাঁচটার ভালমন্দের উপর যাঁহারা আপনাদিগের সুখ-দুঃখ নির্ভর করেন, তাঁহাদের আবার এ জগতে শান্তি কোথায়? যাহারে আমি ভালবাসি, যার জীবনের সহিত আমার জীবন জড়িত করিয়া রাখিয়াছি, যার মঙ্গল কামনা সতত করিয়া থাকি, সে কি অকর্ম-দুষ্কর্ম করিবে তাহা আমি কি করিয়া জানিব? তাহার কর্মের উপর আমার কোনও অধিকার নাই, অথচ তাহার অসুখ তাহার ক্লেশ দেখিলে হৃদয় আমার ঘোরতর ব্যথিত হয়। আবার সে নিজে যদিও কোনও দুষ্কর্ম না করে, কি নিজে নিজের অসুখের কারণ না হয়, পরের অত্যাচারে সে প্রপীড়িত হইতে পারে। আমি হয়তো পরের অত্যাচার হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। নিরুপায় হইয়া প্রাণসম সেই প্রিয় বস্তুর যাতনা আমাকে দেখিতে হয়। এই ধর, যেমন তোমার প্রতি পিতা-ভ্রাতার পীড়ন; তাহার আমি কি করিতে পারিয়াছিলাম? চারিদিক সাধুদিগের ধুনি দেখিয়া তখন আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। আবার ভাবিলাম, এই সংসার-ক্ষেত্র প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র। নানা পাপ, নানা দুঃখ এই সংসারে অহরহ বিচরণ করিতেছে। কোটি কোটি প্রাণী সেই পাপে, সেই তাপে তাপিত হইয়া সংসার-যাতনা ভোগ করিতেছে। আমি, যাহার জ্ঞান-চক্ষু তাহাদের চেয়ে অনেক পরিমাণে উন্মীলিত হইয়াছে, পাপ-তাপের সহিত যুদ্ধ করিতে যে অধিকতর সুসজ্জিত হইয়াছে, আমি কি সে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইব? জগতের হিতের নিমিত্ত অহিতের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পরাজয় মানিয়া, নির্জন গভীর কাননে গিয়া বসিয়া

থাকিব? কঙ্কাবতী, এইরূপ কত কি যে ভাবিলাম, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?

"আস্তে আস্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে একবৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। মনে করিলাম, এই টাকা পাইলে তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন। তোমাকে আমি পাইব। টাকাগুলি লইয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমুদয় নগদ টাকা ছিল, নোট লই নাই; কারণ নোটের প্রতি আমাদের গ্রামের লোকের আস্থা নাই। একটি ব্যাগের ভিতর টাকাগুলি লইয়া রেলগাড়িতে চড়িলাম। ব্যাগটি আপনার কাছে অতি যত্নে, অতি সাবধানে রাখিলাম। পাছে কেহ চুরি করে, পাছে কেহ লয়, এই ভয়ে একবারও গাড়ি হইতে নামি না। যখন সন্ধ্যা হইল তখন বড় একটি স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল। সেখানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গাড়ি দাঁড়াইবে। আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল। তবুও জল-খাবার কিনিবার জন্য গাড়ি হইতে আমি নামিলাম না। যে গাড়িতে আমি বসিয়া ছিলাম, সে গাড়িতে আর একটি অপরিচিত লোক ছিল, অন্য আর কেহ ছিল না। সে লোকটি নিজের জন্য জলখাবার আনিতে গেল। যাইবার সময় সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয় আপনার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে তো বলুন, আমি আনিয়া দিই। আমি উত্তর করিলাম, যদি তুমি আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি উপকৃত হইব। এই বলিয়া জল-খাবার কিনিবার নিমিত্ত তাহাকে আমি পয়সা দিলাম। সে আমাকে জলখাবার আনিয়া দিল। তাহা আমি খাইলাম। অল্পক্ষণ পরে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মনে করিলাম, গাড়ির উত্তাপে এইরূপ হইয়াছে। একটু শুইলাম। শুইতে না শুইতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য কিছুমাত্র রহিল না। প্রাতঃকাল হইলে অল্পে অল্পে জ্ঞানের উদয় হইল। কিন্তু মাথা বড় ব্যথা করিতে লাগিল, মাথা যেন তুলিতে পারি না। যাহা হউক, জ্ঞান হইয়া দেখি যে, শিয়রে আমার ব্যাগ নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখি যে, গাড়িতে সে লোকটা নাই। আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। আস্তে-আস্তে উঠিয়া গাড়ির চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। ব্যাগ নাই। ব্যাগ দেখিতে পাইলাম না। আমার যে ঘোর সর্বনাশ হইয়াছে, এখন তাহা নিশ্চয় বুঝিলাম। একবৎসর ধরিয়া, এত কষ্ট পাইয়া, জল

খাইয়া যে টাকা আমি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আজ সে টাকা আমার নাই। কিরূপ মর্মভেদী অসহ্য যাতনা আমার মনের ভিতর তখন হইল, একবার বুঝিয়া দেখ। কঙ্কাবতী, মানুষের মনে এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ নিষ্ঠুরতা নরক নয়, তবে নরক আর কি? কঙ্কাবতী, মানুষে মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে, তাদের কি ক্লেশ হয় না?"

অনেকক্ষণ পরে কঙ্কাবতীর চক্ষুতে জল আসিল, কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভাল হইয়াছে। কাজ নাই। কাজ নাই আর এ জগতে থাকিয়া। চল আমরা এ জগৎ হইতে যাই। নাকেশ্বরী আমাদের শত্রু নয়, নাকেশ্বরী আমাদের পরম মিত্র।"

খেতু বলিলেন, "কান পাতিয়া শুন দেখি, নাকেশ্বরীর কোনও সাড়াশব্দ পাও কি না?"

কঙ্কাবতী একটু কান পাতিয়া শুনিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, কোনও রূপ সাড়া-শব্দ নাই।"

খেতু পুনরায় বলিলেন, "তবে শুন, তাহার পর কি হইল! নাকেশ্বরী না আসিতে আসিতে সকল কথা বলিয়া লই।"

"যখন বুঝিলাম যে, আমার টাকাগুলি চুরি গিয়াছে, তখন মনে করিলাম, আজ আমার সকল আশা নির্মূল হইল। যে লোকটি আমার সঙ্গে গাড়িতে ছিল, সে চোর। জল-খাবারের সহিত সে কোনও প্রকার মাদক দ্রব্য মিশাইয়া দিয়াছিল। সেই জল-খাবার খাইয়া যখন আমি অজ্ঞান হইয়া পড়ি, তখন সে আমার টাকাগুলি লইয়া পলাইয়াছে। কখন কোন স্টেশনে নামিয়া গিয়াছে, তাহা আমি কি করিয়া জানিব? সুতরাং চোর ধরা পড়িবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তবু রেলের কর্মচারীদিগকে সকল কথা জানাইলাম। আমাকে সঙ্গে লইয়া, সমস্ত গাড়ি তাঁহারা অনুসন্ধান করিলেন।

"কোনও গাড়িতে সে লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমি পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিলাম। কঙ্কাবতী, এই যে মনুষ্যজীবন দেখিতেছ, কেবল কতকগুলি আশা ও হতাশা, এই লইয়াই মনুষ্যজীবন। কি করিব আর কঙ্কাবতী? চুপ করিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, এখন করি কি? যাই কোথায়? কলিকাতা যাই, কি কাশী ফিরিয়া যাই, কি দেশে যাই

তারপর মনে পড়িল যে, রাণীগঞ্জের টিকিটখানি আর গুটি-কত পয়সা ভিন্ন হাতে আর কিছুই নাই। যাহা হউক, হাতে পয়সা থাকুক আর নাই থাকুক, দেশে আসাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলাম। কারণ তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিব। তুমি পথপানে চাহিয়া থাকিবে। হয় তো কত তাড়না, কত গঞ্জনা, কত লাঞ্ছনা তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে। মনে করিলাম, তোমার বাপের পায়ে গিয়া ধরি, তাঁহাকে দুই হাজার টাকার খত লিখিয়া দিই, মাসে মাসে টাকা দিয়া ঋণ-পরিশোধ করিব।

"কঙ্কাবতী, বারবার তোমার বাপের কথা মুখে আনিতে মনে বড় ক্লেশ হয়। তিনি কেন যাই হউন না, তোমার পিতা তো বটে। তাঁর কথা বলিতে গেলেই নিন্দা হইয়া পড়ে। মনে করিয়াছিলাম, এখান হইতে প্রচুর ধন দিয়া, ধনের উপর তাঁহার বিতৃষ্ণা করিয়া দিব। পৃথিবীর আর একটি রোগ দেখ কঙ্কাবতী, ধনের জন্য সবাই উন্মত্ত, ধনের জন্য সবাই লালায়িত। পেটে কত-কটি খাই, কঙ্কাবতী, গায়ে কি পরি যে, ধন-পিপাসায় এত তৃষিত হইব? হাঁ, ধন উপার্জনের আবশ্যক। কেন না, ইহা দ্বারা আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের উপকার করিতে পারা যায়, ক্ষুধার্তকে অন্ন দিতে পারা যায়, দায়গ্রস্তকে দায় হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়, অনেক পরিমাণে দুঃখময় জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারা যায়।

"যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, যিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জনে বা জ্ঞানোপার্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত সেই সংসারে তিনি দেবতাস্বরূপ। কিন্তু তা বলিয়া কঙ্কাবতী, ধনোপার্জনে লোক যেন উন্মত্ত না হয়। মেঘের বর্ষণ, প্রবল প্রভঞ্জনের গভীর গর্জন পৃথিবীর নিম্ন প্রদেশেই ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধপ্রদেশে সেই মহা আকাশে সব স্থির, সব শান্ত। সেইরূপ মানবের এই কর্মক্ষেত্রেও উচ্চতা-নীচতা আছে। ধন মান জাতি ধর্ম লইয়া যত কিছু কোলাহল শুনিতে পাও, অজ্ঞানতাময় নীচ-পথাশ্রিত মানব-মন হইতেই সে সমুদয় উত্থিত হয়। এই মৃত্যু সময়ে, মোহান্ধ, নিম্নপথাবলম্বী মানব-কুলের বৃথা বাদ-বিসংবাদ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, কঙ্কাবতী, আমি আর হাস্যসংবরণ করিতে পারিতেছি না।

"কলিকাতা কি কাশী না গিয়া বাড়ি যাইব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া রাণীগঞ্জে নামিলাম। রাণীগঞ্জ হইতে আমাদের গ্রামে আসিতে দুইটি পথ

আছে। একটি রাজপথ, যাহা দিয়া অনেক লোক গতি-বিধি করে, দ্বিতীয়টি বনপথ, যাহাতে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে, সেজন্য সে পথ দিয়া লোকে বড় যাতায়াত করে না। বনপথটি কিন্তু নিকট। সে পথটি দিয়া আসিলে পাঁচ দিনে আমাদের গ্রামে উপস্থিত হইতে পারা যায়, রাজপথ দিয়া যাইলে ছয় দিন লাগে। রাণীগঞ্জে যখন নামিলাম, তখন আমার হাতে কেবল চারিটি পয়সা ছিল। শীঘ্র গ্রামে পৌঁছিব, সে নিমিত্ত আমি বনপথটি অবলম্বন করিলাম। প্রথম দিনেই পয়সা কয়টি খরচ হইয়া গেল। পাহাড়-পর্বত, বন-উপবন, নদী-নির্ঝর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। বনের ফলমূল যাহা কিছু পাই, তাহাই খাই। রাত্রিতে যে দিন গ্রাম পাই সে দিন কাহারও দ্বারে পড়িয়া থাকি। যে দিন গ্রাম না পাই, সে দিন গাছতলায় শুইয়া থাকি। মনে করিলাম, আমাকে বাঘ-ভালুকে কিছু বলিবে না, তার জন্য কোনও চিন্তা নাই। আমাকে যদি বাঘ-ভালুকে খাইবে, তবে পৃথিবীতে এমন হতভাগা আর কে আছে যে, এ দুঃখ সব ভোগ করিবে?

"এইরূপে চারিদিন কাটিয়া গেল। আমাদের গ্রাম হইতে যে উচ্চ পর্বতটি দেখিতে পাওয়া যায়, সন্ধ্যাবেলা আমি সেই পর্বতের নিম্নদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই পর্বতটি এই, যাহার ভিতর এক্ষণে আমরা রহিয়াছি। এখান হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় এক দিনের পথ। কয় দিন অনাহারে ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। মনে করিলাম কাল প্রাতঃকালে আরও অধিক দুর্বল হইয়া পড়িব, তাহার চেয়ে সমস্ত রাত্রি চলি, সকাল বেলা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব। এইরূপ ভাবিয়া সে রাত্রিতে আর বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম। রাত্রি এক প্রহরের পর চন্দ্র অস্ত যাইলেন। ঘোরতর অন্ধকারে বন আচ্ছন্ন হইল, আমি পথ হারাইলাম। নিবিড় বনের মধ্যে গিয়া পড়িলাম, কোনও দিকে আর পথ পাই না। একবার আগে যাই, একবার পশ্চাতে যাই, একবার দক্ষিণে যাই, একবার বামদিকে যাই, পথ আর কোনও দিকে পাই না। অনেকক্ষণ ধরিয়া অতি কষ্টে বনের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইলাম, পথ কিন্তু কিছুতেই পাইলাম না। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। পা আর তুলিতে পারি না। পিপাসায় বক্ষঃস্থল ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় সম্মুখে একটি মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি দেখিয়া আমার মৃতপ্রায় দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হইল।

ভাবিলাম অবশ্য এই স্থানে লোক আছে। আর কিছু পাই না পাই, এখন একটু জল পাইলে প্রাণরক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তৃষিত চাতকের ন্যায় ব্যগ্রতার সহিত মন্দিরের দিকে যাইলাম। হা অদৃষ্ট! গিয়া দেখিলাম মন্দিরে দেব নাই, দেবী নাই, জনমানব নাই। মন্দিরটি অতি প্রাচীন, ভগ্ন; ভিতর ও বাহির বন্য বৃক্ষলতায় আচ্ছাদিত। বহুকাল হইতে জনমানবের সেখানে পদার্পণ হয় নাই। হা ভগবান! তোমার মনে আরও কত কি আছে। এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেইখানে আমি শুইয়া পড়িলাম।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভূত কোম্পানি

খেতু বলিতেছেন, "রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে, অতিশয় শ্রান্তি বশতঃ আমার একটু নিদ্রার আবেশ হইয়া আসিতেছে, এমন সময় মন্দিরের সোপানে কি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখি না, ভীষণাকার শ্বেতবর্ণ এক মড়ার মাথা। একটি পৈটা হইতে অন্য পৈটার উপর লাফাইয়া লাফাইয়া উঠিতেছে। কঙ্কাবতী, ভয় আমার শরীরে কখনও নাই, তবুও এই মড়ার মাথার কাণ্ড দেখিয়া আমার শরীর কেমন একটু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! আমি উঠিয়া বসিলাম। মড়ার মাথাটি লাফাইয়া লাফাইয়া সমস্ত পৈটাগুলি উঠিল, তার পর ভাটার মত গড়াইতে গড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নিকট আসিয়া একটি লাফ মারিল, লাফ মারিয়া আমার ঠিক মুখের সম্মুখে শূন্যেতে স্থির হইয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত আমার দিকে চাহিয়া রহিল। সেইখানে থাকিয়া আকর্ণ হাঁ করিয়া দন্ত-পাঁতি বাহির করিল।

"এইরূপ বিকটাকার হাঁ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, তুমি না কি ভূত মান না?

"আমি উত্তর করিলাম, রক্ষা করুন মহাশয়, আপনারা পর্যন্ত আর আমার সহিত লাগিবেন না। নানা কষ্টে, নানা দুঃখে আমি বড়ই উৎপীড়িত হইয়াছি। যান ঘরে যান। আমাকে আর জ্বালাতন করিবেন না।

"আমার কথায় মুণ্ডটির আরও ক্রোধ হইল। চীৎকার করিয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, তুমি নাকি ভূত মান না? ইংরেজী পড়িয়া তুমি নাকি ভূত মান না?

"আমি বলিলাম, ইংরেজী-পড়া বাবুরা ভূত মানেন না বলিয়া কি আপনার রাগ হইয়াছে? লোকে ভূত না মানিলে কি আপনাদের অপমান বোধ হয়?

"মড়ার মুণ্ড উত্তর করিল, রাগ হইবে না তো কি, সর্বশরীর শীতল হইবে? ভূত না মানিলে, ভূতদিগের অপমান হয় না তো কি আর মর্যাদা বাড়ে?

কেন লোকে বলিবে যে, পৃথিবীতে ভূত নাই? ইংরেজী পড়া বাবুদের আমরা কি করিয়াছি যে, তাহারা আমাদিগকে পৃথিবী হইতে একেবারে উড়াইয়া দিবে? দেবতাদিগকে তোমরা উড়াইয়া দিয়াছ, এখন এই উপদেবতা কয়টাকে শেষ করিতে পারিলেই হয়। বটে!

"দুঃখের সময়ও হাসি পায়, দেবতাদিগকে না মানিলে, না পূজা দিলে, দেবতাদিগের রাগ হয়, দেবতারা মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া থাকেন, একথা পূর্বে জানিতাম; কিন্তু লোকে ভূত না মানিলে, ভূতের রাগ হয়, ভূতের অপমান হয়, এ কথা কখনও শুনি নাই। আমার তাই হাসি পাইল।

"আমি বলিলাম, হাঁ মহাশয়, ইংরেজী-পড়া বাবুদের এটি অন্যায় বটে!

"আমার কথায় মড়ার মাথা কিছু সন্তুষ্ট হইল, অনেকটা তাহার রাগ পড়িল। মুণ্ড বলিল, তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ইংরাজী-পড়া বাবুদের মত ত্রিপণ্ড নাস্তিক নও! তোমার মাথায় টিকি আছে?

"আমি বলিলাম, না মহাশয়, আমার মাথায় টিকি নাই।

"মুণ্ড বলিল, এইবার ঘরে গিয়া টিকি রাখিও। আর শুন, ইংরেজী-পড়া বাবুদের আমরা সহজে ছাড়িব না। যাহাতে পুনরায় ভূতের উপর তাহাদিগের বিশ্বাস জন্মে, সে সমুদয় আয়োজন করিয়াছি। আমরা তাহাদিগকে ভজাইব। যেখানে সেখানে গিয়া বক্তৃতা করিব, পুস্তক ছাপাইব, সংবাদ-পত্র বাহির করিব। এই সকল কার্যের নিমিত্ত আমরা একটি কোম্পানি খুলিয়াছি! কোম্পানির নাম রাখিয়াছি,—স্কল স্কেলিটন অ্যাণ্ড কোং।

"কঙ্কাবতী, তোমার বোধ হয় মনে থাকিতে পারে যে, 'স্কল' মানে মনুষ্যের মাথার খুলি, 'স্কেলিটন' মানে কঙ্কাল, অর্থাৎ অস্থি-নির্মিত মনুষ্য শরীরের কাটামো। মুণ্ড যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই যে, ইংরাজী-পড়া লোকেরা যাহাতে ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মনে যাহাতে ভূতের উপর বিশ্বাস হয়, ভূতের প্রতি ভক্তি হয়, এইরূপ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত খুলি, কঙ্কাল প্রভৃতি ভূতগণ দল-বদ্ধ হইয়াছেন।

"স্কল অর্থাৎ সেই মড়ার মাথাটি আমাকে পুনরায় বলিলেন, আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি। কোম্পানির নাম রাখিয়াছি স্কল স্কেলিটন অ্যাণ্ড কোং। ইংরেজী নাম রাখিয়াছি কেন, তা জান? তাহা হইলে পসার বাড়িবে, মান হইবে, লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিবে। যদি নাম রাখিতাম, খুলি কঙ্কাল এবং কোম্পানি তাহা হইলে কেহই আমাদিগকে বিশ্বাস করিত না।

সকলে মনে করিত ইহারা জুয়াচোর। দেখিতে পাও না যে, যখন মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায় জুতা কি শরাপ কি হ্যাম বা শূকরের মাংসের দোকান করেন, তখন সে দোকানের নাম দেন, লংম্যান অ্যাণ্ড কোং, অথবা গুডম্যান অ্যাণ্ড কোং। দেখিয়া শুনিয়া শতসহস্র বার ঠকিয়া দেশী লোককে আর কেহ বিশ্বাস করে না। বরং ইংক্রুজ পিক্রুজ দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে। তবু দেশী দোকানীর কথা লোকে বিশ্বাস করে না। আবার দেখ বেদের কথা বল, শাস্ত্রের কথা বল, বিলাতী সাহেবেরা যদি ভাল বলেন, তবেই বেদ পুরাণ ভাল হয়। দেশী পণ্ডিতদের কথা কেহ গ্রাহ্যও করে না। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমাদের কোম্পানির নাম দিয়াছি, স্কল স্কেলিটন অ্যাণ্ড কোং। স্কেলিটন ভায়া ওইখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এস তো স্কেলিটন ভায়া, একটু এদিকে এস তো!

"হাড় ঝম্ ঝম্ করিতে করিতে স্কেলিটন আমার নিকটে আসিলেন। সর্বশরীরের অস্থিকে স্কেলিটন বলে, কিন্তু এক্ষণে আমার সম্মুখে যিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি দেখিলাম মুণ্ডহীন স্কেলিটন।

"তখন স্কল আমাকে পুনরায় বলিলেন, কেমন, ভূতের উপর এখন তোমার সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস হইয়াছে তো?

"আমি উত্তর করিলাম, পূর্ব হইতেই আমার বিশ্বাস আছে কারণ ভূতের ষড়যন্ত্রেই আমি এত দিন ধরিয়া ক্লেশ ভোগ করিতেছি; কিন্তু সে অন্য প্রকার ভূত! এখন হইতে আপনাদিগের মত ভূতকে মানিয়া লইলাম। প্রত্যক্ষ চক্ষের উপর দেখিয়া আর কি করিয়া না মানি? তার জন্য আর আপনারা কোনও চিন্তা করিবেন না; যান এক্ষণে ঘরে যান। রাত্রি অধিক হইয়াছে। অপনাদিগের ঘরের লোক ভাবিবে। আর আমাকে একটু নিদ্রা যাইতে হইবে। কারণ কাল প্রাতঃকালে আবার আমাকে পথ চলিতে হইবে।

"স্কল তখন স্কেলিটনকে বলিলেন, দেখিলে স্কেলিটন ভায়া! কোম্পানি খুলিলে কত উপকার হয়। ইংরেজী পড়িয়া এই বাবুটির মতি-গতি একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। দু-কথাতেই পুনরায় ইহাকে স্বধর্মে আনয়ন করিলাম। এক্ষণে চল অন্যান্য বিকৃতমতি বাবুদিগকে অন্বেষণ করি। ভূতবর্গের প্রতি যাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়, চল সেইরূপ উপায় করি।

"স্কেলিটন হাড় ঝম্ ঝম্ করিলেন। আমি একটু কান পাতিয়া শুনিলাম যে, সে কেবল হাড় ঝম্ ঝম্ নয়। তাঁহার মুণ্ড নাই, সুতরাং মুখ দিয়া কথা কহিবার তাঁহার উপায় নাই। সে জন্য গায়ের হাড় নাড়িয়া হাড় ঝম্ ঝম্ করিয়া তিনি কথা-বার্তা কহিয়া থাকেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে কথা আমি অনায়াসে বুঝিতে পারিলাম।

"স্কেলিটন বলিলেন, যদি ইনি ভূতভক্ত হইলেন তবে ইঁহাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। লোককে ভক্ত করিতে হইলে অর্থদান একটি তাহার প্রধান উপায়। অর্থ পাইলে লোকে অতি ধর্মবান্, অতি ভক্তিমান্ মহাপুরুষ হয়। অতএব তুমি ইঁহাকে ধন দান কর। যখন দেশে গিয়া ইনি গল্প করিবেন, তখন শত শত লোক অর্থলোভে ভূতভক্ত হইবে।"

"আমি বলিলাম,—সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আমি অর্থলোভী নই। ধন দিয়া অমাকে ভূতভক্ত করিতে হইবে না। আপনাদের অর্থ আমি লইব না।

"এই কথা শুনিয়া স্কল আরও প্রসন্নমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, এস আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের সঞ্চিত ধন তোমাকে দিলে, ধনের সফলতা হইবে, ধন সুপাত্রে অর্পিত হইবে, সে ধন দ্বারা মঙ্গল সাধিত হইবে, সেই জন্য তোমাকে আমাদের সঞ্চিত ধন দিব। জীবিত থাকিতে আমরা ধনের সদ্ব্যবহার করি নাই। এক্ষণে তোমা কর্তৃক সে ধনের সদ্ব্যবহার হইলে আমাদের উপকার হইবে।

"স্কেলিটনও আমাকে সেইরূপ অনেক অনুরোধ করিলেন। দুই ভূতের অনুরোধে আমি তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলাম। স্কেলিটন হাঁটিয়া চলিলেন, আর স্কল স্থানবিশেষে লাফাইয়া বা গড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহারা আমাকে অনেকগুলি ফল-বৃক্ষের নিকটে লইয়া যাইলেন। আম্র, কদলী, পনস, কেন্দু, পিয়াল প্রভৃতি নানা ফল সেইখানে সুপক্ক হইয়াছিল। সেই ফল আমাকে তাঁহারা আহার করিতে বলিলেন। আমি আহার করিলাম। তাহার পর তাঁহারা আমাকে সুশীতল স্ফটিকসদৃশ নির্ঝর দেখাইয়া দিলেন। জলপান করিয়া পিপাসা দূর করিলাম। সেখান হইতে আমরা পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ পরে এই পর্বতের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পর্বতের একস্থানে আসিয়া স্কল বলিলেন, এইখানকার বন আমাদিগকে একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া এখানে জনমানব

পদার্পণ করে নাই। আমরা তিন জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই বন পরিষ্কার করিতে লাগিলাম। পরিষ্কৃত হইলে পর্বতগাত্রে গাঁথুনির ঈষৎ একটু রেখা বাহির হইয়া পড়িল। স্কল, স্কেলিটন ও আমি অতিকষ্টে সেই গাঁথুনির পাথরগুলি ক্রমে খুলিয়া ফেলিলাম। গাঁথুনি খুলিতেই আমাদের এই অট্টালিকার সুড়ঙ্গ-পথটি বাহির হইয়া পড়িল। সুড়ঙ্গ-দ্বারে ভয়ংকরী নাকেশ্বরীকে দেখিলাম। নাকেশ্বরী খল খল করিয়া হাসিল। কিন্তু যেই স্কল চক্ষুকোটর বিস্তৃত করিয়া তাহার দিকে কোপ-কটাক্ষ করিলেন, আর সে চুপ করিল। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া আমবা এই অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিলাম। এই বিপুল ধনরাশি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম।

"স্কল বলিলেন, সহস্র বৎসর পূর্বে এই অঞ্চলের আমরা রাজা ছিলাম। প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই অপরিমিত ধন অর্জন করি। জীবিত থাকিতে ধর্ম-কর্ম কিছুই করি নাই, কেবল যুদ্ধ ও ধনসঞ্চয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলাম। আমাদের সন্তান-সন্ততি ছিল না। সে জন্য কিন্তু আমবা দুঃখিত ছিলাম না, বরং আনন্দিত ছিলাম। যেহেতু সন্তান-সন্ততি দ্বারা ধনের ব্যয় হইয়ার সম্ভাবনা। টাকা গণিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া, আমরা স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিতাম। আমাদের অবর্তমানে পাছে কেহ এই ধন লয়, সে জন্য আমরা ইহার উপর 'যক্' দিলাম অর্থাৎ ইহার উপর এক ভূতিনীকে প্রহরিণী-স্বরূপ নিযুক্ত করিলাম। এ কার্যে যক্ষ বা যক্ষিণী নিযুক্ত করি নাই। কথায় লোকে বলে বটে, কিন্তু ধনের উপরে যক্ষ বা যক্ষিণী কেহ নিযুক্ত করিতে পারে না। যাহা হউক আমাদিগের ধন-ঐশ্বর্যের উপব যক্ দিবার উদ্দেশ্য প্রথমে পর্বত-অভ্যন্তরে এই সুরম্য অট্টালিকার নির্মাণ করিলাম। রাজবাড়ি হইতে সমুদয় টাকাকড়ি মণি-মুক্তা, বসন-ভূষণ ইহার ভিতর লইয়া আসিলাম। যথাবিধি যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া নবমবর্ষীয়া সুলক্ষণা একটি বালিকাকে উৎসর্গ করিয়া, তাহাকে বলিয়া দিলাম যে, এক সহস্র বৎসব পর্যন্ত তুমি এই ধনের প্রহরিণী স্বরূপ নিযুক্ত থাকিবে। এক সহস্র বৎসরের মধ্যে যদি কেহ এই ধনের এক কণামাত্রও লয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহার প্রাণবধ করিবে। এক সহস্র বৎসর পরে তুমি যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইও, তখন যাহার অদৃষ্টে থাকিবে, সে এই ধনের অধিকারী হইবে। বালিকাকে এইরূপ আদেশ করিয়া, অট্টালিকার ভিতর একটি প্রদীপ জ্বালিয়া, আমরা সুড়ঙ্গের দ্বার

রুদ্ধ করিয়া দিলাম। প্রদীপটি যেই নির্বাণ হইল, আর বালিকার মৃত্যু হইল, মরিয়া সে ভীষণাকৃতি অতিদীর্ঘনাসিকা-ধারিণী ভূতিনী হইল। ভূতসমাজে সে জন্য সে নাকেশ্বরী নামে পরিচিত। দ্বারে যে এই প্রহরিণী স্বরূপ রহিয়াছে, সে সেই বিকৃত-আকৃতি ভূতিনী, যাহার বিকট হাসি তুমি এই মাত্র শুনিলে। বালিকা না রাখিয়া ধনের উপর অনেকে বালক প্রহরী নিযুক্ত করিয়া থাকে। বালক মরিয়া ভূত হয়। কিছুদিন পরে যুদ্ধে আমরা হত হই। শত্রুর তরবারি আঘাতে দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবিত থাকিতে ছিলাম এক জন মনুষ্য; মরিয়া হইলাম দুই জন ভূত। মুণ্ডটি হইলাম আমি স্কল, আর ধড়টি হইলেন ইনি স্কেলিটন ভায়া। ৯৯৯ বৎসর পূর্বে আমরা এই ধনের উপর যক্ দিয়াছি। আর এক বৎসর গত হইলেই সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়। তখন নাকেশ্বরী এ ধন ছাড়িয়া দিবে। গত পৌষ মাসে নাকেশ্বরীর সহিত ঘ্যাঘোঁ নামক ভূতের শুভবিবাহ হইয়াছে। নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। তখন এ ধন লইলে আর তোমার কোনও বিপদ্ ঘটিবে না। কিন্তু এই এক বৎসরের ভিতর কোনও মতে এ ধনের কণামাত্র স্পর্শ করিবে না, করিলেই অবিলম্বে নাকেশ্বরী তোমাকে খাইয়া ফেলিবে, অবিলম্বে তোমার মৃত্যু ঘটিবে। এই ধনসম্পত্তির প্রকৃত স্বামী আমরা দুই জন। এই ধন আমরা তোমাকে প্রদান করিলাম। কিন্তু সাবধান, এই এক বৎসরের ভিতর এ ধন স্পর্শ করিবে না।

"আমি উত্তর করিলাম, মহাশয় আপনাদের কৃপায় আমি অতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। যদি আমাকে এ সম্পত্তি দিলেন তবে এরূপ কোনও একটা উপায় করুন, যাহাতে এ ধন হইতে এখন আমি কিছু লইতে পারি। সম্প্রতি আমার অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন। এখন যদি পাই তবে আমার বিশেষ উপকার হয়, এমন কি আমার প্রাণরক্ষা হয়। এখন না পাইলে, এক বৎসর পরে জীবিত থাকি কি না তাই সন্দেহ।

"এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া স্কল ও স্কেলিটন পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি বলাবলি করিলেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

"স্কল বলিলেন, এস আমাদের সঙ্গে পুনরায় বাহিরে এস। সকলে পুনরায় যাইলাম, বনের ভিতর পুনরায় আমরা ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

স্কল বন খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে সামান্য একটি ওষধির গাছ দেখাইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, এই গাছটির তুমি মূল উত্তোলন কর। আমি সেই গাছটির শিকড় তুলিলাম। স্কলের আদেশে অপর একটি গাছের আঠা দিয়া সেই শিকড়টি আমার চুলের সহিত জুড়িয়া দিলাম তাহার পর সকলে পুনরায় আবার এই অট্টালিকায় ফিরিয়া আসিলাম।

"এইখানে উপস্থিত হইয়া স্কল বলিলেন, যে সকল কথা তোমাকে আমি এখন বলি, অতি মনোযোগের সাহত শুন। আপাততঃ যথাপ্রয়োজন টাকা লইয়া তুমি তোমার কার্য সমাধা করিবে। যে শিকড় তোমাকে আমরা দিলাম, তাহার গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যতক্ষণ তুমি অট্টালিকার ভিতর থাকিবে ততক্ষণ নাকেশ্বরী তোমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। অট্টালিকার বাহিরে শিকড় তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। শিকড়ের কিন্তু আর একটি গুণ এই যে, ইহা মাথায় থাকিলে যে জন্তুর আকার ধরিতে ইচ্ছা করিবে তৎক্ষণাৎ সেই জন্তু হইতে পারিবে। ব্যাঘ্র হইতেছেন নাকেশ্বরীর ইষ্ট দেবতা। সেজন্য যখন তুমি অট্টালিকার বাহিরে যাইবে তখন ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া যাইবে। তাহা হইলে নাকেশ্বরী তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে না। তাহার পর অট্টালিকার ভিতর প্রত্যাগমন করিয়া, ইচ্ছা করিলেই মনুষ্যের মূর্তি ধরিতে পারিবে। অতএব দুইটি কথা স্মরণ রাখিও, কোনও মতেই ভুলিবে না। প্রথম এ এক বৎসর শিকড়টি যেন কিছুতেই তোমার মাথা হইতে না যায়, যাইলেই মৃত্যু। তুমি যেখানে থাক না কেন সেইখানেই মৃত্যু। দ্বিতীয়, ব্যাঘ্ররূপ না ধরিয়া বাহিরে যাইবে না, এক মুহূর্ত কালের নিমিত্তও নিজরূপে বাহিরে থাকিবে না, থাকিলেই মৃত্যু, সেই দণ্ডেই মৃত্যু। এক বৎসর পরে শিকড়টি দগ্ধ করিয়া সমুদয় ধনসম্পত্তি লইয়া দেশে চলিয়া যাইবে। এ এক বৎসরের ভিতর যদি তুমি ধন না লইতে তাহা হইলে এ সব কিছুই করিতে হইত না। কারণ নাকেশ্বরী-রক্ষিত ধন না লইলে নাকেশ্বরী কাহাকেও কিছু বলে না, বলিতেও পারে না। যাহা হউক, এক বৎসর পবে ধন ছাড়িয়া নাকেশ্বরী আপনার শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে। ঘ্যাঘোঁ ভূতের সহিত যখন তাহার বিবাহের কথা হয়, তখন লোকে কত না ভাঙ্‌চি দিয়াছিল!

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাঙ্‌চি কেন দিয়াছিল মহাশয়?

"স্কল বলিলেন, তুমি জান না, তাই পাগলের মত কথা জিজ্ঞাসা কর।

বিবাহে ভাঙ্‌চি দিলে যেমন আমোদটি হয়, এমন আমোদ আর কিছুতে হয় না। তুমি একটি পাত্র কি পাত্রী স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনের মত জিজ্ঞাসা কর। তাঁরা বলিবেন, দিবে দাও কিন্তু—। ওই যে কিন্তু কথাটি, উহার ভিতর এক জাহাজ মানে থাকে। যাহা হউক, যাহা বলি আর যা কই ঘ্যাঘোঁর বিবাহে অতি চমৎকার ভাঙ্‌চি দিয়াছিল। প্রশংসা করিতে হয়।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাঙ্‌চি আবার চমৎকার কি মহাশয়?

"স্কল উত্তর করিলেন, সাত কাণ্ড সেই যা আমাদের নাম করিতে নাই, তা পড়িয়া থাকিবে! কিন্তু ভূতের কাণ্ড তুমি কিছুই জান না। কি হইয়াছিল বলিতেছি শুন। ঘ্যাঘোঁর সহিত বিবাহে কথা উপস্থিত হইলে নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটি ভূত পাঠাইয়া দিলেন। ঘ্যাঘোঁর বাটীতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে ঘ্যাঘোঁ তাঁহার বিশেষ সমাদর করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে তিনি নিকটস্থ একটি বিলের জলে স্নান করিতে যাইলেন। সেইখানে প্রতিবেশী ভূতগণও পবামর্শ করিয়া স্নান করিতে যাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন আগন্তুক ভূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়েব নিবাস? আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন, আমার নিবাস একঠেঙো মল্লুকের ও-ধারে, বউ-ভুলুনি নামক আঁব গাছে। ঘ্যাঘোঁর প্রতিবেশী ভূত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কি মনে করিয়া আগমন হইয়াছে? আগন্তুক ভূত উত্তর করিলেন, আমি ঘ্যাঘোঁকে দেখিতে আসিয়াছি। প্রতিবেশী ভূতগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয় তবে কি বৈদ্য? আগন্তুক ভূত বলিলেন, কেন? বৈদ্য কেন হইব? ঘ্যাঘোঁর কি কোনও পীড়া-শীড়া আছে না-কি? প্রতিবেশী ভূতগণ একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন, না না! এমন কিছু নয়! তবে একটু একটু খুক্ খুক্ করিয়া কাশি আছে। তাহার সহিত অল্প অল্প আলকাতরার ছিট থাকে, আর বৈকাল বেলা যৎসামান্য ঘুষ-ঘুষে জ্বর হয়। তা সে কিছু নয়, গরমে হইয়াছে। নাইতে খাইতে ভাল হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া আগন্তুক ভূতের তো চক্ষু স্থির! আর তিনি ঘ্যাঘোঁর কাছে ফিরিয়া যাইলেন না। সেই বিল হইতে একবারে একঠেঙো মুল্লুকের ও-ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নাকেশ্বরীর মাসীকে সকল কথা বলিলেন। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল। নাকেশ্বরী একটি সুন্দরী স্থূতনী। তাহার রূপে ঘ্যাঘোঁ একেবারে মুগ্ধ হইয়াছিল। কত

দিন ধরিয়া পাগলের মত সে গাছে গাছে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিল। তার পর মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া ছিল। যাহা হউক, অবশেষে বিবাহ যে হইয়া গিয়াছে তাহাই সুখের কথা।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, শ্লেষ্মার সহিত আলকাতরা কি?

"স্কল বলিলেন, তোমাদের যেরূপ রক্ত, আমাদের সেইরূপ আলকাতরা। কাসরোগে আমাদের বক্ষঃস্থল হইতে আলকাতরা বাহির হয়।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি আমাদের মত ভূতদিগের রোগ হয় তাহা হইলে ভূতেরাও তো মরিয়া যায়? আচ্ছা মানুষ মরিয়া তো ভূত হয়, ভূত মরিয়া কি হয়?

"স্কল উত্তর করিলেন, কেন? ভূত মরিয়া মারবেল হয়। সেই যে ছোট ছোট গোল গোল ভাঁটার মত মারবেল, যাহা লইয়া ছেলেরা সব খেলা করে।

"আমি বলিলাম, মারবেল হয়! পৃথিবীতে এত বস্তু থাকিতে মারবেল হয় কেন?

"স্কল আমার এই কথায় কিছু রাগত হইয়া বলিলেন, ভুল হইয়াছে। তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তার পর আমাদের মরা উচিত। এখন হইতে না হয় তাই করা যাইবে।

"আমি বলিলাম, মহাশয়, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি জানি না তাই জিজ্ঞাসা করি, ভূত মরিয়া যদি মারবেল হয়, তাহা হইলে মাববেল লইয়া খেলা করা তো বড় বিপদেব কথা?

"স্কল উত্তর করিলেন, মরা ভূত লইয়া খেলা করিতে আবার দোষ কি? হাঁ, জিয়ন্ত ভূত হইত তাহা হইলে তাহার সহিত খেলা করা বিপদের কথা বটে।

"স্কল পুনরায় বলিলেন, তোমার সহিত আব আমাদের মিছামিছি বকিবার সময় নাই। আমরা কোম্পানি খুলিয়াছি, এখন গিয়া কোম্পানির কাজ করি। আমরা স্কল স্কেলিটন এবং কোম্পানি। আমরা কম ভূত নই। যে সব কথা বলিয়া দিয়াছি, সাবধানে মনে করিয়া রাখিবে। তা না হইলে বিপদে পড়িবে! এখন আমরা চলিলাম। আর তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না।

"এই বলিয়া স্কল ও স্কেলিটন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অট্টালিকার ভিতর আমি একেলা বসিয়া রহিলাম। তাহার পর কি করিলাম তাহা তুমি জান, বলিবার আর আবশ্যক নাই। কঙ্কাবতী, কথা এই। এখন সকল কথা তোমাকে বলিলাম।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "তবে আমিও যাই, গিয়া নাকেশ্বরীর টাকা লই, তাহা হইলে আমাদের দুই জনকে সে এক সঙ্গে মারিয়া ফেলিবে। পতিপরায়ণা সতীর ইহার চেয়ে আর সৌভাগ্য কি ?"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক অতি ভয়াবহ চীৎকারে সে স্থান পরিপূরিত হইল। অট্টালিকা কাঁপিতে লাগিল। দ্বার গবাক্ষ পরস্পরে আঘাতিত হইয়া ঝন্ ঝন্ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অট্টালিকা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছাদিত হইল। প্রজ্বলিত বাতিটি নির্বাণ হইল না বটে, কিন্তু অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল।

খেতু বলিলেন, "কঙ্কাবতী, ওই নাকেশ্বরী আসিতেছে।"

কঙ্কাবতী এতক্ষণ শয্যার ধারে বসিয়া ছিলেন। এখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারটি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন, আর দ্বারের উপর সমুদয় শরীরের বলের সহিত ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন। নাকেশ্বরীকে তিনি ভিতরে আসিতে দিবেন না।

অতি দুর্গন্ধে, নিবিড় অন্ধকারে, ঘন ঘন ঘোর গভীর শব্দে, ঘর পরিপূরিত হইল।

ক্রমে শব্দ থামিল, অন্ধকার দূর হইল, বাতির আলোকে পুনরায় ঘর আলোকিত হইল।

তখন কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। কঙ্কাবতী দৌড়িয়া গিয়া নাকেশ্বরীর পায়ে পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ও গো! তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। ও গো আমি বড় দুঃখিনী, আমি কাঙালিনী কঙ্কাবতী। কত দুঃখ পাইয়া আমি এই প্রাণসম পতিকে পাইয়াছি। পৃথিবীতে এই পতি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই। ও গো আমার স্বামীকে না মারিয়া তুমি আমার প্রাণবধ কর। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার স্বামীকে মারিও না। আমরা তোমার এ ধন চাহি না, কিছু চাহি না। আমার পতিকে তুমি দাও, আমার পতিকে লইয়া আমি ঘরে যাই। তোমার যাহা

কিছু টাকা লইয়াছি, সব ফিরিয়া দিব। মানুষ খাইতে যদি তোমার সাধ হইয়া থাকে, তুমি আমাকে খাও, তুমি আমার রক্ত পান কর। আমার স্বামীকে তুমি কিছু বলিও না, স্বামীকে আমার ফিরিয়া যাইতে দাও।”

নাকেশ্বরীর পা ধরিয়া কঙ্কাবতী এইরূপে কাঁদিতে লাগিলেন, নানা মতে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। সে খেদের কথা শুনিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। নাকেশ্বরীর মনে কিন্তু কিছুমাত্র দয়া হইল না। নাকেশ্বরী সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। কঙ্কাবতী যত কাঁদেন আর নাকেশ্বরী বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া কেবল বলে, “দূর দূর!”

কঙ্কাবতী বলিলেন, “ও গো, আমার স্বামীকে ছাড়িয়া আমি এখান হইতে দূর হইব না। আমার স্বামীকে দাও, আমি এখান হইতে এখনই দূর হইতেছি। স্বামী স্বামী, উঠ। চল আমরা এখান হইতে যাই। স্বামী উঠ।”

কঙ্কাবতী যত কাঁদেন, যত বলেন, হাত উত্তোলন করিয়া নাকেশ্বরী তত বলে, “দূর দূর।”

কঙ্কাবতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষু মুছিলেন। তাহার পর আরক্ত-নয়নে দর্পের সহিত নাকেশ্বরীকে বলিলেন, “আমার স্বামীকে দিবে না? আমাকেও খাইবে না? কেবল ‘দূর দূর’! মুখে অন্য কথা নাই! বটে! তা নাকেশ্বরী হও, আর যাই হও, আজ তোমার একদিন, কি আমার একদিন!”

এই কথা বলিয়া পাগলিনী উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী নাকেশ্বরীকে ধরিতে যাইলেন। কোনও উত্তর না করিয়া নাকেশ্বরী কেবলমাত্র একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সেই নিশ্বাসের প্রবল বেগে কঙ্কাবতী একেবারে দ্বারের নিকট গিয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী পুনরায় উঠিলেন, পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে ধরিতে দৌড়িলেন। নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিল, আর কঙ্কাবতী একেবারে অট্টালিকার বাহিরে গিয়া পড়িলেন।

তখন কঙ্কাবতী আস্তে-ব্যস্তে পুনরায় উঠিয়া নাকেশ্বরীকে বলিলেন, “ওগো! তোমাকে আমি আর ধরিতে যাইব না, তোমাকে আমি মারিব না। আমি আমার স্বামীকে আর ফিরিয়া চাই না। এখন কেবল এই

চাই যে, স্বামী হইতে তুমি আমাকে পৃথক করিও না। স্বামীর পদ-যুগল ধরিয়া আমাকে মরিতে দাও। যদি মারিবে তো আমাদের দুই জনকেই একসঙ্গে মার, যদি খাইবে তো আমাদের দুইজনকেই একসঙ্গে খাও। আর তোমার কাছে আমি কিছু চাই না। তোমার নিকট এখন কেবল এই প্রার্থনাটি করি। ইহা হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় ঘরের দিকে দৌড়িলেন। কোনও কথা না বলিয়া নাকেশ্বরী আর একটি নিশ্বাস ছাড়িল আর কঙ্কাবতী একেবারে পর্বতের বাহিরে বনের মাঝখানে গিয়া পড়িলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাঙ-সাহেব

বনের মাঝে কঙ্কাবতী একেবারে নির্জীব হইয়া পড়িলেন। বার বার উঠিয়া পড়িয়া শরীর তাঁহার ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছিল। শরীরের নানা স্থান হইতে শোণিতধারা বহিতেছিল। কঙ্কাবতীর এখন আর উঠিবার শক্তি নাই। উঠিয়াই বা কি করিবেন? স্বামীর নিকট যাইতে গেলেই নাকেশ্বরী আবার তাঁহাকে নিশ্বাসের দ্বারা দূরীভূত করিবে। বনের মাঝে পড়িয়া কঙ্কাবতী অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া তিনি যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পাইলেন না, এখন কেবল এই দুঃখ তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শরীর তাঁহার অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আচ্ছা, তাই ভাল, স্বামী ভিতরে থাকুন, আমি এই বাহিরে পড়িয়া থাকি। তাঁহার পদ-যুগল ধ্যান করিতে করিতে এই বাহিরেই আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব। করুণাময় জগদীশ্বর আমার প্রতি কৃপা করিবেন। মরিয়া আমি তাঁহাকে পাইব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া কঙ্কাবতী স্বামীর পা দুটি মনে মনে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন, উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ অল্প-আয়তন, চম্পককলিসদৃশ-অঙ্গুলিবিশিষ্ট সেই পা দুখানি মনে মনে ধ্যান করিতে লাগিলেন!

একাবিষ্ট চিত্তে এইরূপ ধ্যান করিতেছেন, এমন সময় কঙ্কাবতীর মনে একটি নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "ভাল! ভূতিনী, প্রেতিনী, ডাকিনীতে মনুষ্যের মন্দ করিলে তাহার তো উপায় আছে! পৃথিবীতে অনেক গুণী মনুষ্য আছেন, তাঁহারা মন্ত্র জানেন, তাঁহারা তো ইহার চিকিৎসা করিতে পারেন। কেন বা আমার স্বামীকে তাঁহারা রক্ষা করিতে না পারিবেন? আর যদি একান্তই আমার স্বামীর প্রাণ-রক্ষা না হয়, তাঁহার মৃতদেহ তো আমি আমি পাইব। তাহা লইয়া পুড়িয়া মরিতে পারিলেও আমি কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব। যাহা হউক, আমি আমার স্বামীকে নাকেশ্বরীর হাত হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব, নিশ্চিন্ত

হইয়া থাকিব না। হই না কেন স্ত্রীলোক? আমি কি মানুষ নই? পতির হিতকামনায়, আমি সমুদয় জগৎকে তৃণ জ্ঞান করি, কাহাকেও আমি ভয় করি না।"

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কঙ্কাবতী চক্ষু মুছিলেন, উঠিয়া বসিলেন। এখন লোকালয়ে যাইতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু লোকালয় কোন্ দিকে তাহা তো তিনি জানেন না। উত্তরমুখে যাইতে খেতু বলিয়াছিলেন, কিন্তু উত্তর কোন্ দিক্? বিস্তীর্ণ তমোময় সেই বনকান্তারে দিক্ নির্ণয় করা তো সহজ কথা নহে। রাত্রি এখনও প্রভাত হয় নাই, সূর্য এখনও উদয় হন নাই। তবে কোন দিক্ উত্তর কোন দিক্ দক্ষিণ, কিরূপে তিনি জানিবেন?

তাই তিনি ভাবিলেন, যে দিকে হয় যাই। একটা না একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইব। লোকালয়ে গিয়া সুচিকিৎসকের অনুসন্ধান করিব। কালবিলম্ব করা উচিত নয়। কালবিলম্ব করিলে আমার আশা হয় তো ফলবতী হইবে না।

বন-জঙ্গল, গিরি-গুহা অতিক্রম করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় কঙ্কাবতী চলিলেন। কত পথ যাইলেন, কতদূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু গ্রাম দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য উদয় হইলেন, দিন বাড়িতে লাগিল, তবুও জন-মানবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না।

কি করি, কোন্ দিকে যাই, কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কঙ্কাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় সম্মুখে একটি ব্যাঙ দেখিতে পাইলেন। ব্যাঙের অপূর্ব মূর্তি। সেই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া কঙ্কাবতী বিস্মিত হইলেন। ব্যাঙের মাথায় হ্যাট, গায়ে কোট, কোমরে পেণ্টুলেন, ব্যাঙ সাহেবের পোশাক পরিয়াছেন। ব্যাঙকে আর চেনা যায় না। রঙটি কেবল ব্যাঙের মত আছে, সাবাং মাখিয়াও রঙটি সাহেবের মত হয় নাই! আর পায়ে জুতা নাই। জুতা এখনও কেনা হয় নাই। ইহার পর তখন কিনিয়া পরিবেন। আপাততঃ সাহেবের সাজ সাজিয়া দুই পকেটে দুই হাত রাখিয়া সদর্পে ব্যাঙ চলিয়া যাইতেছেন।

এই অপূর্ব মূর্তি দেখিয়া দেখিয়া এই ঘোর দুঃখের সময়ও কঙ্কাবতীর একটু হাসি দেখা দিল। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ইহাকে আমি পথ জিজ্ঞাসা করি

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাঙ মহাশয়, গ্রাম কোন্ দিকে? কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে লোকালয়ে পৌঁছিব?"

ব্যাঙ উত্তর করিলেন, "হিট্, মিট্, ফ্যাট্।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ব্যাঙ মহাশয়, আপনি কি বলিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ভাল করিয়া বলুন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন্ দিক্ দিয়া যাইলে গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইতে পারা যায়?

ব্যাঙ বলিলেন, "হিশ্, ফিশ্, ড্যাম।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ব্যাঙ মহাশয়, আমি দেখিতেছি, আপনি ইংরেজী কথা কহিতেছেন। আমি ইংরেজী পড়ি নাই। আপনি কি বলিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। অনুগ্রহ করিয়া যদি বাঙ্গালা করিয়া বলেন, তাহা হইলে আমি বুঝিতে পারি।"

ব্যাঙ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে কেহ কোথাও নাই। কারণ লোকে যদি শুনে যে তিনি বাঙ্গালা কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জাতি যাইবে। সকলে তাঁহাকে নেটিভ মনে করিবে। যখন দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, তখন বাঙ্গালা কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল।

কঙ্কাবতীর দিকে কোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ ভাবে ব্যাঙ বলিলেন, "কোথাকার ছুঁড়ী রে তুই! আ গেল যা! দেখিতেছিস, আমি সাহেব। তবু বলে ব্যাঙ মশাই, ব্যাঙ মশাই! কেন? সাহেব বলিতে তোর কি হয়?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ব্যাঙ সাহেব! আমাব অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে গ্রামে যাইব কোন্ দিক্ দিয়া অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিয়া দিন।"

এই কথা শুনিয়া ব্যাঙ আবও জ্বলিয়া উঠিলেন, আরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ম'লো যা! এ হতভাগা ছুঁড়ীর বকম দেখ! মানা করিলেও শুনে না। কথা গ্রাহ্য হয় না। কেবল বলিবে ব্যাঙ, ব্যাঙ, ব্যাঙ! কেন? আমার নাম ধরিয়া ডাকিতে কি মুখে ব্যথা হয় না কি? আমার নাম, মিস্টার গামিশ।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মহাশয়, আমার অপরাধ হইয়াছে। না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। এক্ষণে, মিস্টার গামিশ, আমি লোকালয়ে যাইব কোন দিক্ দিয়া তাহা আমাকে বলিয়া দিন। আমার নাম

কঙ্কাবতী। বড় বিপদে আমি পড়িয়াছি। প্রাণের পতিকে আমি হারাইয়াছি। পতির চিকিৎসার নিমিত্ত আমি গ্রাম অনুসন্ধান করিতেছি। রতি মাত্র বিলম্ব আর করিতে পারি না। এই হতভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া বলিয়া দিন, কোন্ দিক্ দিয়া আমি গ্রামে যাই।"

কঙ্কাবতী তাঁহাকে সাহেব বলিলেন, কঙ্কাবতী তাঁহাকে মিস্টার গামিশ বলিয়া ডাকিলেন। সে জন্য ব্যাঙের শরীর শীতল হইল, রাগ একেবারে পড়িয়া গেল।

কঙ্কাবতীর প্রতি হৃষ্ট হইয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি সাহেব হইয়াছি কেন তা জান?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, তা আমি জানি না। মহাশয়, গ্রামে কোন্ দিক্ দিয়া যাইতে হয়? গ্রাম এখান হইতে কতদূর?"

ব্যাঙ বলিলেন, "দেখ লঙ্কাবতী, তোমার নাম লঙ্কাবতী বলিলে বুঝি? দেখ লঙ্কাবতী, একদিন আমি এই বনের ভিতর বসিয়া ছিলাম। হাতী সেই পথ দিয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিলাম, আমার মান-মর্যাদা রাখিয়া আমাকে ভয় করিয়া হাতী অবশ্যই পাশ দিয়া যাইবে। একবার আস্পর্ধার কথা শুন, দুষ্ট হাতী পাশ দিয়া না গিয়া আমাকে ডিঙাইয়া গেল। রাগে আমার সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। রাগ হইলে আমার আর জ্ঞান থাকে না। আমার ভয়ে তাই সবাই সদাই সশঙ্কিত। আমি ভাবিলাম হাতীকে একবার উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হইবে। তাই আমি হাতীকে বলিলাম, উট-কপালী চিরুন-দাঁতী বড় যে ডিঙুলি মোরে? কেমন বেশ ভাল বলি নাই, লঙ্কাবতী?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমার নাম কঙ্কাবতী। লঙ্কাবতী নয়। আপনি উত্তম বলিয়াছেন। গ্রামে যাইবার পথ আপনি বলিয়া দিলেন না? তবে আমি যাই, আর আমি এখানে অপেক্ষা করতে পারি না।"

ব্যাঙ বলিলেন, "শুন না, অত তাড়াতাড়ি কর কেন? দুষ্ট হাতীর একবার কথা শুন। আমি রাগিয়াছি দেখিয়া তাহার প্রাণে ভয় হইল না। হাতীটা উত্তর করিল, থাক থাক থাক থ্যাবড়া-নাকী, ধর্মে রেখেছে তোরে। হাঁ কঙ্কাবতী, আমার কি থ্যাবড়া নাক?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে এই নাক লইয়া কাঁকড়ার অভিমান হইয়াছিল, আবার দেখিতেছি এই ভেকটিরও সেই অভিমান।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "না না, কে বলে আপনার থ্যাবড়া নাক? আপনার চমৎকার নাক! মহাশয়, এই দিক্ দিয়া কি গ্রামে যাইতে হয়?"

কিছুক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঙ একটু চিন্তায় মগ্ন হইলেন। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া ইনি আমাকে পথ বলিয়া দিবেন। কখন পথ বলিয়া দেন সেই প্রতীক্ষায় একাগ্রচিত্তে কঙ্কাবতী ব্যাঙের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

স্থির-গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে ব্যাঙ বলিলেন, "তবে বোধ হয় কথার মিল করিবার নিমিত্ত হাতী আমাকে থ্যাবড়া-নাকী বলিয়াছে। কারণ, এই দেখ না! আমার কথায় আর হাতীর কথায় মিল হয়:

উট-কপালী চিরুন-দাঁতী বড় যে ভিঙুলি মোরে।
থাক থাক থাক থ্যাবড়া-নাকী ধর্মে রেখেছে তোরে॥

কঙ্কাবতী, কবিতাটি খবরের কাগজে ছাপাইলে হয় না? কিন্তু ইহাতে আমার নিন্দা আছে, থ্যাবড়া নাকের কথা আছে। তাই খবরের কাগজে ছাপাইব না। শুনলে তো এখন হাতীর আস্পর্ধার কথা? তাই আমি ভাবিলাম সাহেব না হইলে লোকে মান্য করে না। সেই জন্য এই সাহেবের পোশাক পরিয়াছি। কেমন? আমাকে ঠিক সাহেবেব মতো দেখাইতেছে তো? এখন হইতে আমাকে সকলে সেলাম করিবে। সকলে ভয় করিবে। যখন রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়া চড়িব, তখন সে গাড়িতে অন্য লোক উঠিবে না। টুপি মাথায় দিয়া আমি দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইব। সকলে উঁকি মারিয়া দেখিবে, আর ফিরিয়া যাইবে। আর বলিবে, ও গাড়িতে সাহেব রহিয়াছে। কেমন কঙ্কাবতী। এ পরামর্শ ভাল নয়?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "উত্তম পরামর্শ, এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পথ বলিয়া দিন। আর যদি না দেন তো বলুন আমি চলিয়া যাই।"

কানে হাত দিয়া ব্যাঙ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ পথ দিয়া গ্রামে যাইব? গ্রাম এখান হইতে কত দূর, কতক্ষণে সেখানে গিয়া পৌঁছিব?"

ব্যাঙ বলিলেন, "আমার একটা হিসাব করিয়া দাও। পথ দেখাইয়া দিব কি, আমি এখন ঘোর বিপদে পড়িয়াছি। আমার একটি আধুলি ছিল; একজনকে তাহা আমি ধার দিয়াছি। তাহার সহিত নিয়ম হইয়াছে যে, যাহা বাকী থাকিবে প্রতিদিন সে তাহার অর্ধেক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিবে। প্রথম দিন সে আমাকে চারি আনা দিবে, দ্বিতীয় দিন দুই আনা

দিবে, তৃতীয় দিন এক আনা, চতুর্থ দিন দুই পয়সা, পঞ্চম দিন সে এক পয়সা দিবে। এক পয়সায় হয় পাঁচ গণ্ডা, অর্থাৎ কুড়ি কড়া। ষষ্ঠ দিনে সে আমাকে দশ কড়া দিবে। তার পরদিন সে আমাকে পাঁচ কড়া দিবে। তার পরদিন আড়াই কড়া, তার পরদিন স-কড়া, তার পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক, পরদিন তার অর্ধেক—"

অতি চমৎকার সুমিষ্ট কান্না-সুরে ব্যাঙ এইবার গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "ওগো মা গো! এ যে আর কখনও শোধ হবে না গো! আমার আধুলিটি যে আর কখন পুরাপুরি হবে না গো! ওগো আমি কোথায় যাব গো! জুয়াচোরের হাতে পড়িয়া আমার যে সর্বস্ব গেল গো! ওগো আমার যে ওই আধুলিটি বই পৃথিবীতে আর কিছু নাই গো! ওগো তা লইয়া মানুষে যে ঠাট্টা করে গো! ব্যাঙের আধুলি, ব্যাঙের আধুলি বলিয়া মানুষে যে হিংসায় ফাটিয়া মরে গো! ওগো মা গো! আমার কি হল গো!"

ব্যাঙ পুনরায় আধ-কান্না সুরে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া বলিলেন, "ওগো! আমি যে মনে করিয়াছিলাম, দুই দণ্ড বসিয়া তোমার সঙ্গে গল্পগাছা করিব গো! ওগো তা যে আর হইল না গো! ওগো আমার যে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল গো! ওগো তুমি ওই দিক্ দিয়া যাও গো! তাহা হইলে লোকালয়ে পৌঁছিতে পারিবে গো! ওগো সে যে অনেক দূর গো! ওগো আজ সেখানে যাইতে পারিবে না গো! ওগো তোমরা যে আমাদের মত লাফাইতে পার না গো! ওগো তোমরা যে গুটি-গুটি চলিয়া যাও গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে হাসি পায় গো! ওগো তোমাদের চলন দেখিয়া, আমার যে কান্না পায় না গো! ওগো তুমি যে লোক ভাল গো! ওগো লেখাপড়া শিখিয়া তুমি মন্দা মেয়েমানুষ হওনি গো! ওগো তুমি যে ধীর শান্ত, লজ্জাশীলা পতিপরায়ণা গো!, ওগো তুমি যে মেয়ে-জ্যাঠা নও গো! ওগো আমার যে আধুলিটি এইবার জন্মের মতো গেল গো! ওগো আমার কি হইল গো! ওগো মা গো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পচা জল

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, একে আপনার দুঃখে মরি, তাহার উপর এ আবার এক জ্বালা। যাহা হউক ব্যাঙের কান্না একটু থামিয়াছে। এইবার আমি যাই।

ব্যাঙ যেরূপ বলিয়া দিলেন, কঙ্কাবতী সেই পথ দিয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তবুও বন পার হইতে পারিলেন না। যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখন তিনি অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর চলিতে পারিলেন না। বনের মাঝখানে একখানি পাথরের উপর বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাথরের উপর বসিয়া কঙ্কাবতী কাঁদিতেছেন, এমন সময় মৃদু মধুর তানে গুন্‌গুন্ করিয়া কে তাঁহার কানে বলিল, "তোমরা কারা গা? তুমি কাদের মেয়ে গা?"

কঙ্কাবতী এদিক্ ওদিক্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অবশেষে দেখিতে পাইলেন যে একটি অতি ক্ষুদ্র মশা তাঁহার কানে এই কথা বলিতেছে। মশাটিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে সেটি নিতান্ত বালিকা মশা।

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আমি মানুষের মেয়ে গো, আমার নাম কঙ্কাবতী।"

মশা-বালিকা বলিলেন, "মানুষের মেয়ে! আমাদের খাবার? বাবা যাদের রক্ত নিয়ে আসেন? খাই বটে, কিন্তু মানুষ কখনও দেখি নাই। আমরা ভদ্র মশা কি না? তাই আমরা ওসব কথা জানি না। আমি কখনও মানুষ দেখি নাই। কিরূপ গাছে মানুষ হয়, তাহাও আমি জানি না। কই? দেখি দেখি। মানুষ আবার কিরূপ হয়!"

এই বলিয়া মশা-বালিকা, কঙ্কাবতীর চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

ভাল করিয়া দেখিয়া শেষে মশা-বালিকা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ধাড়ী মানুষ না ও, বাচ্ছা মানুষ। না?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "নিতান্ত ছেলে মানুষ নই, তবে এখনও লোকে আমাকে বালিকা বলে।"

মশা-বালিকা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বলিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আমার নাম কঙ্কাবতী।"

মশা-বালিকা বলিলেন, "ভাল হইয়াছে। আমার নাম রক্তবতী। ছেলেবেলা রক্ত খাইয়া পেটটি আমার টুপটুপে হইয়া থাকিত, বাবা তাই আমার নাম রাখিয়াছেন রক্তবতী। আমাদের দুই জনের নামে নামে বেশ মিল হইয়াছে, রক্তবতী আর কঙ্কাবতী। এস ভাই আমরা দুইজনে কিছু একটা পাতাই।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমি এখন বড় শোক পাইয়াছি, এখন ঘোর মনোদুঃখে আছি। আমি এখন পতিহারা সতী। তুমি বালিকা সে সব কথা বুঝিতে পারিবে না। কিছু পাতাইয়া আহ্লাদ-আমোদ করি এখন আমার সে সময় নয়।"

রক্তবতী বলিলেন, "তুমি পতিহারা সতী। তার জন্য আর ভাবনা কি? বাবা বাড়ি আসুন, বাবাকে আমি বলিব। বাবা তোমার কত পতি আনিয়া দিবেন। এখন এস ভাই। কিছু একটা পাতাই। কি পাতাই বল দেখি? আমি পচাজল বড় ভালবাসি। যেখানে পচাজল থাকে, মনের সুখে আমি সেখানে উড়িয়া বেড়াই, পচাজলের ধারে উড়িয়া উড়িয়া আমি কত খেলা করি। তোমার সহিত আমি 'পচাজল' পাতাইব। তুমি আমার পচাজল আমি তোমার পচাজল! কেমন মনের মতন হইয়াছে তো?"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, ইহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। বুড়ো মিন্‌সে ব্যাঙ তারেই বড় বুঝাইয়া পারিলাম, তা এ তো একটা সামান্য বালিকা মশা। ইহার এখনও জ্ঞান হয় নাই। ইহাদের যাহা ইচ্ছা হয় করুক। আর আমি কোনো কথা কহিব না।

কঙ্কাবতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তাহাই ভাল। আমি তোমার পচাজল, তুমি আমার পচাজল। হা জগদীশ্বর, হে হৃদয়দেবতা, তুমি কোথায়, আর আমি কোথায়! সেখানে তোমার কি দশা, আর এখানে আমার কি দশা!"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী বার বার নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, আর কাঁদিতে লাগিলেন।

পচাজলের দুঃখ দেখিয়া মশা-বালিকাটিরও দুঃখ হইল। মশা-বালিকাটি

বুঝিতে পারেন না যে, তাঁর পচাজল এত কাঁদেন কেন? গুন্ গুন্ করিয়া কঙ্কাবতীর চারিদিকে তিনি উড়িয়া দেখিতে লাগিলেন।

রক্তবতী বলিলেন, "পচাজল, তোমার ভাই আর দুটি পা কোথায় গেল? উপরের দুটি পা আছে, নীচের দুটি পা আছে, মাঝের দুটি পা কোথায় গেল? ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝি? ওঃ! সেইজন্য তুমি কাঁদিতেছ? তার আবার কান্না কি পচাজল? খেলা করিতে করিতে আমারও একটি পা ভাঙিয়া গিয়াছিল। এই দেখ, সে পা-টি পুনরায় গজাইতেছে। তোমারও পা সেইরূপ গজাইবে, চুপ কর, কাঁদিও না!"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমার পা ভাঙিয়া যায় নাই। তোমাদের মতো আমাদের পা নয়। আমাদের পা এইরূপ। পায়ের জন্য কাঁদি নাই।"

মশা-বালিকা পুনরায় গুন্‌গুন্ করিয়া উড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া, কঙ্কাবতীর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমুদয় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে কঙ্কাবতীর নাকের কাছে গিয়া বলিলেন, "একি ভাই পচাজল! সর্বনাশ! তোমার নাক কোথায় গেল? তোমার নাকটি কে কাটিয়া নিল? আহা! তোমার নাক নাই তো খাবে কি দিয়া?"

মশা-বালিকা কি বলিতেছে, কঙ্কাবতী তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। পরে বুঝিলেন যে, সে শুঁড়ের কথা বলিতেছে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন যে, "এ মশা-বালিকাটি নিতান্ত শিশু, এখনও ইহার কিছুমাত্র জ্ঞান হয় নাই।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আমাদের নাক এইরূপ। তোমাদের নাক যেরূপ দীর্ঘ, আমাদের নাক সেরূপ লম্বা নয়। আমরা নাক দিয়া খাই না, আমরা মুখ দিয়া খাই।"

রক্তবতী বলিলেন, "আহা! তবে পচাজল, তোমার কি দুরদৃষ্ট যে আমার মত তোমার নাক নয়! এই বড় নাকে আমাকে কেমন দেখায় দেখ দেখি। জলের উপর গিয়া আমি আমার মুখখানি দেখি, আর মনে মনে কত আহ্লাদ করি। মা বলেন যে, বড় হইলে আমার রক্তবতী একটি সাক্ষাৎ সুন্দরী হইবে। তা ভাই পচাজল, তোমাকেও আমি সুন্দরী করিব। বাবা বাড়ি আসিলে বাবাকে বলিব, তিনি তোমার নাকটি টানিয়া বড় করিয়া দিবেন। তখন তোমাকে বেশ দেখাইবে।"

কঙ্কাবতী ভাবিলেন, "আবার সেই নাকের কথা। নাক নাক করিয়া ইহারা সব সারা হইয়া গেল। কাঁকড়া নাকের কথা বলিয়াছিল, ব্যাঙ বলিয়াছিল; এই মশা-বালিকাও সেই কথা বলিতেছে। তার পর সেই নাকেশ্বরীর নাক। উঃ! কি ভয়ানক।"

কঙ্কাবতী আরও ভাবিতে লাগিলেন, "এই ঘোর দুঃখের সময় আমি বড় বিপদেই পড়িলাম। কোথায় তাড়াতাড়ি গ্রামে গিয়া চিকিৎসক আনিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিব; না, ওখানে ব্যাঙ, এখানে মশা, সকলে মিলিয়া আমাকে বিষম জ্বালাতনে ফেলিল। ব্যাঙের হাত এড়াইতে না এড়াইতে মশার হাতে পড়িলাম। মশার একরতি মেয়েটি তো এই রঙ্গ করিতেছেন, আবার ইহার বাপ বাড়ি আসিয়া যে কি রঙ্গ করিবেন, তা তো বলিতে পারি না।"

রক্তবতী বলিলেন, "ওই যে পাতাটি দেখিতেছ পচাজল, যার কোণটি কুঁকড়ে রহিয়াছে? উহার ভিতর আমাদের ঘর। আমার মারা উহার ভিতরে আছেন। আমার তিন মা। বাবা চরিতে গিয়াছেন, বাবা এখনই কত খাবার আনিবেন। যাই, মাদের বলিয়া আসি যে আমার পচাজল আসিয়াছে।"

এই বলিয়া রক্তবতী ঘরের দিকে উড়িয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে রক্তবতী পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "পচাজল, মা তোমাকে ডাকিতেছেন। উঠ চল। আমার মার সঙ্গে দেখা করিবে।"

কঙ্কাবতী করেন কি? ধীরে ধীরে উঠিলেন। মশাদের ঘর সেই কোঁকড়ানো পাতাটির কাছে যাইলেন।

একটি নবীনা মশানী কুঞ্চিত পত্রকোণ হইতে ঈষৎ মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ গো বাছা! তুমি আমার রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ? তা বেশ করিয়াছ। রক্তবতী আমাদের বড় আদরের মেয়ে। কর্তার এত বিষয়-বৈভব, তা আমার এই রক্তবতীই তাঁর একমাত্র সন্তান। তা, হাঁ গা বাছা, রক্তবতী কি তোমার পতির কথা বলিতেছিল? কি হইয়াছে?"

কঙ্কাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "ওগো আমি বড় দুঃখিনী! আমি বড় শোক পাইয়াছি। পৃথিবী আমি অন্ধকার দেখিতেছি। যদি আমার পতিকে আমি না পাই তবে এ ছার প্রাণ আমি কিছুতেই রাখিব না। আমার

পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। পতিকে বাঁচাইবার নিমিত্ত আমি লোকালয়ে যাইতেছি। সেখান হইতে ভাল চিকিৎসক আনিব, আমার স্বামীকে দেখাইব। তাই আমি বিলম্ব করিতে পারি না। পুনরায় আমি এই রাত্রিতেই পথ চলিব। কিন্তু আমি পথ জানি না, অন্ধকারে আমি পথ দেখিতে পাইব না। তোমরা আমাকে যদি একটু পথ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে আমার বড় উপকার হয়।"

মশানী বলিলেন, "ছেলেমানুষ, বালিকা তুমি, তোমার কোনো জ্ঞান নাই। একে আমরা স্ত্রীলোক, যে-সে মশার স্ত্রী নই, গণ্য-মান্য সম্ভ্রান্ত মশার স্ত্রী। তাতে আমরা পর্দানশীন, কুলের কুলবধূ। আমাদিগের কি ঘরের বাহিরে যাইতে আছে, বাছা? না, আমরা পথঘাট জানি? তুমি কাঁদিও না। কর্তা বাড়ি আসুন, কর্তাকে আমি ভাল করিয়া বলিব। তুমি এখন আমাদের কুটুম্ব; রক্তবতীর পচাজল। যাহা ভাল হয় তোমার জন্য কর্তা অবশ্যই করিবেন। তুমি একটু অপেক্ষা কর।"

কঙ্কাবতীর সহিত যিনি এতক্ষণ কথা কহিতেছিলেন, তিনি রক্তবতীর মা। মশার ছোট-রানী। এইবার মশার বড়-রানী পাশ দিয়া একটু মুখ বাড়াইলেন।

বড়-মশানী বলিলেন, "ওটা একটা মানুষের ছানা বুঝি? আমি ওরে পুষিব। আমার ছেলেপিলে নাই। অনেক দিন ধরিয়া আমার মনে সাধ আছে যে, জীব-জন্তু কিছু একটা পুষি। তা ভাল হইয়াছে, ওই মানুষের ছানাটা এখানে আসিয়াছে। ওটাকে আমি পুষিব। কিছু বড় হইয়া গিয়াছে সত্য, তা যাই হউক এখনও পোষ মানিবার সময় আছে। মানুষে শুনিয়াছি মেষ, ছাগল, পায়রা এই সব খায়। আবার সাধ করিয়া তাদের পোষে। এই মানুষের ছানাটাকে পুষিলে ইহার উপর আমার মায়া পড়িবে। ইহাকে খাইতে তখন আর আমার ইচ্ছা হইবে না।"

মেজ-মশানী আর এক পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন, "দিদি, তোমার এক কথা। মানুষের ছানাটাকে যদি পুষিবে তো যাতে কাজে লাগে, এরূপ করিয়া পুষিয়া রাখ। মানুষে যেরূপ দুধের জন্য গরু পোষে, সেইরূপ করিয়া ইহাকে ঘরে পুষিয়া রাখ। কর্তা কতদূর হইতে রক্ত লইয়া আসেন। আনিতে আনিতে রক্ত বাসী হইয়া যায়। মানুষ একটি ঘরে পোষা থাকিলে যখন ইচ্ছা হইবে তখন টাট্‌কা রক্ত খাইতে পাইব।"

রক্তবতীর মা বলিলেন, "তোমাদের সব এক কথা। সব তাতেই

তোমাদের প্রয়োজন। ছেলেমানুষ রক্তবতী মানুষের ছানাটিকে পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে। পুষিতে কি খাইতে সে তোমাদিগকে দিবে কেন? ছেলের হাতের জিনিসটি তোমরা কাড়িয়া লইতে চাও। তোমাদের কিরূপ বিবেচনা বল দেখি? আসুন আজ কর্তা আসুন, তাঁহাকে সকল কথা বলিব। এ সংসারে আর আমি থাকিতে চাই না। আমাকে তিনি বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিন। আমার বাপ ভাই বাঁচিয়া থাকুক। আমার ভাবনা কিসের? আমি ছন্নছাড়া আঁটকুড়োদের মেয়ে নই। আমার চারিদিকে সব জাজ্বল্যমান।"

বড়-মশানী বলিলেন, "আঃ মর্, ছুঁড়ির কথা শুন। বাপ-ভাইয়ের গরবে ওঁর মাটিতে পা পড়ে না। বাপ-ভাইয়ের মাথা খাও।"

এইরূপে তিন সপত্নীতে ধুন্ধুমার ঝগড়া বাধিয়া গেল। কঙ্কাবতী অবাক্। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, ভাল কথা, জীব-জন্তুর মত ইহারা আমাকে পুষিতে চায়!

তিন সতীনে ঝগড়া ক্রমে একটু থামিল। কখন মশা ঘরে আসিবেন, সেই প্রতীক্ষায় কঙ্কাবতী সেইখানে বসিয়া রহিলেন। অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল, তবু মশা ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, তোমাদের কর্তার এত বিলম্ব হইতেছে কেন?"

ছোট-রানী বলিলেন, "বাঁশ কাটছেন, ভার বাঁধছেন, রক্ত নিয়ে আসছেন পারা।"

অর্থাৎ কিনা, কর্তা হয়তো আজ অনেক রক্ত পাইয়াছেন। একেলা বহিয়া আনিতে পারিতেছেন না। তাই বাঁশ কাটিয়া ভার বাঁধিয়া মুটে করিয়া রক্ত আনিতেছেন। বিলম্ব সেইজন্য হইতেছে।

কঙ্কাবতী আরও কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তবুও মশা ঘরে ফিরিলেন না।

কঙ্কাবতী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কর্তা কখন আসিবেন গা? বড় যে বিলম্ব হইতেছে।"

এবার মধ্যম-মশানী উত্তর দিলেন, "তুষের ধোঁ, কুলোর বাতাস, কোণ নিয়েছেন পারা।"

অর্থাৎ কিনা, চরিবার নিমিত্ত কর্তা হয়তো কোনো লোকের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। সে লোক তুষের অগ্নি করিয়া তাহার উপর সর্পের

বাতাস দিয়া, ঘর ধূমে পরিপূর্ণ করিয়াছে। কর্তা গিয়া ঘরের এক কোণে লুক্কায়িত হইয়াছেন, বাহির হইতে পারিতেছেন না। সেইজন্য বিলম্ব হইতেছে। একটু ধূম কমিলে বাহির হইয়া আসিবেন।

কঙ্কাবতী আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কই গা, তিনি তো এখনও এলেন না। আর কত বিলম্ব হইবে?"

এইবার বড়-মশানী উত্তর করিলেন, "কটাস্ কামড়, চটাস্ চাপড়, মরে গিয়াছেন পারা।"

অর্থাৎ কিনা, কর্তা হয়তো কোনও লোকের গায়ে বসিয়াছিলেন। গায়ে বসিয়া যেমন কটাস্ করিয়া কামড় মারিয়াছেন, আর অমনি সে লোকটি একটি চটাস্ করিয়া চাপড় মারিয়াছে। সেই চাপড়ে কর্তা হয়তো মরিয়া গিয়াছেন।

কর্তা মরিয়া গিয়াছেন, এইরূপ অকল্যাণের কথা শুনিয়া ছোট-রানী ফোঁস করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার যত বড় মুখ, তত বড় কথা। আসুন কর্তা, তাঁরে বলি যে, 'তুমি মরিয়া গেলে তোমার বড় রানীর হাড়ে বাতাস লাগে।' তোমার মুখে চুন-কালি দিয়া তোমার মাথা মুড়াইয়া তোমার মাথায় ঘোল ঢালিয়া তোমাকে এখনই বিদায় করিবেন।"

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

মশা প্রভু

তিন সতীনে পুনরায় ঘোরতর বিবাদ বাধিল। রক্তবতী চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মশার ঘরে কোলাহলের রোল উঠিল। এমন সময় মশা বাড়ি আসিলেন। ঘরে কলহ-কচকচির কোলাহল শুনিয়া মশার সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মশা বলিলেন, "এ যন্ত্রণা আর আমার সহ্য হয় না। তোমাদের ঝগড়ার জ্বালায় আমাদের ঘরের কাছে গাছের ডালে কাক-চিল বসিতে পারে না। যেখানে এরূপ বিবাদ হয় সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। তালুকে মনুষ্যদিগের শরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। ইচ্ছা হয় যে গলায় দড়ি দিয়া মরি, কি বিষ খাইয়া মরি। আত্মহত্যা করিয়া আমাকে মরিতে হইবে। এই সেদিন ধর্মে ধর্মে আমার প্রাণটি রক্ষা হইয়াছে। আমি একজন আফিমখোরের গায়ে বসিয়াছিলাম। তাহার রক্ত কি তিক্ত, এক শুঁড় রক্ত সব ফেলিয়া দিলাম। বার বার কুলকুচা করিয়া তবে প্রাণ রক্ষা হইল। মনে করিলাম অপঘাত মৃত্যুতে মরিব! তাই এত কাণ্ড করিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। কিন্তু তোমাদের জ্বালায় এত জ্বালাতন হইয়াছি যে বাঁচিতে আর আমার তিলমাত্র সাধ নাই।"

এইরূপে মশা স্ত্রীগণকে অনেক ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার রাগ পড়িলে তিনি একটু সুস্থির হইলে রক্তবতী গিয়া তাঁহার কোলে বসিলেন।

রক্তবতী বলিলেন, "বাবা, আমার পচাজল আসিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আবার কে? পচাজল আবার কি?"

রক্তবতীর মা উত্তর করিলেন, "ওগো একটি মানুষের কন্যা। সন্ধ্যা হইতে এখানে বসিয়া আছে। রক্তবতী তাহার সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। আহা, বালিকা এখানে আসিয়া পর্যন্ত কেবল কাঁদিতেছে। বলে, আমি পতিহারা সতী। পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। আমি লোকালয়ে যাইব, সেখান হইতে বৈদ্য আনিয়া আমার পতিকে ভাল করিব। আমি তাকে বলিলাম, বাছা একটু অপেক্ষা কর। কর্তাটি বাড়ি আসুন, তাঁহার সাহত

পরামর্শ করিয়া তোমার একটা উপায় করা যাইবে। তুমি যখন রক্তবতীর পচাজল হইয়াছ, তখন তোমার দুঃখ মোচন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।—রক্তবতীর পচাজল হইবে। রক্তবতী পচাজলকে লইয়া সাধ-আহ্লাদ করিবে, তোমার আর দুইটি রানীর প্রাণে সহিবে কেন? তাঁদের আবার ওই মানুষের ছানাটিকে পুষিতে সাধ হইল। সেই কথা লইয়া আমাকে তাঁরা যা-না-তাই বলিলেন। তা আমার আর এখানে থাকিয়া আবশ্যক নাই। তুমি আমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দাও। দিয়া দুই রানী নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না কর। আমি তোমার কণ্টক হইয়াছি। আমি এখান হইতে যাই।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে মানুষের কন্যাটি কোথায়?"

রক্তবতীর মা বলিলেন, "ওই বাহিরে বসিয়া আছে।"

রক্তবতী বলিলেন, "বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমার পচাজল কোথায় আমি এখনই দেখাইয়া দিব।"

মশা ও রক্তবতী দুই জনে উড়িলেন। বিষণ্ণ বদনে অশ্রুপূরিত নয়নে যেখানে কঙ্কাবতী বসিয়াছিলেন, গুন্‌গুন্ করিয়া দুই জনে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রক্তবতী বলিলেন, "পচাজল, এই দেখ বাবা আসিয়াছেন।"

কঙ্কাবতী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া মশাকে নমস্কার করিলেন। কঙ্কাবতীকে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবেন বলিয়া মশা গিয়া একটি ঘাসের ডগার উপর বসিলেন। তাহার পাশে আর একটি ঘাসের ডগার উপর রক্তবতী বসিলেন। মশার সম্মুখে হাত জোড় করিয়া কঙ্কাবতী দণ্ডায়মান রহিলেন।

অতি বিনীতভাবে কঙ্কাবতী বলিলেন, "মহাশয়, বিপন্না অনাথা বালিকা আমি। জনশূন্য এই গহন কাননে আমি একাকিনী। আমি পতিহারা সতী। আমি দুঃখিনী কঙ্কাবতী। প্রাণসম পতি আমার ভূতিনীর হস্তগত হইয়াছেন। আমার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিন। আমি আপনার শরণ লইলাম।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার সম্পত্তি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "মহাশয়, পূর্বে আমি পিতার সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্য-বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দানবিক্রয়ের অধিকার

পিতার থাকে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি দান-বিক্রয় করিতে পারেন। জ্ঞান না হইতে হইতে মাতা পিতা আপন আপন বালিকাদিগকে দান-বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আমাদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত। আমার পিতা তিন সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমি আমার পতির সম্পত্তি, যে পতিকে হারাইয়া অনাথা হইয়া আজ আমি বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। পূর্বে পিতার সম্পত্তি ছিলাম। এক্ষনে আমি আমার পতির সম্পত্তি।"

মশা বলিলেন, "উঁহু, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "কোন্ মশার সম্পত্তি! সে কথা তো আমি কিছুই জানি না। কই, আমি তো কোনো মশার সম্পত্তি নই।"

মশা বলিলেন, "রক্তবতী, তোমার পচাজল দেখিতেছি পাগলিনী, উন্মত্তা। ইহার কোনও জ্ঞান নাই। সঠিক সত্য সত্য কথার উত্তর না পাইলে তোমার পচাজলের কি করিয়া আমি উপকার করি?"

রক্তবতী বলিলেন, "ভাই পচাজল, বাবা যে কথা জিজ্ঞাসা করেন, সত্য সত্য তাহার উত্তর দাও।"

মশা বলিলেন, "শুন মনুষ্য-শাবক, এই ভারতে যত নর-নারী দেখিতে পাও, ইহারা সকলেই মশাদিগের সম্পত্তি। যে মশা মহাশয় তোমার অধিকারী তাঁহার নিকট হইতে বোধ হয় তুমি পলাইয়া আসিয়াছ। সেই ভয়ে তুমি আমার নিকট সত্য কথা বলিতেছ না, আমার নিকট কথা গোপন করিতেছ। তোমার ভয় নাই, তুমি সত্য সত্য আমার কথার উত্তর দাও। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি কোন্ মশার সম্পত্তি? কোন্ মশা তোমার গায়ে উপবিষ্ট হইয়া রক্ত পান করেন? তাঁহার নাম কি? তাঁহার নিবাস কোথায়? তাঁহার কয় স্ত্রী? কয় পুত্র? কয় কন্যা? পৌত্র দৌহিত্র আছে কি না? তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধুদিগের তোমার উপর কোনও অধিকার আছে কি না? তাঁহারা তোমাকে এজমালিতে রাখিয়াছেন, কি তোমার হস্তপদাদি বণ্টন করিয়া লইয়াছেন? যদি তুমি বণ্টিত হইয়া থাক, তাহা হইলে সে বিভাগের কাগজ কোথায়? মধ্যস্থ দ্বারা তুমি বণ্টিত হইয়াছ, কি আদালত হইতে আমিন আসিয়া তোমাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে?

এই সব কথায় তুমি আমাকে সঠিক উত্তর দাও। কারণ, আমি তোমাকে কিনিয়া লইবার বাসনা করি। আমার তালুকে অনেক মানুষ আছে। মানুষের অভাব নাই। আমার সম্পত্তি নরনারীগণের দেহে যা রক্ত আছে তাহাই খায় কে? তবে তুমি রক্তবতীর সহিত পচাজল পাতাইয়াছ, সেই জন্য তোমাকে আমি একেবারে কিনিয়া লইতে বাসনা করি। তাহা যদি না করি তাহা হইলে তোমার অধিকারী মশাগণ আমার নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারেন। তোমাকে এখান হইতে তাঁহারা পুনরায় লইয়া যাইতে পারেন। আমার রক্তবতী তাহা হইলে কাঁদিবে। আমি আর একটি কথা বলি, এরূপ করিয়া এক গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে ভারতবাসী-দিগের যাওয়া উচিত নয়। ভারতবাসীদিগের উচিত আপন আপন গ্রামে বসিয়া থাকা। তাহা করিলে মশাদিগের মধ্যে সম্পত্তি লইয়া আর বিবাদ হয় না। মশাগণ আপন আপন সম্পত্তি সুখে-স্বচ্ছন্দে সম্ভোগ করিতে পারেন। শীঘ্রই আমরা ইহার একটা উপায় করিব। এক্ষণে আমার কথার উত্তর দাও। এখন বল তোমার মশা-প্রভুর নাম কি?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "মহাশয়, আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি। আমার মশা-প্রভুর নাম আমি জানি না। মনুষ্যেরা যে মশাদিগের সম্পত্তি তাহাও আমি এত দিন জানিতাম না। মশাদিগের মধ্যে যে মনুষ্যেরা বিতরিত, বিক্রীত ও বণ্টিত হইয়া থাকে তাহাও আমি জানিতাম না। মশাদিগের যে আবার নাম থাকে তাহাও আমি জানি না। তা আমি কি করিয়া বলি যে, আমি কোন্ মশার সম্পত্তি?"

ক্রোধে মশা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। রাগে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। মশা বলিলেন, "না, তুমি কিছুই জান না! তুমি কচি খুকীটি! গায়ে কখনও মশা বসিতে দেখ নাই! সে মশাগুলিকে তুমি চেন না! তাহাদের তুমি নাম জান না! তুমি ন্যাকা! পতিহারা সতী হইয়া কেবল পথে পথে কাঁদিতে জান!"

মশার এইরূপ তাড়নায় কঙ্কাবতী কাঁদিতে লাগিলেন। কঙ্কাবতীর পানে চাহিয়া রক্তবতী চক্ষু টিপিলেন। সে চক্ষু-টিপুনির অর্থ এই যে, পচাজল, তুমি কাঁদিও না। বাবা বড় রাগী মশা। একে রাগিয়াছেন, তাতে তুমি কাঁদিলে আরও রাগিয়া যাইবেন। চুপ কর। বাবার রাগ এখনই যাইবে।

রক্তবতী যা বলিলেন, তাই হইল। কঙ্কাবতীর কান্না দেখিয়া মশা আরও

রাগিয়া উঠিলেন। মশা বলিলেন, "এ কোথাকার প্যানপেনে মেয়েটা র‍্যা। ভ্যানোর ভ্যানোর করিয়া কাঁদে দেখ। আচ্ছা, যে সব কথা এতক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা-পড়া করিলাম, তার তুমি কিছুই জান না বলিলে! এখন এ কথাটার উত্তর দিতে পারিবে কি না? ভাল, এই যে সব মানুষ হইয়াছে, এই যে কোটি কোটি মানুষ ভারতে রহিয়াছে এ সব মানুষ কেন? কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? এ কথার আমাকে এখন উত্তর দাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মানুষ কেন, কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে? তা আমি জানি না।"

মশা বলিলেন, "এ! এ মেয়েটা নিতান্ত বোকা। একেবারে বদ্ধ পাগল। কিছু জানে না; এই ভারতের মানুষগুলো বড় বোকা, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত। রক্তবতী শিশু বটে। কিন্তু এর চেয়ে আমার রক্তবতীর লক্ষগুণে বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। তুমি বল তো মা রক্তবতী, ভারতের মানুষ কিসের জন্য সৃজিত হইয়াছে?"

রক্তবতী বলিলেন "কেন বাবা, আমরা খাব বলিয়া তাই হইয়াছে।"

মশা বলিলেন, "এখন শুনিলে? ভারতের মানুষ কিসের জন্য হইয়াছে, তা বুঝিলে?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, এখন বুঝিলাম। মশারা আহার করিবেন বলিয়া তাই মানুষের সৃজন হইয়াছে।"

রক্তবতী বলিলেন, "আমার পচাজল মানুষের ছানা বই তো নয়। মানুষদের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই। তা সকল মশাই জানে। নির্বোধ মশাকে সকলে মানুষ বলিয়া গালি দেয়। সকলে বলে, 'অমুক মশা তো মশা নয়, ওটা একটা মানুষ'। তা আমাদের মতো পচাজলের বোধ-শোধ কেমন করিয়া হইবে? আমার পচাজলকে বাবা তুমি আর বকিও না।"

মশা ভাবিলেন সত্য কথা। মানুষের ছানাটাকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা। আমাকে নিজেই সকল সন্ধান লইতে হইবে।

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলি হাঁগো মেয়ে। এখন তোমার বাড়ি কোন্ গ্রামে বল দেখি? তা বলিতে পারিবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামের নাম কুসুমঘাটী। মশা তৎক্ষণাৎ আপন অনুচরদিগকে কুসুমঘাটী পাঠাইলেন ও কঙ্কাবতীর প্রভুগণকে ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। দূতগণ কুসুমঘাটিতে উপস্থিত হইয়া

অনেক সন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, কঙ্কাবতীর অধিকারী তিনটি মশা। তাঁহাদের নাম গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড ও বিকৃততুণ্ড। রক্তবতীর পিতার নাম দীর্ঘশুণ্ড। দূতগণ শুনিলেন যে কঙ্কাবতীর অধিকারিগণের বাস আকাশমুখ নামক শালবৃক্ষ। সেইখানে যাইয়া কঙ্কাবতীর অধিকারিগণকে সকল কথা তাঁহারা বলিলেন। তাঁহারা দূতগণের সহিত আসিয়া অবিলম্বে দার্ঘশুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনেক বাদানুবাদ অনেক দর-কষাকষির পর তিনছটাক নররক্ত দিয়া কঙ্কাবতীকে দীর্ঘশুণ্ড কিনিয়া লইলেন। কঙ্কাবতীকে ক্রয় করিয়া তিনি কন্যাকে বলিলেন, "রক্তবতী, এই নাও তোমার পচাজল নাও। এই মানুষের ছানাটি এখন আমাদের নিজস্ব। ইহা এখন আমাদের সম্পত্তি।"

দীর্ঘশুণ্ড তাহার পর গজগণ্ড, বৃহৎমুণ্ড, বিকৃততুণ্ড প্রভৃতি মশাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহোদয়গণ, আমি দেখিতেছি, আমাদের ঘোর বিপদ উপস্থিত। ভারতবাসিগণের রক্ত পান করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় মশা এতদিন সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিলেন। ভারতের তিনদিকে কালাপানি, একদিকে অত্যুচ্চ পর্বতশ্রেণী। জীবজন্তুগণকে লোকে যেরূপ বেড়া দিয়া রাখে ভারতবাসিগণকে এতদিন আমরা সেইরূপ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ভারতের লোক ভারতে থাকিয়া এতদিন আমাদিগকে সেবা কারতেছিল, বিনীতভাবে শোণিত-দান করিয়া আমাদের দেহ পরিপোষণ করিতেছিল। এক্ষণে কেহ কেহ মহাসাগর ও মহাপর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এরূপ কার্য করিয়া আমাদিগকে রক্ত হইতে বঞ্চিত করিলে যে তাহাদের মহাপাতক হয় তাহা আপনারা সকলেই জানেন। যেমন করিয়া হউক, ভারতবাসিগণকে সে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। তাহার পর আবার ভারতবাসীদিগের এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনাগমন আজকাল কিছু অধিক হইয়াছে। এই দেখুন আজ সন্ধ্যাবেলা কুসুমঘাটী হইতে একটি মনুষ্য-শাবক আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে মনুষ্য-শাবকটি আপনাদের সম্পত্তি। আজ আপনাদের সম্পত্তি পলাইবে। কাল আমার সম্পত্তি পলাইবে। এই প্রকারে মনুষ্যেরা যদি এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যায় তাহা হইলে সম্পত্তি লইয়া আমাদের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার পর আবার বুঝিয়া দেখুন, দেশ-ভ্রমণের কি ফল। দেশভ্রমণ করিলে মনুষ্যেরা নানা নূতন

বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। মনুষ্যদিগের জ্ঞানের উদয় হয়। দেশভ্রমণ করিয়া ভারতবাসীদিগের যদি চক্ষু উন্মীলিত হয় তাহা হইলে মনুষ্যগণ আর আমাদের বশতাপন্ন হইয়া থাকিবে না। আবার বাণিজ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ক্রমে তাহারা ধনবান হইয়া উঠিবে। তখন মশারি প্রভৃতি নানা উপায় করিয়া রক্তপান হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে। অতএব যাহাতে ভারতবাসীরা বিদেশে গমনাগমন করিতে না পারে, যাহাতে এক গ্রামের লোক অপর গ্রামে যাইতে না পায়, এরূপ উপায় সত্বর আমাদিগকে করিতে হইবে।"

দীর্ঘশুণ্ডের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন, দীর্ঘশুণ্ড অতি বিচক্ষণ মশা। দীর্ঘশুণ্ডের অতি দূরদৃষ্টি। এরূপ বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ মশা পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবাসীরা যাহাতে ভবিষ্যতে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে না পারে এরূপ উপায় করা অবশ্যই কর্তব্য, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেন। মশাগণ অনেক অনুধাবনা, অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন যে, পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া একটি ভাল বিধি প্রচলিত করিতে হইবে, তবে লোকে সে বিধি প্রতিপালন করিবে। তা না হইলে লোকে মানিবে না। এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমাগত মশাবৃন্দ ভারতের মহা মহা পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে দীর্ঘশুণ্ড তাঁহাদিগকে মশাকুল-অনুমোদিত শাস্ত্রীয় বচন বাহির করিতে অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ অবিলম্বে বিধি বাহির করিলেন যে, এ কলিকালে ভারতবাসীদিগের পক্ষে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করা একেবারেই নিষিদ্ধ। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন করিলে অতি মহাপাতক হয়। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তবে কলিকালে ভারতবাসিগণ করিবে কি। কলিকালে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত এই বিধি আছে:

সদা কৃতাঞ্জলিপুটা [১] ব্যংশুকাঃ[২] পিহিতেক্ষণাঃ।
ঘোরান্ধতমসে কূপে সন্তু ভারতবাসিনঃ॥

---

১. অনুষ্টুপ ছন্দের বিধান অনুসারে প্রথম পাদের ষষ্ঠ ও সপ্তম অক্ষর দীর্ঘ হওয়া উচিত। কিন্তু 'লি' এবং 'পু' এই দুই অক্ষরেই হ্রস্ব স্বর রহিয়াছে।

২. 'ব্যংশুকাঃ'—সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদে শব্দটির অর্থ দেওয়া হয় নাই। ইহার অর্থ, বিগত (নাই) অংশুক (বস্ত্র) যাহাদিগের। 'যাহারা মশারি ব্যবহার করে না'—ইহাই বোধ হয় রচয়িতার অভিপ্রেত অর্থ।

পিবন্তু রুধিরঞ্চৈষাং যাবন্তো মশকা ভুবি।
অদ্যপ্রভৃতি বৈ লোকে বিধিরেষ প্রবর্তিতঃ॥

ইহার স্থূল অর্থ এই যে, কলিকালে ভারতবাসিগণ চক্ষে ঠুলি দিয়া হাত জোড় করিয়া অন্ধকূপের ভিতর বসিয়া থাকিবে। আর পৃথিবীর যাবতীয় মশা আসিয়া তাহাদিগের রক্ত শোষণ করিবে।

এইরূপ মনের মত ব্যবস্থা পাইয়া মশাগণ পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পণ্ডিতগণ যথাবিধি বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য মশাগণও আপন আপন দেশে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

খর্বুর

দীর্ঘশুণ্ড মশা বলিলেন, "রক্তবতী, এক্ষণে মনুষ্য-শাবকটি তোমার। ইহাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর।"

রক্তবতী বলিলেন, "পিতা, ইনি আমার ভগিনী। ইহার সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমার পচাজল বিপদে পড়িয়াছে। পচাজলের পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। কাঁদিয়া কাঁদিয়া পচাজল আমার সারা হইয়া গেল। যাহাতে আমার পচাজল আপনার পতি পায়, বাবা তুমি তাহাই কর।"

কি করিয়া কঙ্কাবতীর পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে, মশা আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। আগা-গোড়া সকল কথা কঙ্কাবতী তাঁহাকে বলিলেন।

ভাবিয়া চিন্তিয়া মশা শেষে বলিলেন, "তুমি আমার রক্তবতীর পচাজল। সে নিমিত্ত তোমার প্রতি আমার স্নেহের উদয় হইয়াছে। তোমাকে আর আমরা কেহ খাইব না। স্নেহের সহিত তোমাকে আমরা প্রতিপালন করিব। যাহাতে তুমি তোমার পতি পাও সে জন্যও যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আমার তালুকে খর্বুর মহারাজ বলিয়া একটি মনুষ্য আছে। শুনিয়াছি সে নানারূপ ঔষধ, নানারূপ মন্ত্র-তন্ত্র জানে। আকাশে বৃষ্টি না হইলে মন্ত্র পড়িয়া মেঘে সে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শিলা-বৃষ্টি পড়-পড় হইলে সে নিবারণ করিতে পারে। বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই সে বলিতে পারে, এ ডাইনী কি ডাইনী নয়। তাহাকে দেখিবামাত্র ভূতগণ পলায়ন করে। তাহার মত গুণী মনুষ্য পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে তোমার পতিকে সে-ই উদ্ধার করিতে পারিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "তবে মহাশয়, আর বিলম্ব করিবেন না। চলুন, এখনই তাঁহার নিকট যাই। মহাশয়, স্বামিশোকে শরীর আমার প্রতিনিয়তই দগ্ধ হইতেছে, সংসার আমি শূন্য দেখিতেছি। তাঁহার প্রাণরক্ষা হইবে কেবল এই প্রত্যাশায় জীবিত আছি। তা না হইলে, কোন কালে এ পাপ প্রাণ বিসর্জন দিতাম।"

মশা বলিলেন, "অধিক রাত্রি হইয়াছে, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ। আমার তালুক নিতান্ত নিকট নয়। তবে রও, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাই। তাহার পিঠে চড়িয়া আমরা সকলে এখনই খর্বুর মহারাজের নিকট গমন করিব।"

মশা এই বলিয়া আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কিছুক্ষণ বিলম্বে মশার ছোট ভাই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মশানীগণ তাঁহাকে 'হাতি-ঠাকুরপো', 'হাতি-ঠাকুরপো' বলিয়া অনেক সমাদর ও নানারূপ পরিহাস করিতে লাগিলেন।

রক্তবতী তাঁহাকে বলিলেন, "কাকা, আমি একটি মানুষের ছানা পাইয়াছি। তাহার সহিত আমি পচাজল পাতাইয়াছি। আমি পচাজলকে বড় ভালবাসি, আমার পচাজলও আমাকে বড় ভালবাসে।"

কঙ্কাবতী আশ্চর্য হইলেন। মশার ছোট ভাই হাতি, প্রকাণ্ড হস্তী। বনের সকলে তাঁহাকে হাতি-ঠাকুরপো বলিয়া ডাকে।

রক্তবতীর পিতা হস্তীকে বলিলেন, "ভায়া, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। রক্তবতী একটি মানুষের মেয়ের সহিত পচাজল পাতাইয়াছে। মেয়েটির পতিকে নাকেশ্বরী খাইয়াছে। মেয়েটি পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। রক্তবতীর দয়ার শরীর। রক্তবতী তার দুঃখে বড় দুঃখী। আমি তাই মনে করিয়াছি যদি কোনো মতে পারি তো তার স্বামীকে উদ্ধার করিয়া দিই। খর্বুর মহারাজের দ্বারাই এ কার্য সাধিত হইতে পারিবে। তাই আমার ইচ্ছা যে, এখনই খর্বুরের নিকট যাই। কিন্তু মানুষের মেয়েটি পথ হাঁটিয়া ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া অতিশয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এত পথ সে চলিতে পারিবে না। এখন ভায়া তুমি যদি কৃপা কর তবেই হয়। আমাদিগকে যদি পিঠে করিয়া লইয়া যাও তো বড় উপকার হয়।"

হাতি-ঠাকুরপো সে কথায় সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতী মশানীদিগকে নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রক্তবতীর গলা ধরিয়া কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভাই পচাজল, তুমি আমার অনেক উপকার করিলে। তোমার দয়া, তোমার ভালবাসা, কখনও ভুলিতে পারিব না। যদি ভাই পতি পাই, তবে পুনরায় দেখা হইবে। তা না হইলে ভাই এ জনমের মত তোমার পচাজল এই বিদায় হইল।"

রক্তবতীর চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল, রক্তবতীর চক্ষু হইতে অশ্রুবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ভূতলে পতিত হইতে লাগিল।

মশা ও কঙ্কাবতী দুইজনে হাতির পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। হাতি-ঠাকুরপো মৃদুমন্দ গতিতে চলিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে সমস্ত রাত্রি গত হইয়া গেল। অতি প্রত্যূষে খর্বুরের বাটীতে গিয়া সকলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, খর্বুর শয্যা হইতে উঠিয়াছেন। অতি বিষণ্ণ-বদনে আপনার দ্বারদেশে বসিয়া আছেন। একটু একটু তখনও অন্ধকার রহিয়াছে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদের চন্দ্র তখনও অস্ত যান নাই। খর্বুরের বিষণ্ণ মূর্তি দেখিয়া আকাশের চাঁদ অতি প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। চাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। চাঁদের হাসি দেখিয়া খর্বুরের রাগ হইতেছে। খর্বুর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "এই চাঁদের একদিন আমি দণ্ড করিব। চাঁদকে যদি উচিতমত দণ্ড না দিতে পারি, তাহা হইলে খর্বুরের গুণ-জ্ঞান, তুক-তাক্, মন্ত্র-তন্ত্র, শিকড়-মাকড়, সবই বৃথা।

মশা, কঙ্কাবতী ও হস্তী গিয়া খর্বুরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মশাকে দেখিয়া খর্বুর শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

হাত জোড় করিয়া খর্বুর বলিলেন, "মহাশয়, আজ প্রাতঃকালে কি মনে করিয়া? প্রতিদিন তো সন্ধ্যার সময় আপনার শুভাগমন হয়। আজ দিনের বেলা কেন? ঘরে কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আসিয়াছেন না কি? তাই কনিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন যে, তাঁহার পিঠে বোঝাই দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত লইয়া যাইবেন?"

মশা উত্তর করিলেন, "না, তা নয়, সেজন্য আমি আসি নাই, কি জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি। আপাততঃ জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিষণ্ণমুখে বসিয়া আছ কেন? এরূপ বিষণ্ণবদনে থাকা তো উচিত নয়! মনোদুঃখে থাকিতে তোমাদিগকে বারবার নিষেধ করিয়াছি। মনের সুখে না থাকিলে শরীরে রক্ত হয় না, সে রক্ত সুস্বাদু হয় না। মনের সুখে যদি তোমরা না থাকিবে, পুষ্টিকর তেজস্কর দ্রব্য-সামগ্রী যদি আহার না করিবে, তবে তোমাদের রক্তহীন দেহে বসিয়া আমাদের ফল কি? তোমরা সব যদি নিয়ত এরূপ অন্যায় কার্য করিবে, তবে আমরা পরিবারবর্গকে কি করিয়া প্রতিপালন করিব? তোমাদের মনে কি একটু ত্রাস হয় না যে, আমাদের

গায়ে বসিয়া মশা-প্রভু যদি সুচারুরূপে রক্তপান করিতে না পান, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের উপর রাগ করিবেন ?"

খর্বুর বলিলেন, "প্রভু, শীর্ণ হইয়া যাইতেছি সত্য। আমার শরীরে ভালরূপ সুস্বাদু রক্ত না পাইলে মহাশয় যে রাগ করিবেন, তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব ? স্ত্রীর তাড়নায় আমার এই দশা ঘটিয়াছে।"

মশা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? কি হইয়াছে ? তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করেন ?"

খর্বুর উত্তর করিলেন, "প্রভু, আমাদের স্ত্রী-পুরুষে সর্বদা বিবাদ হয়। দিনের মধ্যে দুই-তিন বার মারামারি পর্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের কথা আর মহাশয়কে কি বলিব ! আমি হইলাম তিন হাত লম্বা, আমার স্ত্রী হইলেন সাত হাত লম্বা। যখন আমাদের মারামারি হয়, তখন আমার স্ত্রী নাগরা জুতা লইয়া ঠন্ ঠন্ করিয়া আমার মস্তকে প্রহার করেন। আমি ততদূর নাগাল পাই না ; আমি যা মারি তা কেবল তাঁর পিঠে পড়ে। স্ত্রীর প্রহারের চোটে অবিলম্বেই আমি কাতর হইয়া পড়ি, আমার প্রহারে স্ত্রীর কিন্তু কিছুই হয় না ; সুতরাং স্ত্রীর নিকটে আমি সর্বদাই হারিয়া যাই। একে মার খাইয়া, তাতে মনঃক্লেশে শরীর আমার শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ; দেহে আমার রক্ত নাই। সেজন্য মহাশয় রাগ করিতে পারেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি কি করিব ? আমার অপরাধ নাই।"

মশা বলিলেন, "বটে ! আচ্ছা তুমি এক কর্ম কর। আজ হাতিভায়ার পিঠে চড়িয়া তুমি স্ত্রীর সহিত মারামারি কর।"

এই বলিয়া মশা খর্বুরকে হাতিটি দিলেন। খর্বুর হাতির পিঠে চড়িয়া বাড়ির ভিতর গিয়া স্ত্রীব সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় ক্রমে মারামারি আরম্ভ হইল। খর্বুর আজ হাতির উপর বসিয়া মনের সুখে ঠন্ ঠন্ করিয়া স্ত্রীর মাথায় নাগরা জুতা মারিতে লাগিলেন। আজ স্ত্রী যাহা মারেন, খর্বুরের গায়ে কেবল সামান্যভাবে লাগে। যখন তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, মশার তখন আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মশার হাত নাই যে, হাততালি দিবেন ; নখ নাই যে, নখে নখে ঘর্ষণ করিবেন। তাই তিনি কখনও এক পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, কখনও দুই পা তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও গুন্‌গুন্ করিয়া 'নারদ নারদ' বলিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই আজ খর্বুরের স্ত্রীকে পরাভব মানিতে হইল। খর্বুরের মন আজ

আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। খর্বুরের ধমনী ও শিরায় প্রবলবেগে আজ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল। মশা সেই রক্ত একটু চাখিয়া দেখিলেন, দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ! অতি সুমিষ্ট, অতি সুস্বাদু।"

মশা মহাশয়কে খর্বুর শত শত ধন্যবাদ দিলেন ও কি জন্য তাঁহাদের শুভাগমন হইয়াছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কঙ্কাবতী ও নাকেশ্বরীর বিবরণ মশা মহাশয় আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন।

সমস্ত বিবরণ শুনিয়া খর্বুর বলিলেন, "আপনাদের কোনো চিন্তা নাই। নাকেশ্বরীর হাত হইতে আমি ইহার পতিকে উদ্ধার করিয়া দিব। ভূত, প্রেতিনী, ডাকিনী সকলেই আমাকে ভয় করে। চলুন আমাকে সেই নাকেশ্বরীর ঘরে লইয়া চলুন, দেখি সে কেমন নাকেশ্বরী!"

মশা বলিলেন, "এবার চল, কিন্তু তোমাদের চলা-চলি সব শেষ হইল। বড় সব জাহাজে চড়িয়া, কোথায় রেঙ্গুন, কোথায় বিলাত এখানে ওখানে সেখানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছ! বড় সব রেল-গাড়ি করিয়া এ-দেশ ও-দেশ করিতেছ! রও, এবারকার শাস্ত্র একবার জারি হইতে দাও, তাহা হইলে টের পাবে!"

খর্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার শাস্ত্রে আমাদের গমনাগমন একেবারেই নিষিদ্ধ হইল নাকি? গাছগাছড়া আনিতে যাইতেও পাইব না?"

মশা উত্তর করিলেন, "না, এবারকার শাস্ত্রে লেখা আছে যে, ঘর হইতে তোমরা আর একেবারেই বাহির হইতে পারিবে না। সকলকে অন্ধকূপ খনন করিতে হইবে, চক্ষে ঠুলি দিয়া সকলকে সেই অন্ধকূপে বসিয়া থাকিতে হইবে। অন্ধকূপ হইতে বাহির হইলে, কি চক্ষুর ঠুলিটি খুলিলে পাপ হইবে, জাতি যাইবে, আর 'একঘরে' হইয়া থাকিতে হইবে। যেমন তেমন পাপ নয়, সেই যারে বলে পাতক। কেবল পাতক নয়, সেই যারে বলে মহাপাতক। শুধু মহাপাতক নয়, সেই যারে বলে অতি মহাপাতক। কেমন, বড় যে সব জাহাজ চড়া, রেল চড়া, লেখাপড়া শেখা, মশারি করা,—এইবার?"

খর্বুর বলিলেন, "আপনারা মহাপ্রভু, যেরূপ শাস্ত্র করিয়া দিবেন, আমাদিগকে মানিতে হইবে। আপনারা আমাদিগের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। আপনারা সব করিতে পারেন।"

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রায় দুই প্রহরের সময় পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

খোক্কশ

নাকেশ্বরী যখন খেতুকে পাইল, তখন খেতু একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান-গোচর আর তাঁহার কিছুমাত্র রহিল না। নিঃশ্বাস দ্বারা নাকেশ্বরী যে কঙ্কাবতীকে দূরীভূত করিল, খেতু তাহার কিছুই জানেন না।

খেতুকে মৃতপ্রায় করিয়া নাকেশ্বরী মনে মনে ভাবিল, বহুকাল ধরিয়া অনাহারে আছি। ইষ্টদেবতা ব্যাঘ্রের প্রসাদে আজ যদি এরূপ উপাদেয় খাদ্য মিলিল, তবে ইহাকে ভালরূপে রন্ধন করিয়া খাইতে হইবে। এমন সুখাদ্য একেলা খাইয়া তৃপ্তি হইবে না, যাই মাসীকে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনি।

মাসী আসিতে আসিতে পাছে খাদ্য পচিয়া যায়, সেজন্য নাকেশ্বরী তখন খেতুকে একেবারে মারিয়া ফেলিল না, মৃতপ্রায় অজ্ঞান করিয়া রাখিল।

নাকেশ্বরী মাসীকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইল। নাকেশ্বরীর মাসীর বাড়ি অনেক দূর, সাত সমুদ্র তের নদী পার, সেই একঠেঙো মুল্লুকের ওধারে। সেখানে যাইতে, আবার মাসীকে লইয়া আসিতে, অনেক বিলম্ব হইল।

মাসী বুড়ো মানুষ। মাসীর দাঁত নাই। খেতুর কোমল মাংস দেখিয়া মাসীর আর আহ্লাদের সীমা নাই। মাসীর মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল।

খেতুর গা টিপিয়া টিপিয়া মাসী বলিলেন, "আহা, কি নরম মাংস! বুড়ো হইয়াছি, একঠেঙো মানুষের দড়িপানা শক্ত মাংস আর চিবাইতে পারি না। আজ দুঠেঙো মানুষের মাংস দাগা দাগা করিয়া কাটিয়া ভাজা হউক, আঙুলগুলির চড়চড়ি হউক, অন্যান্য মাংস অম্বল করিয়া রাঁধা থাকুক, দুইদিন ধরিয়া আহার করা যাইবে, গন্ধ হইয়া যাইবে না।"

মাসী বোনঝিতে এইরূপ পরামর্শ হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একটি গোল উঠিল। হাতির বংশিধ্বনি, মশার গুন্‌গুন্, মানুষের কণ্ঠস্বর পর্বতের বাহির হইতে অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিল।

নাকেশ্বরী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মাসী! সর্বনাশ হইল। মুখের গ্রাস বুঝি কাড়িয়া লয়! ছুঁড়ী বুঝি ওঝা আনিয়াছে।"

মাসী বলিলেন, "চল চল চল! দ্বারের উপর দুইজনে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াই!"

অট্টালিকার দ্বারের উপর নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী পদপ্রসারণ করিয়া দাঁড়াইল।

পর্বতের ধারে সুড়ঙ্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়া মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। হাতি-ঠাকুরপো বাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া গাছের ডাল ভাঙিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিলেন। কখনও বা শুঁড়ে করিয়া ধুলারাশি লইয়া আপনার গায়ে পাউডার মাখিতে লাগিলেন। দোল খাইতে ইচ্ছা হইলে কখনও বা মনের সাধে শরীর দোলাইতে লাগিলেন।

মশা, কঙ্কাবতী ও খর্বুর সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সুড়ঙ্গের পথ দিয়া অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিবার সময় দ্বারে নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসীর পদতল দিয়া সকলকে যাইতে হইল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, খেতুর নিকট সকলে গমন করিলেন। সকলে দেখিলেন যে, খেতু মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অজ্ঞান অচৈতন্য শরীরে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। কঙ্কাবতী তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া পা-দুটি বুকে লইয়া নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। খর্বুর খেতুকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে খর্বুর বলিলেন, "কঙ্কাবতী! তুমি কাঁদিও না। তোমার পতি এখনও জীবিত আছেন। সত্বর আরোগ্য লাভ করিবেন। আমি এক্ষণেই এ রোগের প্রতীকার করিতেছি।"

এই বলিয়া খর্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন, খেতুর শরীরে শত শত ফুৎকার বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু কোনো ফল হইল না। সংজ্ঞাশূন্য হইয়া খেতু যেভাবে পড়িয়া ছিলেন, সেইভাবেই পড়িয়া রহিলেন। তিলমাত্রও নড়িলেন চড়িলেন না।

খর্বুর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "এ কি হইল! আমার মন্ত্র-তন্ত্র এরূপ কখনও তো বিফল হয় না। রোগী পুনর্জীবিত হউক না হউক, মন্ত্রের ফল অল্লাধিক অবশ্যই প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ যে আমার মন্ত্র-তন্ত্র, শিকড়-মাকড় একেবারেই নিরর্থক হইতেছে, ইহার কারণ কি!"

খর্বুর সাতিশয় চিন্তিত হইলেন। ভাবিয়া কারণ কিছু স্থির করিতে পারেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "মশা-প্রভু! আসুন দেখি, সকলে পুনরায় বাহিরে যাই! বাহরে গিয়া দেখি, ব্যাপারখানা কি?"

অট্টালিকা হইতে সকলে পুনর্বার বাহির হইলেন। কঙ্কাবতী একেবারে

হতাশ হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন যে, অভাগিনীর কপালে পতি যদি বাঁচিবেন, তবে এত কাণ্ড হইবে বা কেন? তবে এখন তিনি পতিদেহ পাইবেন, পতিপাদপদ্মে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিবেন। অসীম শোকসাগরে ভাসমান থাকিয়াও সে চিন্তাটি কথঞ্চিৎ তাঁহার শান্তির কারণ হইল।

একবার বাহিরে যাইয়া, সুড়ঙ্গের পথ দিয়া সকলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, আশ-পাশ, অগ্র-পশ্চাৎ, উর্ধ্ব-নিম্ন দশ দিক্ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে খর্বুর আসিতে লাগিলেন। অট্টালিকার নিকট আসিয়া উর্ধ্বদিকে চাহিয়া দেখেন যে, ভূতিনীদ্বয় পদপ্রসারণ করিয়া দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া আছে। খর্বুর ঈষৎ হাসিলেন আর মনে করিলেন, বটে! তোমাদের চাতুরী তো কম নয়!

এবার বাহির হইতে খর্বুর মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে ভূতিনীদ্বয় পদ উত্তোলন করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া খর্বুর পুনরায় ঝাড়ান কাড়ান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে মন্ত্রবলে নাকেশ্বরী আসিয়া খেতুর শরীরে আবির্ভূত হইল। খেতু বক্তা হইলেন, অর্থাৎ কি না খেতুর মুখ দিয়া ভূতিনী কথা কহিতে লাগিল। নানারূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, নানারূপ মন্ত্র পড়িয়া খর্বুর নাকেশ্বরীকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলেন। নাকেশ্বরী কিছুতেই ছাড়িবে না। নাকেশ্বরী বলিল যে, "এ মনুষ্য ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছে, আমা-রক্ষিত সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়াছে। সেজন্য আমি ইহাকে কখনই ছাড়িতে পারি না, আমি ইহাকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ করিব।"

খর্বুর পুনরায় নানারূপ মন্ত্রাদি দ্বারা নাকেশ্বরীকে অশেষ যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। যাতনা-ভোগে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, অবশেষে নাকেশ্বরী খেতুকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু "যাই যাই" বলে তবু কিন্তু যায় না। "এইবার যাই, এইবার চলিলাম" বারবার এই কথা বলে, তবু কিন্তু যায় না।

নাকেশ্বরীর শঠতা দেখিয়া খর্বুর অতিশয় বিরক্ত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল, ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। খর্বুর বলিলেন, "যাবে না? বটে, আচ্ছা দেখি এইবার যাও কি না।" এই বলিয়া তিনি একটি কুষ্মাণ্ড আনয়ন করিলেন, মন্ত্রপূত করিয়া তাহার উপর সিন্দূরের ফোঁটা দিয়া কুমড়াটিকে বলিদান দিবার উদ্যোগ করিলেন।

খর্পরে কুমড়াটি রাখিয়া খর্বুর খড়্গ উত্তোলন করিলেন। কোপ মারেন আর কি! এমন সময় নাকেশ্বরী অতি কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! কোপ মারিবেন না, আমাকে কাটিয়া ফেলিবেন না। আমি এখন সত্য সত্য সকল কথা বলিতেছি।"

খর্বুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিবে বল! সত্য বল, কেন তুমি ছাড়িয়া যাইতেছ না। সত্য সত্য না বলিলে, এখনই তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

নাকেশ্বরী বলিল, "আমি ছাড়িয়া গেলে কোনো ফল হইবে না। রোগী এখনই মরিয়া যাইবে। রোগীর পরমায়ুটুকু লইয়া কচুপাতে বাঁধিয়া আমি তাল গাছের মাথায় রাখিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, মাসী আসিলে পরমায়ুটুকু বাঁটিয়া চাটনি করিয়া দুইজনে খাইব। তা পরমায়ু-সহিত কচুপাতটি বাতাসে তালগাছ হইতে পড়িয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র পিপীলিকাতে পরমায়ুটুকু খাইয়া ফেলিয়াছে। এখন আর আমি পরমায়ু কোথায় পাইব যে, রোগীকে আনিয়া দিব? সেইজন্য বলিতেছি যে, আমি ছাড়িয়া যাইলেই রোগী মরিয়া যাইবে।"

খর্বুর গুনিয়া গাঁথিয়া দেখিলেন যে, নাকেশ্বরী যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য কথা, মিথ্যা নয়। খর্বুর মনে মনে ভাবিলেন যে, এইবার প্রমাদ হইল। ইহার এখন উপায় কি করা যায়? পরমায়ু না থাকিলে পরমায়ু তো আর কেহ দিতে পারে না।

অনেক চিন্তা করিয়া, খর্বুর নাকেশ্বরীকে আদেশ করিলেন, যে ক্ষুদ্র পিপীলিকা ইহার পরমায়ু ভক্ষণ করিয়াছে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সে খুদে পিঁপড়েরা এখন কোথায়?"

নাকেশ্বরী গিয়া, তালতলায়, পাথরের ফাটালে, মাটির গর্ত্তে, কাঠের কোটরে, সকল স্থানে সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথাও আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। ডেয়ো-পিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে শুশ্‌শুড়ে-পিঁপড়ে, টোপ-পিঁপড়ে, যত প্রকার পিঁপড়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সকলকেই নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী জিজ্ঞাসা করে, "হাঁগা! খুদে-পিঁপড়েরা কোথায় গেল, তোমরা দেখিয়াছ?" খুদে-পিঁপড়ের তত্ত্ব কেহই বলিতে পারে না। বোনঝির বিপদে মাসীও ব্যথিত হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু শীঘ্রই বুড়ীর হাঁপ লাগিল, চলিতে চলিতে নাকেশ্বরীর মাসীর

পায়ে ব্যথা হইল। তখন নাকেশ্বরীর মাসী মনে করিল ভাল দু-ঠেঙো মানুষের মাংস খাইতে আসিয়াছিলাম বটে! এখন আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে কানা-পিঁপড়ের সহিত নাকেশ্বরীর সাক্ষাৎ হইল। কানা-পিঁপড়েকে নাকেশ্বরী খুদে-পিঁপড়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কানা-পিঁপড়ে বলিল, "আমি খুদে পিঁপড়েদের কথা জানি। তালতলায় কচুপাত হইতে মানুষের সুমিষ্ট পরমায়ুটুকু চাটিয়া-চুটিয়া খাইয়া, হাত মুখ পুঁছিয়া, খুদে-পিঁপড়েরা গৃহে গমন করিতেছিল। এমন সময় সাহেবের পোশাক পরা একটি ব্যাঙ আসিয়া তাহাদিগকে কুপ কুপ করিয়া খাইয়া ফেলিল।"

অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া নাকেশ্বরী এই সংবাদটি খর্বুরকে দিল। ভেকের অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত খর্বুর পুনরায় নাকেশ্বরীকে পাঠাইলেন। নাকেশ্বরী মনে করিল, ভাল কথা! আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, আবার সেই কাজে আমাকে খাটাইবে! কিন্তু নাকেশ্বরী করে কি? কথা না শুনিলেই খর্বুর সেই কুমড়াটি বলিদান দিবেন। এদিকে তিনি কুমড়াটি কাটিবেন, আর ওদিকে নাকেশ্বরীর গলাটি দুইখানা হইয়া যাইবে।

বনে-বনে, পথে-পথে, পর্বতে-পর্বতে, খানায়-ডোবায়, নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী ভেকের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ গর্তের ভিতর ব্যাঙ খাইয়া-দাইয়া বসিয়া আছেন, তাহার সন্ধান ভূতিনীরা কি করিয়া পাইবে? ব্যাঙের কোনও সন্ধান হইল না। নাকেশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া খর্বুরকে বলিল, "আমাকে মারুন আর কাটুন, ব্যাঙের সন্ধান আমি কিছুতেই করিতে পারিলাম না।"

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া খর্বুর পুনরায় ঘোর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে তিনি একমুষ্টি সর্ষপ হাতে লইলেন। মন্ত্রপূত করিয়া সরিষাগুলিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পড়া সরিষারা নক্ষত্র-বেগে পৃথিবীর চারিদিকে ছুটিল। দেশ-বিদেশে, গ্রাম-নগর, উপত্যকা-অধিত্যকা, সাগর-মহাসাগর, চারিদিকে খর্বুরের সরিষা-পড়া ছুটিল। পর্ণপূর্ণ, পুরাতন, পঙ্কিল পুষ্করিণীর পার্শ্বে, সুশীতল গর্তের ভিতর ব্যাঙ মহাশয় মনের সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সরিষাগণ সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সূচের সূক্ষ্ম ধারে চর্ম-মাংস ভেদ করিয়া সরিষাগণ ব্যাঙের মস্তকে চাপিয়া বসিল। ভেকের মাথা হইতে সাহেবী টুপিটি খসিয়া পড়িল। যাতনায় ব্যাঙ

মহাশয় ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিলেন। ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরিষারা তাঁহাকে গর্তের ভিতর হইতে বাহির করিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে অট্টালিকার দিকে লইয়া চলিল। ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাঁহাকে সুড়ঙ্গের পথে প্রবিষ্ট করিল। অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া ব্যাঙ মহাশয় হস্ত দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলেন।

মশা দ্বার খুলিয়া দিলেন, ভেক মহাশয় অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিয়া যেখানে কঙ্কাবতী ও খর্বুর বসিয়া ছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কঙ্কাবতী চিনিলেন যে, এ সেই ব্যাঙ। ব্যাঙ চিনিলেন যে, এ সেই কঙ্কাবতী।

ব্যাঙ বলিলেন, "ওগো ফুটফুটে মেয়েটি! তোমার সহিত এত আলাপ পরিচয় করিলাম, আর তুমি আসিয়া সকলকে আমার আধুলিটির সন্ধান বলিয়া দিলে গা! ছি বাছা! তুমি এ ভাল কাজ কর নাই। ধনের গল্প গাঁট-কাটাদের কাছে কি করিতে আছ? বিশেষতঃ ওই চেপটা গাঁট-কাটার কাছে। আমার আধুলির যাহা কিছু বাকী আছে, সকলে ভাগ করিয়া লও, লইয়া আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও। চেপটা মহাশয়! আমি দেখিতেছি, এ সরিষাগুলি আপনার চেলা। এখন কৃপা করিয়া সরিষাগুলিকে আমার মাথাটি ছাড়িয়া দিতে বলুন। ইহাদের যন্ত্রণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।"

খর্বুর বলিলেন, "তোমার আধুলিতে আমাদের প্রয়োজন কি? এ বালিকাটি তোমার পরিচিত। বালিকাটি কি ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় তুমি জান। ওই যে মৃতবৎ যুবাটিকে দেখিতেছ উনিই ইহার পতি। নাকেশ্বরী দ্বারা উনি আক্রান্ত হইয়াছেন। নাকেশ্বরী ওঁর পরমায়ু লইয়া তালবৃক্ষের মস্তকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। বাতাসে সেই পরমায়ুটুকু তলায় পড়িয়া গিয়াছিল। ক্ষুদ্র পিপীলিকারা সেই পরমায়ু ভক্ষণ করে। তুমি সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছ। এক্ষণে উদরের ভিতর হইতে সেই পিপীলিকাগুলিকে বাহির করিয়া দাও। পিপীলিকাদিগের উদর হইতে পরমায়ুটুকু বাহির করিয়া কঙ্কাবতীর পতির প্রাণরক্ষা করি। পিপীলিকাগুলিকে বাহির করিয়া দিলেই সরিষাগণ তোমাকে ছাড়িয়া দিবে।"

ব্যাঙ উত্তর করিলে, "এই বালিকাটি আমার পরিচিত বটে। যাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই বলিয়া ব্যাঙ গলায় অঙ্গুলি দিয়া উদ্গিরণ করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু বমন কিছুতেই হইল না। তাহার পর গলায় পালক দিয়া বমন করিতে চেষ্টা

করিলেন, তবুও বমন হইল না। অবশেষে খর্বুর তাহাকে নানাবিধ বমন-কারক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন, কিন্তু ব্যাঙের বমন আর কিছুতেই হইল না!

খর্বুর ভাবিলেন, এ আবার এক নূতন বিপদ্। ইহার উপায় কি করা যায়?

খর্বুর ব্যাঙের নাড়ী ধরিয়া উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি ভাবিলেন, এইবার চাঁদকে আমি পতনে পাইয়াছি। চাঁদের কথা তাঁহার মনে পড়িল। চাঁদের মূলশিকড় এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ; সেবন করাইলে এখনই ভেকের বমন হইবে।

মশাকে সম্বোধন করিয়া খর্বুর কহিলেন, "মহাশয়, এ ব্যাঙের বমন হয়, এরূপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল একমাত্র ঔষধ আছে। ওই যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ওই চাঁদের মূলশিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটি মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে, নতুবা আর কিছুতেই হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া মশা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। কঙ্কাবতী একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন, "মশা মহাশয়! খর্বুর মহারাজ! এই হতভাগিনীর জন্য আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। কিন্তু আপনারা কি করিবেন? এ হতভাগিনীর কপাল নিতান্তই পুড়িয়াছে। আকাশে গিয়া চাঁদের মূলশিকড় কে কাটিয়া আনিতে পাবে? চাঁদের মূলশিকড়ও সংগ্রহ হইবে না, পতিও আমার প্রাণ পাইবেন না। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন, আমার জন্য বৃথা আর ক্লেশ পাইবেন না। আপনাদিগের অনুগ্রহে আমি যে আমার পতির মৃতদেহটি পাইলাম, তাহাই যথেষ্ট। পতির পদ আশ্রয় করিয়া আমি এক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করি। আপনারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করুন।"

মশা বলিলেন, "আমি অনেক দূর উড়িতে পারি সত্য। কিন্তু চাঁদ পর্যন্ত যে উড়িয়া যাই, এরূপ শক্তি আমার নাই। সেজন্য আমি দেখিতেছি যে, আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। আহা! রক্তবতী মা আমার পথপানে চাহিয়া আছেন। রক্তবতীকে গিয়া কি বলিব?"

খর্বুর বলিলেন, "আপনারা নিতান্ত হতাশ হইবেন না। একটি খোক্কশের বাচ্ছার সন্ধান হয়? তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া অনায়াসেই আকাশে উঠিতে পারা যায়। ধাড়ী খোক্কশ পাইলে কাজ হইবে না, ধাড়ী খোক্কশ বাগ মানিবে না, বাচ্ছা খোক্কশ আবশ্যক।"

ব্যাঙ বলিলেন, "একস্থানে খোক্কশের বাচ্ছা হইয়াছে, তাহার সন্ধান আমি জানি। কিন্তু খোক্কশের বাচ্ছা তোমরা ধরিবে কি করিয়া? ধাড়ী খোক্কশ যে তোমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে! আচ্ছা, যেন পাকে-প্রকারে তাহাকে ধরিলে। তাহার পিঠে চড়িয়া আকাশের উপর যায় কে? প্রাণটি হাতে করিয়া আকাশে যাইতে হইবে। আকাশে ভয়ানক সিপাহি আছে, আকাশের সে চৌকিদার। কর্ণে সে বধির। কানে ভাল শুনিতে পায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকে সে বড়ই দুর্দান্ত সিপাহি। আকাশের লোক তাহার ভয়ে সব জড়সড়। আকাশের চারিদিকে সে পাহারা দিয়া বেড়ায়, তাহার হাতে পড়িলে আর রক্ষা নাই। তাই ভাবিতেছি, চাঁদের মূলশিকড় কাটিয়া আনিতে আকাশে যায় কে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "সেজন্য আপনাদিগের কোনো চিন্তা নাই। যদি খোক্কশের বাচ্ছা পাই, তাহা হইলে তাহার পিঠে চড়িয়া আমি আকাশে যাইব। আমার আর ভয় কিসের? যদি আকাশের সিপাহির হাতে পড়ি, সে না হয় আমাকে মারিয়া ফেলিবে, আর আমার সে কি করিতে পারে? পতি বিহনে আমি তো এ প্রাণ রাখিব না, এ তো আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা। তবে প্রাণের ভয় আর কি জন্য করিব?"

এখন খোক্কশের বাচ্ছা ধরাই স্থির হইল। যে পাহাড়ের ধারে, গর্তের ভিতর খোক্কশের বাচ্ছা হইয়াছে, ব্যাঙ তাহার সন্ধান বলিয়া দিলেন। মশা বলিলেন, "কৌশল করিয়া খোক্কশের বাচ্ছা ধরিতে হইবে।"

এইরূপ স্থির হইল যে, ব্যাঙ ও খর্বুর অট্টালিকায় খেতুকে চৌকি দিয়া বসিয়া থাকিবেন আর মশা, কঙ্কাবতী ও হাতি-ঠাকুরপো খোক্কশের বাচ্ছা ধরিতে যাইবেন।

যাত্রা করিবার সময় কঙ্কাবতী খেতুর পদধূলি লইয়া আপনার মস্তকে রাখিলেন।

মশা কঙ্কাবতীকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কঙ্কাবতী তুমি আকাশে উঠিতে পারিবে তো? তোমার ভয় তো করিবে না?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভয় আমার আবার কিসের? যদি আকাশে একবার উঠিতে পারি, তাহা হইলে দেখি কি করিয়া চাঁদ আপনার মূলশিকড় রক্ষা করেন। আর দেখি, আকাশের সেই বধির সিপাহির কত ঢাল-খাঁড়া আছে! পতিপরায়ণা সতীর পরাক্রম আজ আকাশের লোককে দেখাইব।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নক্ষত্রদের বউ

খোক্কশের বাচ্ছা ধরিয়া আকাশে উঠিবার কথা নাকেশ্বরী ও নাকেশ্বরীর মাসী বসিয়া বসিয়া শুনিল। তাহারা দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল যে, যদি এই কাজটি নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে খর্বুর আর আমাদের দোষ দিতে পারিবে না, অথচ খাদ্যটিও আমাদের হাতছাড়া হইবে না।

মাসী বলিল, "বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন পৃথিবীর অর্ধেক দ্রব্যে অরুচি। এইরূপ কোমল রসাল মাংস খাইতে এখন সাধ হয়। যদি ভাগ্যক্রমে একটি মিলিল, তাও বুঝি যায়!"

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী তুমি এক কর্ম কর। তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ তুমি একেবারে চুনকাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চুনকাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়। তুমি তোমার চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চুনকাম করিয়া দিলে ছুঁচী আর আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না, চাঁদও দেখিতে পাইবে না, চাঁদের মূল-শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।"

দুইজনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া মাসী গিয়া ঝুড়িতে বসিল। ঝুড়ি হুহু শব্দে আকাশে উঠিল। সমস্ত আকাশে নাকেশ্বরীর মাসী চুনকাম করিয়া দিল।

অট্টালিকা হইতে বাহির হইবার সময়ে মশা দেখিলেন যে, সেখানে একটি ঢাক পড়িয়া রহিয়াছে। মশা সেই ঢাকটি সঙ্গে লইলেন। বাহিরে আসিয়া কঙ্কাবতী ও মশা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। যে বনে খোক্কশের বাচ্ছা হইয়াছে, সেই বনে সকলে চলিলেন। সন্ধ্যার পর খোক্কশের গর্তের নিকট উপস্থিত হইলেন।

একবার আকাশ পানে চাহিয়া মশা বলিলেন, "কি হইল? আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ এখনও উঠিলেন না কেন? মেঘ করে নাই, তবে নক্ষত্র সব কোথায় গেল? আকাশ এরূপ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল কেন?"

ধাড়ী খোক্কশ আপনার বাচ্ছা চৌকি দিয়া গর্তে বসিয়া আছে। একে

রাত্রি, তাতে নিবিড় অন্ধকার বন। দূর হইতে ধাড়ী খোক্কশ কঙ্কাবতীর গন্ধ পাইল।

ভয়ংকর চীৎকার করিয়া ধাড়ী খোক্কশ বলিল, "হাঁউ মাঁউ খাঁউরে, মনুষ্যের গন্ধ পাঁউরে! কেরা তোরা, এদিকে আসিস?"

মশা চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে?"

খোক্কশ বলিল, "আমি আবার কে? আমি খোক্কশ!"

মশা বলিলেন, "আমরা আবার কে? আমরা ঘোক্কশ!"

এই উত্তর শুনিয়া খোক্কশের ভয় হইল। খোক্কশ বলিল, "বাপ রে! তবে তো তোরা কম নয়? ক খ গ ঘ, আমি খ-য়ে তোরা ঘ-য়ে, আমার চেয়ে তোরা দুই পইঠা উঁচু! আচ্ছা, কেমন তোরা ঘোক্কশ, একবার কাশ দেখি, শুনি?"

মশা তখন সেই ঢাকটি ঢং ঢং করিয়া বাজাইলেন।

সেই শব্দ শুনিয়া খোক্কশ বলিল, "ওরে বাপ রে! তোদের কাশির কি শব্দ! শুনলে ভয় হয়, কানে তালা লাগে! তোরা ঘোক্কশ বটে!"

খোক্কশ কিন্তু কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত। এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও তবু তাহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। তাই সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা! তোরা কেমন ঘোক্কশ, তোদের মাথার একগাছা চুল ফেলিয়া দে দেখি?"

এই কথা বলিতে, মশা হাতীর বাছিগাছটি ফেলিয়া দিলেন। খোক্কশ তাহা হাতে করিয়া দেখিতে লাগিল। অনেক দেখিয়া শেষে বলিল, "ওরে বাপ রে! এই কি তোদের মাথার চুল! তোদের চুল যখন এত বড়, এত মোটা, তখন তোরা না জানি কত মোটা। তোদের সঙ্গে পারা ভার!"

তবুও কিন্তু খোক্কশের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। ভাবিয়া-চিন্তিয়া খোক্কশ পুনরায় বলিল, "আচ্ছা, তোরা যদি ঘোক্কশ, তবে তোদের মাথার একটা উকুন ফেলিয়া দে দেখি?"

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, শীঘ্র হাতীর পিঠ হইতে নামো।"

তাহার পর মশা হাতীকে বলিলেন, "হাতী ভায়া! এইবার!"

এই কথা বলিয়া মশা হাতীটিকে ধরিয়া খোক্কশের গর্তে ফেলিয়া দিলেন। গর্তে পড়িয়া হাতী শুঁড় দিয়া খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ধরিলেন। খোক্কশের বাচ্ছা 'চ্যাঁ চ্যাঁ' শব্দে ডাকিয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল তোল-পাড় করিয়া ফেলিল।

শুঁড়-বিশিষ্ট পর্বতাকার উকুন দেখিয়া, ত্রাসে খোক্কশের প্রাণ উড়িয়া গেল। খোক্কশ ভাবিল, তোদের মাথার উকুন আসিয়া তো আমার বাচ্ছাটিকে ধরিল, খোক্কশেরা নিজে আসিয়া আমাকে না ধরে! এই মনে করিয়া খোক্কশ বাচ্ছা ফেলিয়া উড়িয়া পলাইল।

মশা ও কঙ্কাবতী তখন সেই গর্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি এখন ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া তুমি এখন আকাশে গিয়া উঠ, চাঁদের শিকড় লইয়া পুনরায় এখানে আসিবে! তোমার প্রতীক্ষায় আমরা এখানে বসিয়া রহিলাম। তুমি আসিলে আমরা খোক্কশের বাচ্ছাটিকে ফিরিয়া দিব। কারণ, এখনও এ স্তন্যপান করে, অতি শিশু। ইহাকে লইয়া আমরা কি করিব? যাই হউক, তুমি এখন আকাশের দুর্দণ্ড সিপাহীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে হয়। শুনিয়াছি সে অতি ভয়ংকর দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সিপাহী, সাবধানে আকাশে উঠিবে।"

আকাশ পানে চাহিয়া মশা পুনরায় বলিলেন, "কঙ্কাবতী, আমার কিছু আশ্চর্য বোধ হইতেছে। আজ দ্বিতীয়ার রাত্রি, চাঁদ উঠিবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু চাঁদও দেখিতে পাই না, নক্ষত্রও দেখিতে পাই না। অথচ মেঘ করে নাই। কালো মেঘে না ঢাকিয়া, সমস্ত আকাশ বরং শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি? আকাশে উঠিলে হয়তো তুমি বুঝিতে পারিবে। অতি সাবধানে আপনার কার্য উদ্ধার করিবে।"

কঙ্কাবতী খোক্কশ-শাবকের পিঠে চড়িয়া আকাশের দিকে তাহাকে পরিচালিত করিলেন, দ্রুতবেগে খোক্কশ-শাবক উড়িতে লাগিল। কঙ্কাবতী অবিলম্বে আকাশের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আকাশের কাছে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিলেন যে, সমুদয় আকাশ চুনকাম করা। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, এ কি প্রকার কথা। আকাশের উপর এরূপ চুনকাম করিয়া কে দিল?

আকাশের উপর উঠিতে কঙ্কাবতী আর পথ পান না। যেদিকে যান, সেই দিকেই দেখেন চুনকাম। আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পথ কিছুতেই পাইলেন না। সব চুনকাম। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, ঘোর বিপদ্! আকাশের উপর এখন উঠি কি করিয়া?

হতাশ হইয়া আকাশের চারি ধারে কঙ্কাবতী পথ খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়া, সহসা একস্থানে একটি সামান্য ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই ছিদ্রটি দিয়া নক্ষত্রদের বউ উঁকি মারিতেছিল। কঙ্কাবতী সেই ছিদ্রটির নিকট যাইলেন। কঙ্কাবতীকে দেখিয়া নক্ষত্রদের বউ একবার লুকাইল, পুনরায় আবার ভয়ে ভয়ে উঁকি মারিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো নক্ষত্রদের বউ! তোমার কোনও ভয় নাই। আমিও মেয়েমানুষ, আমাকে দেখিয়া আবার লজ্জা কেন বাছা?"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "কে গা মেয়েটি তুমি? তোমার কথাগুলি বড় মিষ্টি। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছি, তুমি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তাই মনে করিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কি তুমি খুঁজিতেছ? কিন্তু হাজার হউক, আমি বউমানুষ, সহসা কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে পারি? তাতে রাত্রি কাল। একটু আস্তে কথা কও বাছা! আমার ছেলে-পিলেরা সব শুয়েছে, এখনই জাগিয়া উঠিবে, কাঁচা ঘুম ভাঙিলে কাঁদিয়া জ্বালাতন করিবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো নক্ষত্রদের বউ! আমার নাম কঙ্কাবতী। আমি পতিহারা সতী, আমি বড় অভাগিনী। আকাশের ভিতর যাইবার নিমিত্ত পথ অন্বেষণ করিতেছি। তা আজ এ কি হইয়াছে বাছা, পথ কেন পাই না? একবার আকাশের ভিতর উঠিতে পারিলে আমার পতির প্রাণ রক্ষা হয়। বাছা, তুমি যদি পথটি বলিয়া দাও তো আমার বড় উপকার হয়।"

নক্ষত্রদের বউ উত্তর করিল, "পথ আর বাছা, তুমি কি করিয়া পাইবে? এই সন্ধ্যাবেলা এক বেটী ভূতিনী-বুড়ী আসিয়া আকাশের উপর সব চুনকাম করিয়া দিয়াছে। তা যাই হউক, আমি চুপি চুপি তোমাকে আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিই। সেই পথ দিয়া তুমি আকাশের ভিতর প্রবেশ কর।"

এই কথা বলিয়া, নক্ষত্রদের বউ চুপি চুপি আকাশের খিড়কি-দ্বারটি খুলিয়া দিল। সেই পথ দিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর উঠিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্দান্ত সিপাহী

আকাশের ভিতর গিয়া কঙ্কাবতী খোক্কশ-শাবককে একটি মেঘের ডালে বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর পদব্রজে আকাশের মাঠ দিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকে দেখিলেন, নানাবর্ণের নক্ষত্র সব ফুটিয়া রাহিয়াছে। নক্ষত্র ফুটিয়া আকাশকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি দূরে চাঁদ চাকার মত আকাশের উপর বসিয়া আছেন।

কঙ্কাবতী আকাশের ভিতর প্রবেশ করিলে চাঁদ সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে। খন্তা কুড়ুল লইয়া এক মানবী উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছে। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া চাঁদের মনে ত্রাস হইল। ভয়ে চাঁদ কাঁপিতে লাগিলেন।

চাঁদ মনে করিলেন, কেন যে মরিতে সুন্দর হইয়াছিলাম! তাই তো আমার প্রতি সকলের আক্রোশ! যদি সুন্দর না হইতাম, তাহা হইলে কেহ আর আমার মূল শিকড় কাটিতে আসিত না। একে তো রাহুর জ্বালায় মরি, তাহার উপর আবার যদি মানুষের উপদ্রব হয়, তাহা হইলে আর কি করিয়া বাঁচি! যদি আমার গলা থাকিত, তো আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিতাম। তা যে ছাই, এ পোড়া শরীর কেবল চাকার মত! গলা নাই তা কি করিব? দড়ি দিই কোথা?

নানারূপ খেদ করিয়া, অতিশয় ভীত হইয়া, চাঁদ আকাশের সিপাহীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। আকাশের সিপাহী সকল দিকে বীরপুরুষ বটে, কেবল কর্ণে কিছু হীনবল, একটু কালা। অতিশয় চীৎকার করিয়া কোনও কথা না বলিলে তিনি শুনিতে পান না।

সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইলে, অতি চীৎকার করিয়া চাঁদ তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন।

চাঁদ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহী ভাবিলেন যে, চাঁদ তাঁহাকে কালা মনে করিয়া এত হাঁ করিয়া কথা কহিতেছেন। সিপাহীর তাই রাগ হইল।

সিপাহী বলিলেন, "নাও! আর অত হাঁ করিতে হ'বে না। শেষকালে চিড় খাইয়া, চারিদিক্ ফাটিয়া, দুইখানা হইয়া যাবে।"

এইবার একটু হাঁ কম করিয়া, চাঁদ পুনরায় বলিলেন, "আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহী বলিলেন, "অত আর চুপি চুপি কথা কহিতে হইবে না। কোথাও ডাকাতি করিবে না কি যে অত চুপি চুপি কথা! যদি কোথাও ডাকাতি কর তো আমায় কিন্তু ভাগ দিতে হইবে।"

চাঁদ ভাবিলেন, "সিপাহী-লোকের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। কথায় কথায় রাগিয়া উঠে।"

চাঁদ পুনরায় বলিলেন, "না, ডাকাতি করিবার কথা বলি নাই। আমি কোথাও ডাকাতি করিতে যাইব না। আমি বলিতেছি যে, আমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে।"

সিপাহী এতক্ষণে চাঁদের কথা শুনিতে পাইলেন।

সিপাহী বলিলেন, "তোমার মূল শিকড় কাটিতে মানুষ আসিতেছে? তা বেশ, কাটিয়া লইয়া যাইবে। তার আর কি?"

চাঁদ বলিলেন, "তুমি আকাশের চৌকিদার, তুমি আমাকে রক্ষা করিবে না?"

সিপাহী উত্তর করিলেন, "তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার মূল শিকড়টি কাটা যায়? তখন?"

চাঁদ বলিলেন, "যদি তুমি এরূপ সমূহ বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা না করিবে, তবে তুমি আকাশের মাহিনা খাও কি জন্য?"

সিপাহী উত্তর করিলেন, "রেখে দাও তোমার মাহিনা! না হয় কর্ম ছাড়িয়া দিব; পৃথিবীতে গিয়া কনেস্টেবিলি করিয়া খাইব। আমা হেন প্রসিদ্ধ দুর্দান্ত সিপাহী পাইলে সেখানে তাহারা লুফিয়া লইবে। সেখানে এমন মূল শিকড় কাটাকাটি নাই। সেখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় বটে, তা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় আমি তফাত তফাত থাকিব। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সব হইয়া যাইলে দাঙ্গাবাজেরা আপনার আপনার ঘরে চলিয়া গেলে, তখন আমি রাস্তার দু চারিজন ভাল মানুষ ধরিয়া, কাছারিতে নিয়া হাজির করিব। তবে এখন আমি যাই। কারণ, মানুষটি যদি আসিয়া পড়ে! শেষে যদি আমাকে পর্য্যন্ত ধরিয়া টানাটানি করে?"

এই কথা বলিয়া, দুর্দান্ত সিপাহী সেখান হইতে অতি দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। নিরুপায় হইয়া, যা থাকে কপালে,—এই মনে করিয়া চাঁদ আকাশে গা ঢালিয়া দিলেন।

মেঘের ডালে খোক্কশ বাঁধিয়া আকাশের মাঠ দিয়া কঙ্কাবতী অতি দ্রুতবেগে চাঁদের দিকে ধাবমান হইলেন।

চারিদিকে জনরব উঠিল যে, আকাশবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সকলের মূল শিকড় কাটিতে পৃথিবী হইতে মনুষ্য আসিয়াছে। আকাশবাসীরা সকলে আপনার আপনার ছেলেপিলে সাবধান করিয়া, ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল। নক্ষত্রগণের পলাইবার জো নাই, তাই নক্ষত্রগণ বন উপবনে, ক্ষেত্র উদ্যানে, যে যেখানে ফুটিয়াছিল, সে সেইখানে বসিয়া মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চাঁদের পলাইবার জো নাই, কারণ জগতে আলো না দিয়া পলাইলে জরিমানা হইবে। চাঁদ তাই বিরসমনে ম্লানবদনে ধীরে ধীরে আকাশের পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে কঙ্কাবতী চাঁদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চাঁদ ভাবিলেন, এইবার তো দেখিতেছি, আমার মূল শিকড়টি কাটা যায়! এখন আমি-শুদ্ধ না যাই, তবেই রক্ষা! এরে বিশ্বাস কি? যদি বলিয়া বসে যে, বাঃ দিব্য চাঁদটি, কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি? কাজ নাই বাপু, আমি চক্ষু বুজিয়া থাকি, নিশ্বাস বন্ধ করি, মড়ার মত কাঠ হইয়া থাকি। মানুষটা মনে করিবে যে, এ মরা চাঁদ লইয়া আমি কি করিব? আমাকে সে আর ধরিয়া লইয়া যাইবে না।

বুদ্ধিমন্ত চাঁদ এইরূপ মনে মনে পরামর্শ করিয়া চক্ষু বুজিলেন, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিলেন।

চাঁদকে বিবর্ণ, বিষণ্ণ, মৃত্যু-ভাবাপন্ন দেখিয়া কঙ্কাবতী ভাবিলেন, বাঃ, চাঁদটি বা মরিয়া গেল! মূল শিকড়টি কাটিয়া লইব, সেই ভয়ে চাঁদের বা প্রাণত্যাগ হইল! আহা, কেমন সুন্দর চাঁদটি ছিল। কেমন চমৎকার জ্যোৎস্না হইত, কেমন পূর্ণিমা হইত! সে সকল আর হইবে না। চিরকাল অমাবস্যার রাত্রি থাকিবে। লোকে আমায় কত গালি দিবে।

একটু ভাল করিয়া দেখিয়া কঙ্কাবতী পুনরায় মনে মনে বলিলেন, "না, চাঁদটি মরে নাই। বোধ হয় মূর্ছা গিয়াছে। তা ভালই হইয়াছে। কাটিতে

কুটিতে হইলে, ডাক্তারেরা প্রথম ঔষধ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করেন, তারপর করাত দিয়া হাত-পা কাটেন। ভালই হইয়াছে যে, চাঁদ আপনা-আপনি অজ্ঞান হইয়াছে। মূল শিকড়টি কাটিতে ইহাকে আর লাগিবে না। কিন্তু শিকড়টি একেবারে দুইখণ্ড করিয়া কাটা হইবে না, তাহা হইলে চাঁদ মরিয়া যাইবে। আমার কেবল এক তোলা শিকড়ের ছালের প্রয়োজন, ততটুকু আমি কাটিয়া লই।"

এইরূপ ভাবিয়া চারিদিক্ ঘুরিয়া, কঙ্কাবতী অবশেষে চাঁদের মূল শিকড়টি দেখিতে পাইলেন। ছুরি দিয়া উপর উপর মূল শিকড়ের ছাল চাঁচিয়া তুলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের নিমিত্ত চাঁদ অতি কষ্টে যাতনা সহ্য করিলেন, তার পর আর সহিতে পারিলেন না। চাঁদ বলিলেন, "উঃ! লাগে যে!"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভয় নাই। এই হইয়া গেল।"

তাড়াতাড়ি কঙ্কারতী চাঁদের মূল শিকড় হইতে এক তোলা পরিমাণ ছাল তুলিয়া লইলেন।

তখন চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার শিকড় পুনরায় গজাইবে তো?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "গজাইবে বই কি! চিরকাল কি আর এমন থাকিবে। ইহার উপর একটু কাদা দিয়া দিও, মন্দ লোকের দৃষ্টি পড়িয়া বিষিয়ে উঠিবে না।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি ঘা হয়?"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "যদি ঘা হয়, তাহা হইলে ইহার উপর একটু লুচি-ভাজা ঘি দিও।"

চাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বুঝি মেয়ে-ডাক্তার? দাঁতের গোড়ার ঔষধ জান? আমার দাঁতের গোড়া বড় কন্ কন্ করে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "আমি মেয়ে-ডাক্তার নই। তবে এই বয়সে আমি অনেক দেখিলাম, অনেক শুনিলাম, তাই দুটা একটা ঔষধ শিখিয়া রাখিয়াছি। তোমার দাঁতের গোড়া আর ভাল হইবে না। লোকের দাঁত কি চিরকাল সমান থাকে? তুমি কত কালের চাঁদ হইলে, মনে করিয়া দেখ দেখি? কবে সেই সমুদ্রের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছ! এখন আর ছেলে-চাঁদ হইতে সাধ করিলে চলিবে কেন?"

চাঁদ বলিলেন, "ছেলে-চাঁদ হইতে চাই না। ঘরে আমার অনেকগুলি

ছেলে-চাঁদ আছে। আশীর্বাদ কর, তাহারা বাঁচিয়া বর্তিয়া থাকুক, তাহা হইলে এর পর দেখিতে পাইবে, আকাশে কত চাঁদ হয়। আকাশের চারিদিকে তখন চাঁদ উঠিবে। এখনই আমার ছেলেমেয়েগুলি বলে, 'বাবা, অমাবস্যার রাত্রিতে তুমি শ্রান্ত হইয়া পড়, সন্ধ্যা বেলা বিছানা হইতে আর উঠিতে পার না। তা যাই না? আমরা গিয়া আকাশে উঠি না?' আমি তাদের মানা করি। আকাশের এক ধার হইতে অন্য ধার পর্যন্ত, পথটুকু তো আর কম নয়। তারা ছেলেমানুষ, অত পথ গড়াইতে পারিবে কেন?"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলেমেয়েগুলি কত বড় হইয়াছে?"

চাঁদ উত্তর করিলেন, "বড় মেয়েটি একখানি কাঁসির মত হইয়াছে। কেমন চক্‌চকে কাঁসি! তেঁতুল দিয়া মাজিলেও তোমাদের কাঁসির সেরূপ রং হয় না। মেজ ছেলেটি একখানি খন্তালের মত হইয়াছে। মাঝে আরও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে। কোলের মেয়েটি একটু কালো। তোমরা যে সেকালে পাথুরে পোকার টিপ পরিতে, সেই তত বড় হইয়াছে। কিন্তু কালো হউক, মেয়েটির শ্রী আছে। বড় হইলে, এর পর যখন আকাশে কালো চাঁদ উঠিবে, তখন তোমরা বলিবে, হাঁ চটকসুন্দরী বটে। তাহার কালো কিরণে জগতে চক্‌চকে অন্ধকার হইবে, সমুদয় জগৎ যেন বারনিশ চামড়ায় মুড়িয়া যাইবে। তা, যাই হউক, এখন দাঁতের গোড়ার কি হইবে? কিছু যে খাইতে পারি না। ডাঁটা চিবাইতে যে বড় লাগে। ভাল যদি কোনও ঔষধ থাকে তো আমাকে দিয়া যাও।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "চাঁদ, তুমি এক কাজ কর, আমার সঙ্গে তুমি চল। তোমার শিকড় পাইয়াছি, পতি আমার এখন ভাল হইবেন। পতি আমার কলিকাতায় থাকেন। কলিকাতায় দন্তকারেরা আছে। তোমার পোকা-ধরা পচা দাঁতগুলি সাঁড়াশি দিয়া তাহারা তুলিয়া দিবে, নূতন কৃত্রিম দন্ত পরাইয়া দিবে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদের ভয় হইল; চাঁদ বলিলেন, "আমার মূল শিকড়ে ব্যথা হইয়াছে, আমি এখন গড়াইতে পারিব না, তত দূর আমি যাইতে পারিব না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "তার ভাবনা কি? আমি তোমাকে কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

চাঁদের প্রাণ উড়িয়া গেল। চাঁদ ভাবিলেন, "যা ভয় করিয়াছিলাম তাই। কেন মরিতে ইহার সহিত কথা কহিয়াছিলাম। চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই হইত।"

চাঁদ বলিলেন, "আমার দাঁতের গোড়া ভাল হইয়া গিয়াছে, আর ব্যথা নাই। সে জন্য তোমাকে আর কষ্ট করিতে হইবে না, আমি বড় ভারী, আমাকে তুমি লইয়া যাইতে পারিবে না। এখন যাও, বাড়ি যাও। বিলম্ব করিলে তোমার বাড়ির লোকে ভাবিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন, "কি বলিলে? তুমি ভারী! বাপের বাড়ি থাকিতে তোমার চেয়ে বড় বড় বগি-থালা আমি ঘাটে লইয়া মাজিতাম। এই দেখ, তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কি না।"

এই কথা বলিয়া কঙ্কাবতী আকাশের উপর আঁচলটি পাতিলেন। চাঁদটিকে ধরিয়া আঁচলে বাঁধেন আর কি। এমন সময় চাঁদের স্ত্রী চাঁদের ছানা-পোনা লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আছাড়ি-পিছাড়ি খাইতে খাইতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চাঁদনীর কান্নায় আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। চাঁদের ছানা-পোনার কান্নায় কঙ্কাবতীর কানে তালা লাগিল।

চাঁদনী কাঁদতে লাগিলেন, "ওগো, আমি দুর্দান্ত সিপাহীর মুখে শুনিলাম যে, মানুষে তোমার মূল শিকড় কাটিবে। ওগো, আমি সে পোড়ারমুখী মানুষীর কি বুকে ধান ভানিয়াছি যে, সে আমার সহিত এরূপ শত্রুতা সাধিবে! আমাকে যদি বিধবা হইতে হয়, তাহা হইলে তারও আমার মত হাত হইবে। সে বাপ-ভাইয়ের মাথা খাইবে।"

চাঁদের ছানা-পোনাগুলি কঙ্কাবতীর কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি। বাবার তুমি মূল শিকড় কাটিও না, বাবাকে ধরিয়া লইয়া যাইও না।"

চাঁদের ছোট মেয়েটি, যেটি পাথুরে পোকার টিপের মত, সেই মেয়েটি মাঝে মাঝে কাঁদে, মাঝে মাঝে রাগে, আর কঙ্কাবতীকে গালি দিয়া বলে, "অভাগী, পোড়ারমুখী, শালা।" আবার সে কঙ্কাবতীকে গায়ের চারিদিকে আঁচড়ায় কামড়ায় আর চিমৃটি কাটে। তার চিমৃটির জ্বালায় কঙ্কাবতী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো, ও চাঁদনী। তোমার মেয়ে সামলাও বাছা।

তোমার এ ছোট মেয়েটি চিম্‌টি কাটিয়া আমার গায়ের ছাল-চামড়া তুলিয়া লইতেছে।"

চাঁদনী উত্তর করিলেন, "হাঁ, মেয়ে সামলাব বই কি? তুমি আমার সর্বনাশ করিবে, আর আমি মেয়ে সামলাব। কেন, বাছা? তোমার আমি কি করিয়াছি যে, তুমি আমার সর্বনাশ করিবে? মূল শিকড়টি কাটিয়া তুমি আমার পতির প্রাণবধ করিবে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "না গো না। একটুখানি শিকড়ের আমার আবশ্যক ছিল, তা আমি উপর উপর চাঁচিয়া লইয়াছি। অধিক রক্তও পড়ে নাই, কিছুই হয় নাই। তুমি বরং চাঁদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ? তার পর, তোমার স্বামী বলিলেন যে, তাঁর দাঁত নড়িতেছে। তাই মনে করিলাম যে, কলিকাতায় লইয়া যাই, দাঁত ভাল করিয়া পুনরায় তোমার স্বামীকে আকাশে পাঠাইয়া দিব। তাতে আর কাজ নাই বাছা, এখন তোমরা সব চুপ কর। আর তোমার এই মেয়েটিকে বল, আমায় যেন আর চিম্‌টি না কাটে।"

এই কথা শুনিয়া চাঁদনী আশ্বস্ত হইলেন। চাঁদের ছেলে-পিলেদেরও কান্না থামিল।

চাঁদনী বলিলেন, "তোমার যদি বাছা, কাজ সারা হইয়া থাকে, তবে তুমি এখন বাড়ি যাও। তোমার ভয়ে আকাশ একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছে। আকাশবাসীরা সব ঘরে খিল দিয়া বসিয়া আছে। সবাই সশঙ্কিত।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "আমার কাজ সারা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার কতকগুলি নক্ষত্র চাই। আমাদের সেখানে নক্ষত্র নাই। আহা! এখানে কেমন চারিদিকে সুন্দর সুন্দর সব নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে! আমি মনে করিয়াছি, কতকগুলি নক্ষত্র এখান হইতে তুলিয়া লইয়া যাইব। এখান হইতে অনেক দূরে আমার খোক্কশ বাঁধা আছে। কি করিয়া নক্ষত্রগুলি তত দূর লইয়া যাই? একটি মুটে কোথায় পাই?"

চাঁদনী বলিলেন, "আর বাছা! তোমার ভয়ে ঘর হইতে আজ কি লোক বাহির হইয়াছে যে, তুমি মুটে পাইবে? দোকানী-পসারী সব দোকান বন্ধ করিয়াছে, আকাশের বাজার-হাট আজ সব বন্ধ। পথে জনপ্রাণী নাই। আমিই কেবল প্রাণের দায়ে ঘর হইতে বাহির হইয়াছি।"

এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময় কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে, মেঘের পাশে লুকাইয়া কে একটি লোক উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কঙ্কাবতী

ভাবিলেন, ওই লোকটিকে বলি, খোক্কশের বাচ্ছার কাছ পর্যন্ত নক্ষত্রগুলি দিয়া আসে। এইরূপ চিন্তা করিয়া কঙ্কাবতী তাহাকে ডাকিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন, "ওগো শুন। একটা কথা শুন।"

কঙ্কাবতী যেই এই কথা বলিয়াছেন, আর লোকটি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। কঙ্কাবতী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িলেন। কঙ্কাবতী বলিতে লাগিলেন, "ওগো, একটু দাঁড়াও, আমার একটা কথা শুন, তোমার কোনো ভয় নাই।"

আর ভয় নাই! কঙ্কাবতী যতই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যান, আর লোকটি ততই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে। কঙ্কাবতী মনে করিলেন, লোকটি কি দৌড়িতে পারে! বাতাসের মত যেন উড়িয়া যায়।

কঙ্কাবতী তাহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলেন না, কিন্তু দৈবক্রমে এক ঢিপি মেঘ তাহার পায়ে লাগিয়া সে হোঁচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। পড়িয়াও পুনরায় উঠিতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে না উঠিতে কঙ্কাবতী গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

কঙ্কাবতী তাহার গায়ে হাত দিয়া দেখেন যে, তাহার গায়ে হাড় নাই, মাস নাই, কিছুই নাই। দেহ তার অতি লঘু। দুইটি অঙ্গুলিদ্বারা কঙ্কাবতী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন। চক্ষুর নিকট আনিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, কেবল দুই চারিটি তালপাতা দিয়া তাহার শরীর নির্মিত। তালপাতের হাত, তালপাতের পা, তালপাতের নাক-মুখ। সেই তালপাতের উপর জামা-জোড়া-পরা। তাহার শরীর দেখিয়া কঙ্কাবতী অতিশয় বিস্মিত হইলেন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

লোকটি উত্তর করিল, "আমি আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী। আবার কে? এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ি যাই। আঙ্গুল দিয়া অমন করিয়া টিপিও না।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শরীর তালপাতা দিয়া গড়া?"

দুর্দান্ত সিপাহী বলিলেন, "তালপাতা দিয়া গড়া হইবে না তো কি দিয়া গড়া হইবে? ইট পাথর চুন সুরকি দিয়া রেক্তার গাঁথুনি করিয়া আমার শরীর গড়া হ'বে না কি? এত দেশ বেড়াইলে, এত কাণ্ড করিলে, আর তালপাতার সিপাহীর নাম কখনও শুননি? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমাকে কে না জানে? বীর-পুরুষ দেখিলেই লোকে আমার সহিত উপমা দেয়। এখন ছাড়িয়া দাও, বাড়ি যাই। ভাল এক মূল শিকড় কাটাকাটি হইয়াছে বটে!"

কঙ্কাবতী এখন বুঝিলেন যে, ছেলে-বেলা তিনি যে সেই তালপাতার

সিপাহীর কথা শুনিয়াছিলেন, তাহার বাস আকাশে, পৃথিবীতে নয়। আর সেই-ই আকাশের দুর্দান্ত সিপাহী।

কঙ্কাবতী বলিলেন, "দেখ দুর্দান্ত সিপাই! তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে। তা না করিলে তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িব না। এখান হইতে নক্ষত্র এক বোঝা আমি তুলিয়া লইয়া যাইব। কিছু দূর মোটটি তোমাকে লইয়া যাইতে হইবে।"

সিপাহী আর করেন কি? কাজেই সম্মত হইলেন। কঙ্কাবতীর আঁচলে আর কতটি নক্ষত্র ধরিবে? তাই কঙ্কাবতী ভাবিতে লাগিলেন, কি দিয়া নক্ষত্রগুলি বাঁধিয়া লই?

সিপাহী বলিলেন, "অত আর ভাবনা-চিন্তা কেন? চল আমরা আকাশ-বুড়ীর কাছে যাই। কদমতলায় বসিয়া চরকা কাটিয়া সে কত কাপড় করিয়াছে। তাহার কাছ হইতে একখানি গামছা চাহিয়া লই।"

কঙ্কাবতী ও সিপাহী আকাশ-বুড়ীর নিকট গিয়া একখানি গামছা চাহিলেন। অনেক বাকিয়া-ঝকিয়া আকাশ-বুড়ী একখানি গামছা দিলেন। তখন কঙ্কাবতী আকাশের মাঠে নক্ষত্র তুলিতে লাগিলেন। বাছিয়া বাছিয়া, ফুটন্ত-ফুটন্ত, আধ-কুঁড়ি, আধ-ফুটন্ত নানাবর্ণের নক্ষত্র তুলিলেন। সেইগুলি গামছায় বাঁধিয়া, মোটটি সিপাহীর মাথায় দিলেন।

সিপাহী ভাবিলেন, "এতকাল আকাশে চাকরি করিলাম, কিন্তু মুটেগিরি কখনও করিতে হয় নাই। ভাগ্যক্রমে আকাশের লোক সব আজ দ্বারে খিল দিয়া বসিয়া আছে। কেহ যদি আমার এ দুর্দশা দেখিত, তাহা হইলে আজ আমি মরমে মরিয়া যাইতাম।"

মোটটি মাথায় করিয়া, সিপাহী আগে আগে যাইতে লাগিলেন। কঙ্কাবতী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে খোক্কশের বাচ্ছার নিকটে আসিয়া দুইজনে উপস্থিত হইলেন। সিপাহীর মাথা হইতে নক্ষত্রের বোঝাটি লইয়া তখন কঙ্কাবতী বলিলেন, "এখন তুমি যাইতে পার, তোমাকে আর আমার প্রয়োজন নাই।" এই কথা বলিতে না বলিতে সিপাহী এমনি ছুট মারিলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কঙ্কাবতী ভাবিলেন, তালপাতার সিপাহী কি না! তাই এত দ্রুতবেগে ছুটিতে পারে।

মোটটি লইয়া কঙ্কাবতী খোক্কশের বাচ্ছার পিঠে চড়িলেন। খোক্কশের পিঠে চড়িয়া আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে পুনরায় অবতরণ করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সতী

যেখানে মশা ও হাতী কঙ্কাবতীর প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, অবিলম্বে কঙ্কাবতী আসিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। শিকড়-লাভে কৃতকার্য হইয়াছেন শুনিয়া, মশা ও হাতীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। খোক্কসের বাচ্ছাটিকে পুনরায় তাহার গর্তে ছাড়িয়া, মশা ও কঙ্কাবতী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন ও পর্বত-অভ্যন্তরস্থিত সেই অট্টালিকার দিকে যাত্রা করিলেন।

অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়া, কঙ্কাবতী চাঁদের মূল শিকড়টুকু খর্বুরের হস্তে অর্পণ করিলেন। খর্বুর তাহার এক তোলা ওজন করিয়া সাতটি গোলমরিচের সহিত অতি সাবধানে শিলে বাটিলেন। ঔষধটুকু বাটা হইলে, ব্যাঙকে তাহা সেবন করাইলেন। ঔষধ সেবন করিয়া ব্যাঙের হুড় হুড় করিয়া বমন আরম্ভ হইল। পেটে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় বাহির হইয়া পড়িল। ব্যাঙ বলিলেন, "ব্যাঙাচি-অবস্থায়, জলে কিল্‌কিল্ করিতে করিতে আমি যাহা কিছু খাইয়াছিলাম, তাহা পর্যন্ত বাহির হইয়া গিয়াছে, উদরে আর আমার কিছুই নাই।"

বমনের সহিত সেই ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি বাহির হইয়া পড়িল। খর্বুর অতি যত্নে তাহাদিগকে বমনের ভিতর হইতে বাছিয়া লইলেন। তাহার পর একটি পিপীলিকা লইয়া, তাহার উদর হইতে অতি সূক্ষ্ম সন্নাদ্বারা খেতুর পরমায়ুটুকু বাহির করিতে লাগিলেন। এরূপে খুঁটিয়া খুঁটিয়া সমস্ত পিপীলিকা-গুলি হইতে পরমায়ু বাহির করা হইলে, খর্বুর বলিলেন, "এ কি হইল? পরমায়ু তো অধিক বাহির হইল না! এ যৎসামান্য পরমায়ুটুকু লইয়া কি হইবে? ইহাতে তো কোনো ফল হইবে না?"

খর্বুর বিষণ্ণচিত্ত হইলেন, মশা হতাশ হইলেন, ব্যাঙের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল, কঙ্কাবতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। অদৃশ্যভাবে অবস্থিত নাকেশ্বরী ও তাহার মাসী পরিতোষ লাভ করিল।

যাহা হউক, সেই যৎসামান্য পরমায়ুটুকু লইয়া খর্বুর খেতুর নাকে নাস দিয়া দিলেন। খেতু চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

খেতু বলিলেন, "কি অঘোর নিদ্রায় আমি অভিভূত হইয়াছিলাম! কঙ্কাবতী, তুমি আমাকে জাগাইতে পার নাই? দেখ দেখি কত বেলা হইয়া গিয়াছে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "সাধ্য থাকিলে আর জাগাইতাম না?"

খেতু তাহার পর চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কঙ্কাবতীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। খর্বুর, মশা ও ব্যাঙ বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন।

খেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি কাঁদিতেছ কেন? আর এঁরা কারা?"

কঙ্কাবতী কোনো উত্তর করিলেন না।

খেতু একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় বলিলেন, "আমার সকল কথা এখন মনে পড়িতেছে। আমার মাথায় শিকড় ছিল না বলিয়া আমাকে নাকেশ্বরী খাইয়াছিল। কঙ্কাবতী, তুমি বুঝি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আমাকে সুস্থ করিয়াছ? তবে আর কান্না কেন? আমি তো এখন ভাল আছি। কেবল আমার মাথা অল্প অল্প ব্যথা করিতেছে! আমি আর একবার শুই। কঙ্কাবতী, তুমি আমার মাথাটি একটু টিপিয়া দাও। আমার মাথা বড় বেদনা করিতেছে। অসহ্য বেদনা করিতেছে। প্রাণ বুঝি আমার বাহির হয়! ওগো, তোমরা সকলে আমার কঙ্কাবতীকে দেখিও। আমার কঙ্কাবতীকে তার মার কাছে দিয়া আসিও। হা ঈশ্বর।"

খেতুর মৃত্যু হইল।

ঘাড় হেঁট করিয়া সকলে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই। সকলের চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। কেবল কঙ্কাবতী স্থির হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে খর্বুর বলিলেন, "এইবার সব ফুরাইল। আমাদের সমুদয় পরিশ্রম বিফল হইল। এখন আর কোনো উপায় নাই। তালগাছ হইতে পতনের সময় পরমায়ুর অধিকাংশ ভাগ বাতাসে উড়িয়া গিয়াছিল। কেবল অতি সামান্য ভাগ পিপীলিকাতে খাইয়াছিল। সে পরমায়ুটুকুতে মনুষ্য আর কতক্ষণ বাঁচিতে পারে?"

এই বলিয়া খর্বুর কাঁদিতে লাগিলেন, মশা কাঁদিলেন, ব্যাঙ রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন, বাহিরে হাতী শুঁড় দিয়া ধূলা উড়াইতে লাগিলেন। কেবল কঙ্কাবতী নীরব, কঙ্কাবতীর কান্না নাই।

অবশেষে মশা বলিলেন, "মা উঠ। বিলাপে আর কোনো ফল নাই। তোমার পতির এক্ষণে আমরা যথাবিধি সৎকার করি। তাহার পর তুমি আমার সহিত রক্তবতীর নিকট যাইবে। রক্তবতীকে দেখিলে তোমার মন অনেক শান্ত হইবে।"

মশা, খর্বুর ও ব্যাঙ কঙ্কাবতীকে বুঝাইতে লাগিলেন!

খর্বুর বলিলেন, "সংসার অনিত্য। জীবনের কিছু স্থিরতা নাই। কখন কে আছে, কখন কে নাই। উঠ মা উঠ। তোমার পতির যথাবিধি সংকার হইলে, কিছুদিন তুমি রক্তবতীর নিকট গিয়া থাক। তাহার পর তোমার মার নিকট গিয়া রাখিয়া আসিব।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মহাশয়গণ, আপনারা আমার অনেক উপকার করিলেন। আমার জন্য আপনারা অনেক পরিশ্রম করিলেন। আপনাদিগের পরিশ্রম যে সফল হইল না, সে কেবল আমার অদৃষ্টের দোষ। ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যখন এত পরিশ্রম করিলেন, তখন এক্ষণে আমার আর একটি যৎসামান্য উপকার করুন। সেইটি করিয়া আপনারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পতিপদে আমি আমার প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এই যে আমার শরীর দেখিতেছেন, এ প্রাণহীন জড় দেহ। এক্ষণে আমি পতিদেহের সহিত আমার এই জড়দেহ ভস্ম করিব। সে নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, আপনারা সেই সমস্ত উপকরণের আয়োজন করিয়া দিন।"

মশা বলিলেন, "ছি মা। ও কথা কি মুখে আনিতে আছে? পতিহারা হইয়া শত শত সতী এ পৃথিবীতে জীবিত আছে। ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া পরোপকারে জীবন অতিবাহিত করে।"

খর্বুর ও ব্যাঙ সকলেই কঙ্কাবতীকে সেইরূপ নানাপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন।

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী!"

মাসী বলিল, "উঁ!"

নাকেশ্বরী বলিল, "মানুষটাকে সৎকার করিবে যে, তাহা হইলে আর আমরা কি ছাই খাইব?"

মাসী বলিল, "হুঁ!"

নাকেশ্বরী বলিল, "এই ছুঁড়ীর জন্যই যত বিপত্তি। এখন ছুঁড়ীও যাতে মরে এস তাই করি।"

এই কথা বলিয়া নাকেশ্বরী খর্বুর প্রভৃতির নিকট আসিয়া আবির্ভূত হইল।

নাকেশ্বরী বলিল, "তোমরা কি পরামর্শ করিতেছ? কঙ্কাবতীকে দেশে লইয়া যাইবে? লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই। কিন্তু এ ধর্মভূমি ভারতভূমির নিয়ম তোমরা জান না। লোকের এখানে ধর্মগত প্রাণ। শোকেই হউক আর তাপেই হউক, সহসা যদি কেহ মুখে একবার বলিয়া ফেলে যে, আমি পতির সঙ্গে যাইব, তাহা হইলে তাহাকে যাইতেই হইবে, সতী হইতেই হইবে। না হইলে পতিকুল, পিতৃকুল, মাতৃকুল, সকল কুল ঘোর কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে। সে কলঙ্কিনী একেবারেই পতিত হইবে। তাহার সহিত যিনি আচার-ব্যবহার করিবেন, তিনিও পতিত হইবেন। তাই বলিতেছি, তোমরা ইহাকে ঘরে লইয়া যাও, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই; কিন্তু শুন মশা মহাশয়! শুন খর্বুর মহারাজ! আমি এ কথা তোমাদিগের আত্মীয়স্বজনকে বলিয়া দিব। তোমাদের আত্মীয়স্বজনেরা কিছু তোমাদিগের মত নাস্তিক নন। তাঁরা নিশ্চয় ইহার যথাশাস্ত্র বিচার করিবেন। তখন দেখিব, পুত্র-কন্যার বিবাহ দাও কোথায়?"

নাকেশ্বরীর কথা শুনিয়া মশার ভয় হইল। আজ বাদে কাল তাঁর রক্তবতীর বিবাহ দিতে হইবে। পাত্র না মিলিলে তাঁকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। মশা তাই খর্বুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্য সত্য কি ভারতের এই নিয়ম?"

খর্বুর উত্তর করিলেন, "পূর্বে এইরূপ নিয়ম ছিল সত্য। কিন্তু এক্ষণে সহমরণ উঠিয়া গিয়াছে। সাহেবেরা ইহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

নাকেশ্বরী বলিল, "উঠিয়া গেছে সত্য। কিন্তু আজ-কাল শিক্ষিত পুরুষদিগের মত কি জান? পূর্বপ্রথা সমুদয় পুনঃপ্রচলিত করিবার নিমিত্ত তাঁহারা যথোচিত প্রয়াস পাইতেছেন। শোক-বিহ্বলা ক্ষিপ্ত-প্রায়া জননী-ভগিনীদিগকে জ্বলন্ত অনলে পোড়াইবার নিমিত্ত আজ-কালের শিক্ষিত পুরুষেরা নাচিয়া উঠিয়াছেন। এইরূপ ধর্মের আমরা সম্পূর্ণভাবে পোষকতা করিয়া থাকি।"

খর্বুর বলিলেন, "আমার যাই থাকুক কপালে, আমি কঙ্কাবতীর সহিত আচার-ব্যবহার করিব। তাহাতে আমাকে পতিত হইতে হয় সেও স্বীকার।

আত্মীয়-স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করেন করুন, তাহাতে আমি ভয় করিব না। তা বলিয়া অনাথা বালিকাটি যে অসহনীয় শোকে ক্ষিপ্তপ্রায়া হইয়া পুড়িয়া মরিবে, তাহা আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

মশা বলিলেন, "আমারও ওই মত, ভীরু কাপুরুষের মত কার্য করিতে পারিব না। আমি কঙ্কাবতীকে ঘরে লইয়া যাইব।"

ব্যাঙ বলিলেন, "আমারও ওই মত। কাপুরুষ হয়, মানুষেরা হউক। আমি হইব না।"

নাকেশ্বরী বলিল, "ধর্মের তোমরা কিছুই জান না। ঘোর অধর্মে যে তোমরা পতিত হইবে, সে জ্ঞান তোমাদের নাই। ইনি যদি সতী না হন, তাহা হইলে ইঁহাকে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবুও ইনি ঘরে যাইতে পাইবেন না। মুর্দাফরাশে ইঁহাকে লইয়া যাইবে, মুর্দাফরাশের রমণী হইয়া ইঁহাকে চিরকাল থাকিতে হইবে।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "এই কথা লইয়া আপনারা বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। আমি নিশ্চয় সতী হইব; আমি কাহারও কথা শুনিব না। আমি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব। বাঁচিয়া থাকিতে আর আপনারা আমাকে অনুরোধ করিবেন না, যেহেতু আপনাদিগের কথা আমি রক্ষা করিতে পারিব না। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, সতী হইতে যাহা কিছু আবশ্যক, সেই সমুদয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া দিন। আমার আর একটি কথা আছে। আমাদিগের যে ঘাট আছে, সেইখানে আমার শাশুড়ী-ঠাকুরানীর চিতা হইয়াছিল, সেইস্থানে চিতা করিয়া আমি আমার পতির সঙ্গে পুড়িয়া মরিব।"

কঙ্কাবতীর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা দেখিয়া অতি দুঃখের সহিত অগত্যা এ কার্যে সকলকে সম্মত হইতে হইল।

মশা বলিলেন, "কঙ্কাবতী, যদি তুমি নিতান্তই এই দুষ্কর কার্য করিবে, তবে আমি আমার বাড়িতে সংবাদ দিই, আমার স্ত্রীগণ ও রক্তবতী আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।"

খর্বুর বলিলেন, "আমিও তবে আমার স্ত্রীকে সংবাদ দিই। আমার আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে লইয়া তিনিও আসুন। সহমরণের উপকরণ আনয়ন করুন ও নাপিত পুরোহিত, ঢাকী-ঢুলীর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিন।"

ব্যাঙ বলিলেন, "আমিও আমার আত্মীয়-স্বজনের নিকট সমাচার পাঠাই।"

বাহিরে হাতী বলিলেন, "আমিও আমার জ্ঞাতি বন্ধুদিগকে ডাকিতে পাঠাই।"

নাকেশ্বরী বলিল, "মাসী, তবে আমরা আর বাকী থাকি কেন? তুমি তোমার ঝুড়িতে গিয়া চড়। পৃথিবীতে যত ভূতিনী-প্রেতিনী আছে, সহমরণ দেখিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। আজকাল সহমরণ কিছু আর প্রতিদিন হয় না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা সকল ভূতিনী-প্রেতিনীই সহমরণ দেখিয়া পরম পরিতোষ উপভোগ করিবে।"

এইরূপে সকলেই আপনার আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর, খেতু ও কঙ্কাবতীকে লইয়া সকলে হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় সকলে কুসুমঘাটীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কঙ্কাবতী যে স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, সেইস্থানে চিতা সুসজ্জিত হইল।

এই সময় রক্তবতী ও রক্তবতীর মাতাগণ সেই শ্মশানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহমরণের সমুদয় উপকরণ লইয়া নাপিত পুরোহিত, ঢাকী-ঢুলী সঙ্গে করিয়া খর্বুরের সপ্তহস্ত-পরিমিত স্ত্রী ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন আপন আপন বালক-বালিকাগণকে লইয়া সেইখানে আসিলেন। ব্যাঙ ও হস্তীর আত্মীয়বর্গও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাদিক্ হইতে অসংখ্য ভূতিনী-প্রেতিনীগণও আগমন করিল। সেই শ্মশানঘাটে সে রাত্রিতে মনুষ্য ও ভূত-ভূতিনী ভিন্ন অপরাপর নানাপ্রকার জীবজন্তুর সমাগম হইল। সে রাত্রিতে কুসুমঘাটীর শ্মশানঘাট জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল।

রক্তবতী কঙ্কাবতীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে রক্তবতী বলিলেন, "পচাজল, তুমি কোথায় যাও? আমাকে ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি কখনই তোমাকে যাইতে দিব না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "পচাজল, তুমি কাঁদিও না। সতী হইয়া পতিসঙ্গে আমি স্বর্গে চলিলাম। সে কার্যে তুমি আমাকে বাধা দিও না। কি করিব পচাজল, মন্দ অদৃষ্ট করিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম; এ পৃথিবীতে সুখ

হইল না। পতির সহিত এখন স্বর্গে যাই। আশীর্বাদ করি, রাজপুত্র মশা তোমার বর হউক। পতি লইয়া তুমি সুখে ঘরকন্না কর। আমার মত হতভাগিনী যেন শত্রুও না হয়।"

এই বলিয়া কঙ্কাবতী মশা-কন্যাকে নক্ষত্রের পুটুলিটি বাহির করিয়া দিলেন। কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভাই পচাজল, এই নক্ষত্রগুলি দিয়া তিন ছড়া মালা গাঁথ। এক ছড়া তুমি লও আর দুই ছড়া আমার জন্য রাখ, প্রয়োজন আছে।"

সকলে তখন খেতুকে চিতার উপর রাখিলেন। প্রেত-পিণ্ডাদি যথাবিধি প্রদত্ত হইল। নাপিত আসিয়া কঙ্কাবতীর নখ কাটিয়া দিল। তাহার পর কঙ্কাবতী শরীর হইতে সমুদয় অলংকারগুলি খুলিয়া ফেলিলেন। হাতের চুড়ি ভাঙিয়া ফেলিলেন। সেই ভাঙা চুড়ি লোকে হুড়াহুড়ি কাড়াকাড়ি করিয়া কুড়াইতে লাগিল। কেন না, কাহাকেও ভূত-প্রেতিনীতে পাইলে এই চুড়ি রোগীর গলায় পরাইয়া দিলে ভূত-প্রেতিনী ছাড়িয়া যায়।

কঙ্কাবতী হাতের নো খুলিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। খর্বুরপত্নী তখন তাঁহাকে রক্তবর্ণের চেলির কাপড় পরাইয়া দিলেন। রাঙাসুতা দিয়া হাতে আলতা বাঁধিয়া দিলেন। চুলের উপর থরে থরে চিরুনি সাজাইয়া দিলেন। কপাল জুড়িয়া সিন্দুর ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপ বেশ-ভূষা হইলে, কঙ্কাবতী আচমন করিয়া তিল জল কুশ হস্তে পূর্বমুখে বসিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে মন্ত্র পড়াইয়া এইরূপ সংকল্প করাইলেন।

"অদ্য ভাদ্রমাসে, কৃষ্ণপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে ভরদ্বাজ গোত্রের আমি শ্রীমতী কঙ্কাবতী দেবী, বশিষ্ঠকে লইয়া অরুন্ধতী যেরূপ স্বর্গে মহামান্যা হইয়াছিলেন, আমিও যেন সেইরূপ, মানুষের শরীরে যত লোম আছে, তত বৎসর স্বর্গে পতিকে লইয়া সুখে থাকিতে পারি। আমার মাতৃ-পিতৃ ও শ্বশুর-কুল যেন পবিত্র হয়। যতদিন চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার থাকিবে, ততকাল পর্যন্ত যেন অপ্সরাগণ আমাদিগের স্তব করিতে থাকে। পতির সঙ্গে যেন সুখে থাকি। ব্রহ্মহত্যা, মিত্রহত্যা ও কৃতঘ্নতাজন্য যদি পতির পাপ হইয়া থাকে, আমার স্বামী যেন সে পাপ হইতে মুক্ত হন। এই সকল কামনা করিয়া আমি পতির জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিতেছি।"

এইরূপে পুরোহিত কঙ্কাবতীকে সংকল্প করাইলেন। তাহার পর সূর্যার্ঘ্য দিয়া দিক্‌পালগণকে সাক্ষী করিলেন। সে মন্ত্রের অর্থ এই ঃ

"অষ্ট-লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা, ধর্ম,—তোমরা সকলে সাক্ষী থাক, আমি জলন্ত চিতারোহণ করিয়া স্বামীর অনুগমন করিতেছি।"

লোকপালদিগকে সাক্ষী মানা হইলে, কঙ্কাবতী আঁচলে খই, খণ্ডের পরিবর্তে বাতাসা ও কড়ি লইয়া, সাতবার চিতাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন, আর সেই খই-খড়ি ছড়াইতে লাগিলেন। বালক-বালিকাগণ হুড়াহুড়ি করিয়া খই-কড়ি কুড়াইতে লাগিল। কেন না, এই খই বিছানায় রাখিলে ছারপোকা হয় না।

উপস্থিত রমণীগণের মধ্যে একজন সতীর নিকট হইতে তাঁহার কপালের একটু সিন্দুর চাহিয়া লইলেন। সেই রমণীর পুত্রবধূ নিতান্ত শিশু, এখনও পতিভক্তি তাহার মনে উদয় হয় নাই। তাহার কপালে এই সিন্দুর পরাইয়া দিলে সে অবিলম্বে পতিপরায়ণা হইবে।

চিতা প্রদক্ষিণ করা হইলে, পুরোহিত কঙ্কাবতীকে ঋঙ্‌মন্ত্র পড়াইলেন। শেষে কঙ্কাবতী রক্তবতীর নিকট হইতে নক্ষত্রের মালা দুই ছড়া চাহিয়া লইলেন। চিতার উপর আরোহণ করিয়া এক ছড়া মালা খেতুর গলায় দিলেন, এক ছড়া মালা আপনি পরিলেন। তাহার পর চিতার উপর স্বামীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

গাছের কাঁচা ছাল দিয়া, সকলে তাঁহাকে সেই চিতার সহিত বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর চিতার চারিদিকে সকলে আগুন দিয়া দিলেন। আগুন দিয়া বড় বড় কঞ্চির বোঝা, বড় বড় শরের বোঝা, বড় বড় পাকাটির বোঝা চারিদিক্ হইতে সকলে ঝুপ ঝাপ করিয়া চিতার উপর ফেলিতে লাগিলেন। বাদ্যকরদিগের ঢাক-ঢোলের কোলাহলে সকলের কর্ণে তালি লাগিল। চিতা ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল। আকাশপ্রমাণ হইয়া অগ্নিশিখা উঠিল।

কঙ্কাবতী অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী-নিদ্রা!

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিশেষ

অতি সুখ-নিদ্রা! অতি শান্তিদায়িনী-নিদ্রা!

বৈদ্য বলিলেন, "এই যে নিদ্রাটি দেখিতেছেন, ইহা সুনিদ্রা। বিকারের ঘোর নহে। বিকার কাটিয়া গিয়াছে। নাড়ী পরিষ্কার হইয়াছে। এক্ষণে বাড়িতে যেন শব্দ হয় না। নিদ্রাটি যেন ভঙ্গ হয় না!"

বৈদ্য প্রস্থান করিলেন। অঘোর অচৈতন্য হইয়া রোগী নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। বাড়িতে সকলেই চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিলেন। বাড়িতে পিপীলিকার পদশব্দটি পর্যন্ত নাই।

মাতা কাছে বসিয়া রহিলেন। এক একবার কেবল কন্যার নাসিকার নিকট হাত রাখিয়া দেখিতে লাগলেন, রীতিমত নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না।

আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মা আজ বাইশ দিন কন্যার নিকট এইরূপে বসিয়া আছেন। প্রাণসম কন্যাকে লইয়া যমের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছেন। প্রবল বিকারের উত্তেজনায় কন্যা যখন উঠিয়া বসেন, মা তখন আস্তে আস্তে পুনরায় তাঁহাকে শয়ন করান। বিকারের প্রলাপে কন্যা যখন চীৎকার করিয়া উঠেন, মা তখন তাঁহাকে চুপ করিতে বলেন। সুধাময় মার বাক্য শুনিয়া বিকারের আগুনও কিছুক্ষণের নিমিত্ত নির্বাণ হয়।

কন্যা নিদ্রিত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। বহুদিন অনাহারে, প্রবল দুরন্ত জ্বরে, ঘোরতর বিকারে দেহ এখন তাঁর শীর্ণ, মুখ এখন মলিন। তবুও তাঁর মধুর রূপ দেখিলে সংসার সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়। অনিমিষ নয়নে মা সেই অপূর্ব রূপরাশি অবলোকন করিতেছেন।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা হইল। তবুও রোগীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। মা কাছে বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে ভগিনী আসিয়া মার কাছে বসিলেন।

রোগীর ওষ্ঠদ্বয় একবার ঈষৎ নড়িল। অপরিস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। শুনিবার নিমিত্ত ভগিনী মস্তক অবনত করিলেন। শুনিতে পাইলেন না, বুঝিতে পারিলেন না।

আবার ওষ্ঠ নড়িল, রোগী আবার কি বলিলেন। মা এইবার সে কথা বুঝিতে পারিলেন।

মা বলিলেন, "খেতু খেতু করিয়াই বাছা আমার সারা হইলেন, আজ কয়দিন মুখে কেবল ওই নাম। এখন যদি চারিহাত এক করিতে পারি, তবেই মনের কালি যায়।"

মার সুমধুর কণ্ঠ-স্বর কন্যার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল। সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া, ধীরে ধীরে তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন। বিস্মিত-বদনে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মা বলিলেন, "বিকার সম্পূর্ণরূপে এখনও কাটে নাই। চক্ষুতে এখনও সুদৃষ্টি হয় নাই। আজ উনিশ দিন মা আমার কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।"

ভগিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, তুমি আমাকে চিনিতে পার?"

কঙ্কাবতী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, "পারি, তুমি বড় দিদি!"

ভগিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে বল দেখি?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মা।"

তনু রায় ঘরের ভিতর আসিলেন। তনু রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কঙ্কাবতী, আজ কেমন আছ মা?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "ভাল আছি বাবা।"

তনু রায় একটু কাছে বসিলেন। স্নেহের সহিত কন্যার গায় মাথায় একটু হাত বুলাইলেন। তাহার পর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কঙ্কাবতী ভাবিলেন,—মা, ভগিনী, পিতা সকলেই দেখিতেছি আমার সহিত স্বর্গে আসিয়াছেন। পৃথিবীতে পিতার স্নেহ কখনও পাই নাই। আজ স্বর্গে আসিয়া পাইলাম। পৃথিবীতে আমাদের যেরূপ বাড়ি, আমার যেরূপ ঘর ছিল, স্বর্গেও দেখিতেছি সেইরূপ। কিন্তু যাঁহার সহিত সহমরণ যাইলাম, তিনি কোথায়?

অনেকক্ষণ কঙ্কাবতী তাঁর প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। তিনি আসিলেন না।

অবশেষে কঙ্কাবতী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তিনি কোথায়?"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কে?"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "সেই যিনি বাঘ হইয়াছিলেন।"

মা বলিলেন, "এখনও ঘোর বিকার রহিয়াছে, এখনও প্রলাপ রহিয়াছে।"

মার কথা শুনিয়া কঙ্কাবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। শরীর তাঁহার নিতান্ত দুর্বল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অল্প অল্প করিয়া তাঁহার পূর্ব কথা সব স্মরণপথে আসিতে লাগিল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমার কি অতিশয় পীড়া হইয়াছিল?"

মা বলিলেন, "হাঁ বাছা, আজ বাইশ দিন তুমি শয্যাগত। তোমার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। এবার যে তুমি বাঁচিবে, সে আশা ছিল না।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মা, আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটি আমার মনে এরূপ গাঁথা রহিয়াছে যে, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে। এখন আমার মনে নানা কথা আসিতেছে। তাহার ভিতর আবার কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি স্বপ্ন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই মা তোমাকে গুটিকত কথা জিজ্ঞাসা করি। আচ্ছা মা, জনার্দন চৌধুরীর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, সে কথা সত্য?"

মা বলিলেন, "সে কথা সত্য। তাই লইয়াই তো আমাদের যত বিপদ্!"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, বরফ লইয়া কি দলাদলি হইয়াছিল, সে কথা কি সত্য?"

মা উত্তর করিলেন, "হাঁ বাছা, সে কথাও সত্য। সেই কথা লইয়া পাড়ার লোকে খেতুর মাকে কত অপমান করিয়াছিল।"

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি এখন কোথায় মা?"

মা বলিলেন, "তিনি আসেন এই। সমস্ত দিন এইখানেই থাকেন। আমার চেয়ে তিনি তোমাকে ভালবাসেন। তাঁর হাতে তোমাকে একবাব সুঁপিয়া দিতে পারিলেই এখন আমার সকল দুঃখ যায়। কর্তার মত হইয়াছে, সকলের মত হইয়াছে, এখন তুমি ভাল হইলেই হয়।"

কঙ্কাবতী বুঝিলেন যে, তবে খেতুর মার মৃত্যু হয় নাই, সে কথাটি স্বপ্ন।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই দলাদলির পর আমার জ্বর হয়, না মা?"

মা বলিলেন, "এই সময় তোমার জ্বর হয়। তুমি একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া পড়। তোমার ঘোরতর জ্বর-বিকার হয়। আজ বাইশ দিন।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "তাহার পর মা, আমি নদীর ঘাটে গিয়া একখানি নৌকার উপর চড়ি, না মা?"

মা বলিলেন, "বালাই, তুমি নৌকায় চড়িবে কেন মা? সেই অবধি তুমি শয্যাগত।"

কঙ্কাবতী বলিলেন, "মা, কত যে কি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা আর তোমায় কি বলিব। সে সব কথা মনে হইলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। স্বপ্নে দেখিলাম কি মা যে গায়ের জ্বালায় আমি নদীর ঘাটে গিয়া জল মাখিতে লাগিলাম। তাহার পর একখানি নৌকাতে চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইলাম। নৌকাখানি আমার ডুবিয়া গেল। মাছেরা আমাকে তাদের রানী করিল। তাহার পর কিছুদিন গোয়ালিনী মাসীর বাড়ীতে রহিলাম। সেখান হইতে শ্মশানঘাটে যাইলাম। তাহার পর পুনরায় বাড়ি আসিলাম। এক বৎসর পরে আমাদের বাটীতে একটি বাঘ আসিল। সেই বাঘের সহিত আমি বনে যাইলাম। তার পর ভূতিনী, ব্যাঙ, মশা কত কি দেখিলাম। তার পর মা আকাশে উঠিলাম, কত কি করিলাম, কত কি দেখিলাম, স্বপ্নটি যেন আমার ঠিক সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে। হাঁ মা, সে দলাদলির কি হইল?"

মা উত্তর করিলেন, "সে দলাদলি সব মিটিয়া গিয়াছে। যখন তোমার সমূহ পীড়া, যখন তুমি অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছ, আজ আট নয় দিনের কথা আমি বলিতেছি, সেই সময় জনার্দন চৌধুরীর একটি পৌত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল। জনার্দন চৌধুরী সেই পৌত্রটিকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গোবর্ধন শিরোমণিরও সংকটাপন্ন পীড়া হইল। আর আমাদের বাটীতে তো তোমাকে লইয়া সমূহ বিপদ্। জনার্দন চৌধুরীর সুমতি হইল। তিনি রামহরিকে আনিতে পাঠাইলেন। রামহরি সপরিবারে কলিকাতা হইতে দেশে আসিলেন। রামহরির সহিত জনার্দন চৌধুরী অনেকক্ষণ পরামর্শ করিলেন। তাহার পর রামহরি নিরঞ্জনকে ডাকিয়া আনিলেন। রামহরি, নিরঞ্জন, আমাদের কর্তাটি ও খেতু সকলে মিলিয়া জনার্দন চৌধুরীর বাটীতে যাইলেন। জনার্দন চৌধুরী বলিলেন, আমি পাগল নাকি যে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। নিরঞ্জনকে আমি দেশত্যাগী করিয়াছি; খেতু বালক, তাহার প্রতি আমি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছি। সেই অবধি নানাদিকে আমাদের অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকের টাকা আত্মসাৎ করিয়া ষাঁড়েশ্বর কয়েদ হইয়াছে। গোবর্ধন শিরোমণি পক্ষাঘাত রোগে মরণাপন্ন হইয়া আছেন। বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই দারুণ শোক পাইতে হইল। এঁর কন্যাটিও রক্ষা পাওয়া ভার। এই কথা বলিয়া তিনি নিরঞ্জনকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহার ভূমি

ফিরিয়া দিলেন। নিরঞ্জন এখন আপনার বাটীতে বাস করিতেছেন। খেতুকে অনেক আশীর্বাদ করিয়া জনার্দন চৌধুরী সান্ত্বনা করিলেন। আমাদের কর্তাটি আর সে মানুষ নাই। এক্ষণে তাঁহার মনে স্নেহ-মায়া দয়া-ধর্ম হইয়াছে। বিপদে পড়িলে লোকের এইরূপ সুমতি হয়। তোমার দাদাও এখন আর সেরূপ নাই। মাকে যেরূপ আস্থা-ভক্তি করিতে হয়, সুপুত্রের মত তোমার দাদাও এক্ষণে আমাকে আস্থা-ভক্তি করে। তোমার পীড়ার সময় তোমার দাদা অতিশয় কাতর হইয়াছিল। তুমি ভাল হইলে খেতুর সহিত তোমার বিবাহ হইবে। এবার আর এ কথার অন্যথা হইবে না। তোমার পীড়ার সময় খেতু, খেতুর মা, রামহরি, সীতা প্রভৃতি সকলেই প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। এক্ষণে সকল কথা শুনিলে, এখন আর অধিক কথা শুনিয়া কাজ নাই। এখনও তুমি অতিশয় দুর্বল। পুনরায় অসুখ হইতে পারে।"

কঙ্কাবতী অনেক দিন দুর্বল রহিলেন। ভাল হইয়া সারিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইল। সীতা তাঁহার নিকট আসিয়া সর্বদা বসিতেন। স্বপ্ন-কথা তিনি সীতার নিকট সমুদয় গল্প করিলেন। সীতা মাকে বলিলেন, বউদিদি খেতুকে বলিলেন, এইরূপে কঙ্কাবতীর আশ্চর্য স্বপ্ন-কথা পাড়ার স্ত্রী পুরুষ সকলেই শুনিলেন। স্বপ্ন-কথা আদ্যোপান্ত শুনিয়া কঙ্কাবতীর উপর সীতার বড় অভিমান হইল।

সীতা বলিলেন, সমুদয় নক্ষত্রগুলি তুমি নিজে পরিলে, আর আপনার পচাজলকে দিলে। আমার জন্য একটিও রাখিলে না। আমাকে তুমি ভালবাস না। তুমি তোমার পচাজলকে ভালবাস। আমি তোমার সহিত কথা কহিব না।"

কঙ্কাবতী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। পূর্বের ন্যায় পুনরায় সবল হইলেন। পীড়া হইতে সারিয়া কঙ্কাবতী সম্মুখে একটু-আধটু বাহির হইতেন। একদিন খেতু কঙ্কাবতীদের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেইখানে একটি মশা উড়িতেছিল। খেতু সেই মশাটিকে ধরিয়া কঙ্কাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ দেখি কঙ্কাবতী! এই মশাটি তো তোমার 'পচাজল' নয়? আহা! রক্তবতী আজ অনেক দিন তার পচাজলকে দেখিতে পাই নাই। তাহার মন কেমন করিতেছে। তাই সে হয়তো তোমাকে খুঁজিতে আসিয়াছে।"

লজ্জায় কঙ্কাবতী গিয়া ঘরে লুকাইলেন। সেই অবধি আর খেতুর সম্মুখে বাহির হইতেন না।

নিরঞ্জন একদিন খেতুকে বলিলেন, "খেতু, কঙ্কাবতীর অদ্ভুত স্বপ্ন-কথা আমি শুনিয়াছি। কি আশ্চর্য স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন বা বিকারের প্রলাপ বলিয়া তুমি উপহাস করিও না। স্বপ্ন কি নয়, তাহাই বুঝিতে পারি না। এই আমাদের জীবন, আমাদের আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, সকলই স্বপ্নবৎ বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অপূর্ব মায়া কিছুই বুঝিতে পারি না। সামান্য একটি পদার্থের কথাই আমরা ভালরূপ অবগত নহি। এই দেখ, আমার হাতে এখন যে পুস্তকখানি রহিয়াছে, প্রকৃত ইহা কি, তাহার কিছুই জানি না। আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল কতকগুলি গুণ অনুভব হয়। চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই যে, ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ স্থূলতা ও বর্ণ আছে, ত্বকের দ্বারা জানিতে পারি যে, ইহার কাঠিন্য আছে, নাসিকা দ্বারা ইহার ঘ্রাণ ও জিহ্বার দ্বারা ইহার স্বাদ অনুভব করি। প্রকৃত পুস্তকখানি আমরা দেখিতে পাই না, যাহাকে পুস্তকের গুণ বলি, তাহাই আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু সে গুণগুলি পুস্তকের, কি আমাদের ইন্দ্রিয়ের? আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি এখন যেভাবে গঠিত, সেইভাবে আমরা গুণাদি অনুভব করি। যদি আমাদের ইন্দ্রিয়সমুদয় অন্যরূপে গঠিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ আবার অন্যরূপ ধারণ করিত। এই পুস্তকের পত্রগুলি এখন শুভ্র ও কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে। যদি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়া, কিঞ্চিৎমাত্র আমার চক্ষুর গঠন পরিবর্তিত হয়, তাহা হইলে এই পুস্তকখানিই আবার আমার চক্ষে পীতবর্ণ দেখাইবে। তাই দেখ, প্রথম তো পুস্তকখানি দেখিতে পাই না, কতকগুলি গুণ কেবল অনুভব করি। আবার বলিতে গেলে, সেই গুণগুলি পুস্তকের নয়, আমাদের ইন্দ্রিয়ের। তবে পুস্তক রহিল কোথা? কোনও বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া স্বপ্ন-সৃজিত কাল্পনিক জীবের ন্যায় আমরা সকলেই এই সংসারে যেন বিচরণ করিতেছি। সেজন্য কনকাবতীর স্বপ্নকে আমরা উপহাস করিব কেন? সমুদয় বাহ্যজগৎ যেরূপ আমাদের জাগরিত ইন্দ্রিয়-কল্পিত, কনকাবতীর স্বপ্নও সেইরূপ কনকাবতীর সুষুপ্ত-ইন্দ্রিয়-কল্পিত। দুই জগতে বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ নাই। কনকাবতী যাহা দেখিয়াছে, যাহা শুনিয়াছে, যাহা কখনও চিন্তা করিয়াছে, এই সমুদয় লইয়া একটি স্বপ্ন-জগৎ নির্মিত হইয়াছিল। স্বপ্নের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল স্থানেই কনকাবতী বর্তমান। কনকাবতী কি দেখিতেছে, কি শুনিতেছে, কি বলিতেছে, কি ভাবিতেছে, তা ছাড়া স্বপ্নে

আর কিছুই নাই। কনকাবতীর যেরূপ ভ্রম হওয়া সম্ভব, স্থানে স্থানে সেইরূপ ভ্রমও দেখিতে পাই। হাতীদের মত মশাদিগের নাক পরিবর্ধিত হইয়া শুঁড় হয় না, মশাদিগের দুই চল বাড়িয়া শুঁড় হয়। আবার অন্য স্থানে, যেমন আকাশে, কল্পনাদেবী কনকাবতীর সহিত কিছু ক্রীড়া করিয়াছেন। যাহা হউক স্বপ্নটি অদ্ভুত বলিয়া মানিতে হইবে। আমি আশ্চর্য হই, কনকাবতী সেই মশাদিগের সংস্কৃত শ্লোকটি কি করিয়া রচনা করিল?"

খেতু হাসিয়া বলিলেন, "একবার পরিহাস-চ্ছলে আমি ওই বচনটি রচনা করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা। একখানি কাগজে ইহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে কাগজখানি ফেলিয়া দিই। কঙ্কাবতী বোধ হয়, সেই কাগজখানি দেখিয়া থাকিবে।"

কঙ্কাবতী উত্তমরূপে আরোগ্য লাভ করিলে, শুভ দিনে শুভ লগ্নে খেতু ও কঙ্কাবতীর শুভ-বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হইল। ঘোরতর দুঃখের পর এই কার্য সুসম্পন্ন হইল, সেজন্য সপ্তগ্রাম সমাজের লোক সকলেই আনন্দিত হইলেন। বিশেষতঃ জনার্দন চৌধুরী পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়স ও কফের ধাতু, কিন্তু সেজন্য তিনি কিছুমাত্র উপেক্ষা করেন নাই। বিবাহের দিন সমস্ত রাত্রি তিনি তনু রায়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। চুপি চুপি তিনি কলিকাতা হইতে প্রচুর পরিমাণে বরফ আনয়ন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় পরিহাসচ্ছলে সকলকে তিনি বলিলেন, "বর যে একেলা 'বরথ' খাইয়া সুশীতল করিবে, তাহা হইবে না, আমরাও আমাদের শরীর যৎসামান্য স্নিগ্ধ করিব।"

দেশের লোক, যাঁহারা কখনও বরফ দেখেন নাই, আজ বরফ দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। আগ্রহের সহিত সকলেই সুস্নিগ্ধ বরফ-জল পান করিলেন। বাড়িতে দেখাইবার জন্য অনেকেই অল্প কাঁচা বরফ লইয়া গেলেন।

শূদ্রভোজনের সময় গদাধর ঘোষ তিন লোটা বরফ-জল পান করিলেন। আর প্রায় এক সের সেই করাতের মত কর্তনশীল 'বরথ' দন্ত দ্বারা চিবাইয়া খাইলেন।

কঙ্কাবতীর মা যখন কঙ্কাবতীকে খেতুর মার হাতে সুঁপিয়া দিয়া বলিলেন, "দিদি! এই নাও, তোমার কঙ্কাবতী নাও", তখন দুইজনের আহ্লাদ রাখিতে পৃথিবীতে কি আর স্থান হইল? মনের আনন্দে তখন খেতুর মা কি

পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ঘরে লন নাই? বরণের সময় লজ্জায় খেতু কি ঘাড় হেঁট করিয়া ছিলেন না? কলা-বউয়ের মত কঙ্কাবতীর কি তখন একহাত ঘোমটা ছিল না? তা দেখিয়া পাড়ার একটি শিশু ছেলে কি সেই ঘোমটার ভিতর মুখ দিয়া টুঃ দেয় নাই? এ সব কথার আর উত্তর দিবার আবশ্যক নাই।

যে সময় বরণ হইতেছিল, সেই সময় রামহরির স্ত্রী খেতুর বউ দিদি কি করিয়াছিলেন, তা জানেন? অতি উত্তম করিয়া খেতুর কানটি তিনি মলিয়া দিয়াছিলেন।

কান-মলা খাইয়া খেতু কি বলিলেন, তা জানেন? খেতু বলিলেন, "যাও বউ-দিদি, ছি!"

পাড়ার স্ত্রীগণ তখন কি করিলেন, তা শুনিয়াছেন? কমলের স্ত্রী ঠান্‌দিদি বলিলেন, "শালা বরখ খায়! ও সীতার মা, ওলো শালার কান দুইটা মলে ছিঁড়িয়া দে!"

তাহার পর কি হইল? তাহার পর খেতুর অনেক টাকা হইল। সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। খেতুর অনেকগুলি ছেলে-পিলে হইল। তনু রায় তাহাদিগের সহিত খেলা করিতে ভালবাসিতেন। পাড়ার বালক-বালিকারা তাঁর দৌহিত্রদিগকে মারিলে তাহাদের ঠাকুরমার সহিত তনু রায় হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ঝগড়া করিতেন।

তাহার পর? বার বার 'তাহার পর তাহার পর' করিলে চলিবে না। দেখিতে দেখিতে পুস্তকখানি বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার মূল্য দেয় কে, তাহার ঠিক নাই। কাজেই তাড়াতাড়ি শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

তাহার পর কি হইল? তাহার পর আমার গল্পটি ফুরাইল। নোটে গাছটির কপালে যাহা লেখা ছিল, তাহাই ঘটিল। সেই ঘটনা লইয়া কত অভিযোগ উপস্থিত হইল।

॥ ওরিয়েণ্টের প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য ॥

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৪'০০
বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়	শ্রীকালিদাস রায়	৮'০০
বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩'০০
নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি	শ্রীঅনাদিনাথ পাল	৫'০০
কি লিখি ?	যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি	৩'৫০
বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা	শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি	৫'০০
নানা রকম	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৬'০০
রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১২'০০
রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	১২'০০
বাংলার বাউল ও বাউল গান	শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	২৫'০০
বৈভাষিক দর্শন	শ্রী অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ	২০'০০
বাঙ্গালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	শ্রীগোপাল হালদার	৪'০০
সংস্কৃতির রূপান্তর	শ্রীগোপাল হালদার	৬'০০
ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি	শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	৬'০০
বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস	শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য	৫'০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ-১ম খণ্ড	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৫'০০
রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ-২য় খণ্ড	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৫'০০
রবীন্দ্র-বিচিত্রা	শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	৫'০০
রবীন্দ্র-হৃদয়	শ্রীরেণু মিত্র	৫'০০
বার্ণার্ড শ'	শ্রীঋষি দাস	৪'৫০
শেক্স্পীয়র	শ্রীঋষি দাস	৮'০০
গান্ধী-চরিত	শ্রীঋষি দাস	৮'০০
ভক্ত কবীর	শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস	৫'০০
শরৎ-পরিচয়	সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩'৫০
প্রথম অঙ্কে সমাপ্ত	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	৩'০০
গান্ধী ও মার্কস	শ্রীকিশোরলাল মশরুওয়ালা	৩'০০
পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা	শ্রীঅশোক মিত্র	৪'০০
মহামতি বিদুর	মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ	৩'০০

॥ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা ১২

॥ ওরিয়েন্টের শিক্ষা-নীতির বই ॥

STUDENT UNREST : CAUSES & CURE	Prof. Humayun Kabir	5'00
NEVER TOO LATE	N. Roy	5 00
OUR LANGUAGE PROBLEM	Harendranath Choudhury	1'50
MULTI-PURPOSE SCHOOL & OTHER EDUCATIONAL ESSAYS	Prof. A. N. Basu	5'00
শিক্ষা	মহাত্মা গান্ধী	২'৫০
শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা	সুধীরচন্দ্র কর	৪'০০
সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা	সুধীরচন্দ্র কর	৫'০০
প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ	অনাথনাথ বসু	২'০০
জনশিক্ষার কথা	নিখিলরঞ্জন রায়	৩'০০
সমাজশিক্ষার ভূমিকা	নিখিলরঞ্জন রায়	৩'৫০
নূতন শিক্ষা	প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক	২'০০
সমাজ ও শিশুশিক্ষা	প্রতিভা গুপ্ত	৫ ০০
সমাজ ও শিশু-সমীক্ষা	প্রতিভা গুপ্ত	৮'০০
শিশু-পরিবেশ	সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	৫'০০
বুনিয়াদী শিক্ষা	বিজয়কুমার ভট্টাচার্য	২ ০০
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি	বিজয়কুমাব ও সাধনা	৩ ৫০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ১ম খণ্ড	অনিলমোহন গুপ্ত	২'০০
বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য় খণ্ড	অনিলমোহন গুপ্ত	৪'০০
বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন	অনিলমোহন গুপ্ত	৪'২০
বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি	অনিলমোহন গুপ্ত	২'৫০
নয়া শিক্ষা	ফণিভূষণ বিশ্বাস	৩'৭৫
শিক্ষার নূতন পথে	শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী	২'০০
শিক্ষক-শিক্ষণ প্রবেশিকা	বিমলচন্দ্র দাশগুপ্ত	২'৫০
প্রাথমিক শিক্ষা	রেণু মিত্র	৪'০০
নঈ তালিম	ধীরেন্দ্র মজুমদার	২'০০
ছন্দের গোপন কথা	সুনির্মল বসু	২ ০০
ছোটদের কবিতা লেখা	সুনির্মল বসু	২'২০